পৌরনীতি ও সুশাসন

প্রথম পত্র

কোর্স কোড : HSC-1857

হায়ার সেকেন্ডারি সার্টিফিকেট প্রোগ্রাম
(এইচএসসি প্রোগ্রাম)

ওপেন স্কুল

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
BANGLADESH OPEN UNIVERSITY

পৌরনীতি ও সুশাসন

প্রথম পত্র

কোর্স কোড : HSC-1857

হায়ার সেকেন্ডারি সার্টিফিকেট প্রোগ্রাম
(এইচএসসি প্রোগ্রাম)

লেখকবৃন্দ

সুদীপ রায়
ড. সাব্বীর আহমেদ
মোঃ রফিকুল ইসলাম
লিটন বল

সম্পাদনা

ড. শান্তনু মজুমদার

সমন্বয়কারী

সুদীপ রায়
শশী শবনম ঈষা

ওপেন স্কুল

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
BANGLADESH OPEN UNIVERSITY

পৌরনীতি ও সুশাসন

প্রথম পত্র

কোর্স কোড : HSC-1857
এইচএসসি প্রোগ্রাম

প্রকাশ কাল : মে, ২০১৬
পুনমুদ্রণ : নভেম্বর, ২০১৭; আগস্ট, ২০১৮; ফেব্রুয়ারি, ২০১৯; ফেব্রুয়ারি, ২০২০; এপ্রিল, ২০২২ জানুয়ারি, ২০২৩; জুন, ২০২৪
অনলাইন সংস্করণ : জানুয়ারি, ২০২২
পরিমার্জিত সংস্করণ: নভেম্বর, ২০২৫
[বাউবি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গঠিত 'বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস বিষয়ক রিভিউ কমিটি' কর্তৃক পরিমার্জিত]

প্রকাশনায়
প্রকাশনা, মুদ্রণ ও বিতরণ বিভাগ
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
গাজীপুর-১৭০৫।

প্রচ্ছদ
কাজী সাইফুদ্দীন আব্বাস

প্রচ্ছদ গ্রাফিকস
আবদুল মালেক

কম্পিউটার কম্পোজ
মোঃ টিপু সুলতান

© বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

ISBN 978-984-34-3151-6

মুদ্রণ
প্রিমিয়াম বিজনেস লিংক এসোসিয়েটস
৬৫/২/১, বক্সকার্লভার্ড রোড, পল্টন, ঢাকা-১০০০।

কোর্সবই অনুসরণ করার নির্দেশনা

কোর্স পরিচিতি (Course Overview)

কোর্সের নাম : পৌরনীতি ও সুশাসন ১ম পত্র **কোর্স কোড : (HSC-1857)**

এইচএসসি প্রোগ্রামের পৌরনীতি ও সুশাসন বইটি এক বছরের জন্য পাঠ্য। বইটি দূরশিক্ষণ পদ্ধতির শিক্ষার্থীদের জন্য রচিত হয়েছে। দূরশিক্ষণ পদ্ধতির মূল কথাই হল স্বনির্ভর পাঠ ব্যবস্থাপনা। এ পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থী নিজ দায়িত্বে নিজের সুবিধামত সময়ে শেখার কাজে নিয়োজিত হতে পারেন। পাঠসামগ্রী উপস্থাপনার এ পদ্ধতি মড্যুলার পদ্ধতি নামে পরিচিত। এটি একই সাথে পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষকের ভূমিকা পালন করে। এতে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সরাসরি সহায়তা ছাড়া নিজেই পড়াশোনা করতে পারেন। জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর আলোকে এনসিটিবি'র নতুন কারিকুলামের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই বইটি স্বশিখন পদ্ধতিতে প্রণয়ন করা হয়েছে এবং বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের সিলেবাস অনুসরণ করা হয়েছে। প্রতি ইউনিটের শুরুতে ভূমিকা দেয়া হয়েছে। স্বতন্ত্র এ ইউনিটগুলো পড়লে বিশিষ্ট কোন দিকগুলো জানা যাবে তা ইউনিটের উদ্দেশ্য বলা আছে। আবার, প্রতিটি পাঠের শুরুতে ঐ পাঠের উদ্দেশ্য যুক্ত করা হয়েছে, যাতে শিক্ষার্থী উদ্দেশ্য অনুযায়ী জ্ঞান অর্জিত হল কি না তা যাচাই করতে পারেন। শিক্ষার্থীকে প্রতিটি ভূমিকা অবশ্যই বুঝে পড়তে হবে। প্রতিটি পাঠের শেষে সার-সংক্ষেপ দেয়া আছে। এ ছাড়া শিক্ষার্থীর স্ব-মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে প্রতিটি পাঠের শেষে পাঠোত্তর মূল্যায়নে বহুনির্বাচনি প্রশ্ন এবং ইউনিটের শেষে সৃজনশীল প্রশ্ন দেয়া হয়েছে।

পৌরনীতি ও সুশাসন বিষয়ের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজ, প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রের জন্য সুনাগরিক সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখা। আধুনিক যুগে রাষ্ট্রের পরিধি যেমন ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি নাগরিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্যও বৃদ্ধি পেয়েছে। পৌরনীতি বিষয়ের মৌলিক ধারণা, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, ডিজিটাল প্রশাসন ব্যবস্থা, রাষ্ট্রের সাথে নাগরিকের সার্বিক সম্পর্ক, দেশপ্রেম, সুশাসন বিষয়ে জ্ঞান লাভে এই পাঠ্যবইটি সাহায্য করবে। দেশ গড়তে শিক্ষার্থীদের যোগ্য করে গড়ে তোলা এই পর্যায়ের শিক্ষার একটি অন্যতম উদ্দেশ্য। পাঠ্যবইটির বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ সাধনের দিকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। স্ব-শিখন পাঠসামগ্রী হিসেবে এটি দূরশিক্ষণ শিক্ষার্থীদের আনন্দদায়ক পাঠ ও প্রত্যাশিত দক্ষতা অর্জন নিশ্চিত করবে বলে আশা করি।

শিক্ষার্থীরা যাতে বইটি পড়ে অধিকতর সুফল লাভ করতে পারে সেজন্য নিচে কিছু নির্দেশনা তুলে ধরা হল :

- ইউনিটের শিরোনাম ও ভূমিকা পড়ে সম্ভাব্য বিষয়বস্তু কী হতে পারে সে সম্পর্কে ধারণা করুন।
- পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্যগুলো পড়ে এই পাঠ থেকে কী শিখতে পারবেন তা জেনে নিন।
- এরপর মূলপাঠ ভালোভাবে অধ্যয়ন করুন। অধ্যয়নের পর শিখনফলগুলো অর্জিত হল কি না তা ভালোভাবে যাচাই করুন। যদি শিখনফল অর্জিত না হয় তাহলে বিষয়বস্তু পুনরায় অধ্যয়ন করুন।
- টিউটোরিয়াল সার্ভিসকে কার্যপোযোগী করতে আপনার পাঠ্যপুস্তকটির সকল ইউনিটকে ততটি অংশে ভাগ করে নিন। প্রথম টিউটোরিয়াল ক্লাসে যাওয়ার আগে আপনার ভাগকৃত অংশটি ভালোভাবে অধ্যয়ন করুন। কোন ইউনিটের বিষয়বস্তু অধ্যয়নের সময় যে বিষয়গুলো অপেক্ষাকৃত কঠিন/দুর্বোধ্য মনে হয়েছে তা চিহ্নিত করে আপনার নোট খাতায় লিপিবদ্ধ করুন এবং কঠিন বিষয়গুলো সমাধানের জন্য প্রয়োজনে টিউটরের সাহায্য নিন। একই পদ্ধতি অনুসরণ করে সবগুলো পাঠ অধ্যয়ন শেষ করুন।
- পাঠশেষে পাঠোত্তর মূল্যায়নের প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করুন। ইউনিটের শেষে দেওয়া উত্তরমালার সাথে আপনার উত্তর মিলিয়ে দেখুন। সবগুলো প্রশ্নের উত্তর সঠিক না হলে এই পাঠটি আবারও ভাল করে পড়ুন এবং প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর দিতে চেষ্টা করুন। এরপর অনুশীলন অংশের সৃজনশীল প্রশ্নগুলোর উত্তর জানা আছে কি না দেখুন। জানা না থাকলে সংশ্লিষ্ট অংশ আবার পড়ুন।
- ওপেন স্কুলের এই বইটি ছাড়াও স্থানীয় স্টাডি সেন্টারে আপনার জন্য টিউটোরিয়াল ক্লাসের ব্যবস্থা রয়েছে। আপনি প্রথমেই আপনার বিষয়ে কতটি টিউটোরিয়াল ক্লাস পাবেন তা আপনার স্টাডি সেন্টার থেকে জেনে নিন এবং আপনার স্টাডি সেন্টারের প্রতিটি টিউটোরিয়াল ক্লাসে অংশগ্রহণ করুন।

মার্জিন আইকন (Margin Icons)

কোর্সটি অধ্যয়ন করার পূর্বে কোর্সটিতে পর্যায়ক্রমে যে সমস্ত আইকন/প্রতীক ব্যবহৃত হয়েছে সে সম্পর্কে আপনাকে প্রথমেই পরিচিত হতে হবে। এতে পুরো কোর্স মড্যুলের কোনটি বিষয়বস্তু/মূলপাঠ, কোনটি পাঠোত্তর মূল্যায়ন ইত্যাদি সম্পর্কে সহজেই অবহিত হতে পারবেন। নিম্নে ব্যবহৃত বিভিন্ন আইকন বা প্রতীকগুলো দেখান হল।

			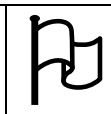					
উদ্দেশ্য	মূলপাঠ	সার-সংক্ষেপ	পাঠোত্তর মূল্যায়ন	চূড়ান্ত মূল্যায়ন	উত্তরমালা	ভিডিও বা দেখা	অডিও বা শোনা	সাহায্য/প্রয়োজনে

   অডিও/ভিডিও	বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপেন স্কুল পরিচালিত এইচএসসি প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীদের জন্য পৌরনীতি ও সুশাসন বিষয়ের অনেকগুলো অডিও/ভিডিও প্রোগ্রাম বর্তমানে বিটিভি/বংলাদেশ বেতার কর্তৃক সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে প্রচারিত হয়ে আসছে। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আপনারা স্টাডি সেন্টার থেকে প্রোগ্রাম সিডিউল সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে প্রচারিত প্রোগ্রামটি দেখলে উপকৃত হবেন বলে আশা করছি। এ সময় বোঝার সুবিধার্থে বইটি সামনে নিয়ে বসুন এবং প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি নোট করার জন্য কাগজ ও কলম সাথে রাখুন। কোনো বিষয় বুঝতে অসুবিধা হলে প্রয়োজনে আপনার টিউটরের সহায়তা নিন।

	সাহায্য বা সহায়তার জন্য আপনার স্টাডি সেন্টারের কোর্স টিউটরের পরামর্শ নিন।	**সুদীপ রায়** **শশী শবনম ঈষা** **ওপেন স্কুল, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়**

সূচিপত্র

ইউনিট ১: পৌরনীতি ও সুশাসন ১-২২

পাঠ ১.১: পৌরনীতি ও সুশাসনের ধারণা ১
পাঠ ১.২: পৌরনীতি ও সুশাসনের পরিধি ৫
পাঠ ১.৩: পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠের গুরুত্ব ৭
পাঠ ১.৪: বাংলাদেশে পৌরনীতি ও সুশাসন অধ্যয়নের গুরুত্ব ৯
পাঠ ১.৫: পৌরনীতি ও সুশাসনের সাথে ইতিহাসের সম্পর্ক ১১
পাঠ ১.৬: পৌরনীতি ও সুশাসনের সাথে সমাজবিজ্ঞানের সম্পর্ক ১৩
পাঠ ১.৭: পৌরনীতি ও সুশাসনের সাথে অর্থনীতির সম্পর্ক ১৫
পাঠ ১.৮: পৌরনীতি ও সুশাসনের সাথে নীতিশাস্ত্রের সম্পর্ক ১৭
পাঠ ১.৯: পৌরনীতি ও সুশাসনের সাথে লোক প্রশাসনের সম্পর্ক ১৯

ইউনিট ২: সুশাসন ২৩-৩৬

পাঠ ২.১: সুশাসনের ধারণা ২৩
পাঠ ২.২: সুশাসনের বৈশিষ্ট্য ২৬
পাঠ ২.৩: সুশাসনের গুরুত্ব ২৮
পাঠ ২.৪: বাংলাদেশে সুশাসনের সমস্যা ৩০
পাঠ ২.৫: সুশাসনের সমস্যার সমাধান ৩২
পাঠ ২.৬: সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নাগরিক ও সরকারের ভূমিকা ৩৪

ইউনিট ৩: মূল্যবোধ, আইন, স্বাধীনতা ও সাম্য ৩৭-৬০

পাঠ ৩.১: মূল্যবোধের ধারণা ও বৈশিষ্ট্য ৩৭
পাঠ ৩.২: গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ধারণা ও গুরুত্ব ৪০
পাঠ ৩.৩: সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ৪২
পাঠ ৩.৪: আইনের ধারণা ও শ্রেণিবিভাগ ৪৪
পাঠ ৩.৫: আইনের শাসন ৪৬
পাঠ ৩.৬: স্বাধীনতার ধারণা ও শ্রেণিবিভাগ ৪৮
পাঠ ৩.৭: স্বাধীনতার রক্ষাকবচ ৫১
পাঠ ৩.৮: আইন ও স্বাধীনতার সম্পর্ক ৫৩
পাঠ ৩.৯: নৈতিকতার ধারণা, আইন ও নৈতিকতার সম্পর্ক ৫৫
পাঠ ৩.১০: সাম্যের ধারণা ও শ্রেণিবিভাগ ৫৮
পাঠ ৩.১১: সাম্য ও স্বাধীনতার সম্পর্ক ৬০

ইউনিট ৪: ই-গর্ভনেন্স ও সুশাসন ৬১-৭২

পাঠ ৪.১: ই-গভর্নেন্স ৬১
পাঠ ৪.২: ই-গভর্নেন্সের উদ্দেশ্য ৬৩
পাঠ ৪.৩: ই-গভর্নেন্সের বৈশিষ্ট্য ৬৫
পাঠ ৪.৪: ই-গভর্নেন্সের গুরুত্ব ৬৭
পাঠ ৪.৫: ই-গভর্নেন্সের প্রতিবন্ধকতা ৬৯
পাঠ ৪.৬: ই-গভর্নেন্সের প্রতিবন্ধকতা দূর করার উপায় ৭১

ইউনিট ৫: নাগরিক অধিকার, কর্তব্য ও মানবাধিকার.....৭৩-৯১
পাঠ ৫.১: অধিকারের ধারণা ৭৩
পাঠ ৫.২: অধিকারের শ্রেণিবিভাগ.....৭৫
পাঠ ৫.৩: মৌলিক অধিকার ৭৭
পাঠ ৫.৪: মানবাধিকার ৮০
পাঠ ৫.৫: জাতিসংঘের মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র ৮২
পাঠ ৫.৬: মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকার ৮৬
পাঠ ৫.৭: নাগরিক কর্তব্য ৮৮
পাঠ ৫.৮: অধিকার ও কর্তব্যের সম্পর্ক.....৯০

ইউনিট ৬: রাষ্ট্র: উৎপত্তি ও কার্যাবলি ৯২-১১৯
পাঠ ৬.১: রাষ্ট্রের ধারণা.....৯৫
পাঠ ৬.২: রাষ্ট্র ও সরকার ৯৮
পাঠ ৬.৩: রাষ্ট্র ও অন্যান্য সংঘ ১০০
পাঠ ৬.৪: রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত মতবাদ.....১০২
পাঠ ৬.৫: বল প্রয়োগ মতবাদ ও বিবর্তনমূলক মতবাদ ১০৪
পাঠ ৬.৬: সামাজিক চুক্তি মতবাদ ১০৭
পাঠ ৬.৭: আধুনিক রাষ্ট্রের কার্যাবলি.....১১০
পাঠ ৬.৮: পুঁজিবাদ.....১১২
পাঠ ৬.৯: সমাজতন্ত্র ১১৪
পাঠ ৬.১০: সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের পার্থক্য ১১৬
পাঠ ৬.১১: মিশ্র অর্থনীতি ১১৮
পাঠ ৬.১২: কল্যাণ রাষ্ট্র: ধারণা ও কার্যাবলি.....১২০

ইউনিট ৭: সরকার ১২০-১৫৬
পাঠ ৭.১: সরকারের ধারণা ও শ্রেণিবিভাগ ১২৩
পাঠ ৭.২: গণতন্ত্রের সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা.....১৩০
পাঠ ৭.৩: একনায়কতন্ত্রের গুনাবলি ও সমস্যা.....১৩৩
পাঠ ৭.৪: গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র ১৩৬
পাঠ ৭.৫: গণতন্ত্রের সাফল্যের শর্তাবলি.....১৩৮
পাঠ ৭.৬: আদর্শ শাসন ব্যবস্থা হিসেবে গণতন্ত্র ১৪০
পাঠ ৭.৭: রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের গুনাবলি ও সমস্যা ১৪২
পাঠ ৭.৮: সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের গুনাবলি ও সমস্যা.....১৪৪
পাঠ ৭.৯: রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ও মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ১৪৭
পাঠ ৭.১০: এককেন্দ্রিক সরকারের গুনাবলি ও সমস্যা ১৪৯
পাঠ ৭.১১: যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের গুনাবলি ও সমস্যা ১৫২
পাঠ ৭.১২: এককেন্দ্রিক সরকার ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ১৫৫

ইউনিট ৮: রাজনৈতিক দল, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী, নেতৃত্ব ও সুশাসন.....১৫৭-১৮২
পাঠ ৮.১: রাজনৈতিক দলের ধারণা ও বৈশিষ্ট্য ১৫৭
পাঠ ৮.২: রাজনৈতিক দলের কার্যাবলি ১৬০
পাঠ ৮.৩: গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিরোধী দলের ভূমিকা ১৬৩
পাঠ ৮.৪: চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ধারণা ও বৈশিষ্ট্য ১৬৬
পাঠ ৮.৫: রাজনৈতিক দল ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী.....১৬৯

পাঠ ৮.৬: চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ভূমিকা ১৭২
পাঠ ৮.৭: নেতৃত্বের ধারণা ও প্রকারভেদ ১৭৪
পাঠ ৮.৮: নেতৃত্বের গুণাবলি ১৭৭
পাঠ ৮.৯: সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্ব ১৭৯

ইউনিট ৯: সরকারের অঙ্গসমূহ ১৮৩-২২৭
পাঠ ৯.১: সরকারের অঙ্গ ১৮৩
পাঠ ৯.২: আইনসভার ধারণা ও কার্যাবলি ১৮৬
পাঠ ৯.৩: এক কক্ষ বিশিষ্ট আইন সভা ১৯০
পাঠ ৯.৪: দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইন সভা ১৯৪
পাঠ ৯.৫: গণতন্ত্রে আইন সভার ভূমিকা ১৯৮
পাঠ ৯.৬: আইন সভার ক্ষমতা হ্রাসের কারণ ২০০
পাঠ ৯.৭: শাসন বিভাগের গঠন ও কার্যাবলি ২০৩
পাঠ ৯.৮: শাসন বিভাগের ক্ষমতা বৃদ্ধি ২০৬
পাঠ ৯.৯: বিচার বিভাগের গঠন ও কার্যাবলি ২০৮
পাঠ ৯.১০: আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় বিচার বিভাগের ভূমিকা ২১১
পাঠ ৯.১১: বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ২১৩
পাঠ ৯.১২: ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি ২১৭
পাঠ ৯.১৩: ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির সুবিধা ও অসুবিধা ২১৯
পাঠ ৯.১৪: ক্ষমতা ভারসাম্য নীতি ২২২
পাঠ ৯.১৫: বাংলাদেশে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রয়োগ ২২৪

ইউনিট ১০: জনমত ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি ২২৮-২৩৭
পাঠ ১০.১: জনমতের ধারণা ও বৈশিষ্ট্য ২২৮
পাঠ ১০.২: জনমত গঠনের মাধ্যমসমূহ ২৩১
পাঠ ১০.৩: জনমতের গুরুত্ব ২৩৩
পাঠ ১০.৪: রাজনৈতিক সংস্কৃতির ধারণা ও বৈশিষ্ট্য ২৩৫

ইউনিট ১১: আমলাতন্ত্র ২৩৮-২৫১
পাঠ ১১.১: আমলাতন্ত্রের ধারণা ও বৈশিষ্ট্য ২৩৮
পাঠ ১১.২: আমলাতন্ত্রের কার্যাবলি ২৪২
পাঠ ১১.৩: আমলাতন্ত্রের জবাবদিহিতা ও সুশাসন ২৪৪
পাঠ ১১.৪: বাংলাদেশে আমলাতন্ত্রের অতিবিকাশ ২৪৬
পাঠ ১১.৫: আমলাতন্ত্রে লালফিতার দৌরাত্ম্য ২৪৮

ইউনিট ১২: জাতীয়তা ও দেশপ্রেম ২৫২-২৬০
পাঠ ১২.১: জাতি ও জাতীয়তার ধারণা ২৫২
পাঠ ১২.২: জাতি ও জাতীয়তার পার্থক্য ২৫৪
পাঠ ১২.৩: জাতীয়তার উপাদান ২৫৬
পাঠ ১২.৪: দেশপ্রেম ২৫৮

মানবণ্টন ও নমুনা প্রশ্ন ২৬১-২৬৯

পৌরনীতি ও সুশাসন
(Civics and Good Governance)

ইউনিট ১

রাষ্ট্রের সাথে নাগরিকদের এবং অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনার মধ্য দিয়ে জ্ঞানচর্চার সুনির্দিষ্ট একটি ধারা হিসাবে পৌরনীতি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। আধুনিককালে প্রত্যেক নাগরিক ও সংগঠন রাষ্ট্রের নিকট হতে অধিকতর দায়িত্বসম্পন্ন সেবা প্রত্যাশা করে। এহেন বাস্তবতায়, পৌরনীতির আলোচনায় সুশাসন বিষয়টি প্রাধান্য পাচ্ছে। আলোচ্য ইউনিটে পৌরনীতি ও সুশাসনের ধারণা, পরিধি এবং এ বিষয়টির সাথে অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এই ইউনিটের পাঠসমূহ-

পাঠ-১.১ঃ পৌরনীতি ও সুশাসনের ধারণা	পাঠ-১.৭ঃ পৌরনীতি ও সুশাসনের সাথে অর্থনীতির সম্পর্ক
পাঠ-১.২ঃ পৌরনীতি ও সুশাসনের পরিধি	পাঠ-১.৮ঃ পৌরনীতি ও সুশাসনের সাথে নীতিশাস্ত্রের সম্পর্ক
পাঠ-১.৩ঃ পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠের গুরুত্ব	পাঠ-১.৯ঃ পৌরনীতি ও সুশাসনের সাথে লোক প্রশাসনের সম্পর্ক
পাঠ-১.৪ঃ বাংলাদেশে পৌরনীতি ও সুশাসন অধ্যয়নের গুরুত্ব	
পাঠ-১.৫ঃ পৌরনীতি ও সুশাসনের সাথে ইতিহাসের সম্পর্ক	
পাঠ-১.৬ঃ পৌরনীতি ও সুশাসনের সাথে সমাজবিজ্ঞানের সম্পর্ক	

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ**

পাঠ-১.১ পৌরনীতি ও সুশাসনের ধারণা (Concept of Civics and Good Governance)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- পৌরনীতির ধারণা বর্ণনা করতে পারবেন।
- সুশাসনের ধারণা আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	নগররাষ্ট্র, বিশ্বমানবতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, পুরবাসী।

পৌরনীতির ধারণা

পৌরনীতি হল সামাজিক ও নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান। পৌরনীতির ইংরেজি প্রতিশব্দ Civics (সিভিকস্)। Civics শব্দটি ল্যাটিন শব্দ Civis এবং Civitas শব্দ থেকে এসেছে। Civis এবং Civitas শব্দের অর্থ যথাক্রমে নাগরিক (Citizen) ও নগররাষ্ট্র (City State)। সুতরাং শব্দগত বা উৎপত্তিগত অর্থে Civics বা পৌরনীতি হল নগর রাষ্ট্রে বসবাসরত নাগরিকদের আচার-আচরণ, রীতিনীতি ও কার্যাবলি সংক্রান্ত বিজ্ঞান। তবে প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে এবং গ্রীসে Civics বা পৌরনীতি বলতে নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্যকে বোঝানো হতো।

সংস্কৃত ভাষায় নগরকে (City) 'পুর' বা 'পুরী' এবং নগরে বসবাসকারীদেরকে 'পুরবাসী' বলা হয়। যার জন্য নাগরিক জীবনের অপর নাম 'পৌর জীবন' এবং নাগরিক জীবনের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কিত বিদ্যার নাম পৌরনীতি।

প্রাচীন গ্রিসে এক একটি নগর ছিল এক একটি রাষ্ট্র। রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল এথেন্স এবং স্পার্টা। এ নগর রাষ্ট্রগুলোর আয়তন ও জনসংখ্যা ছিল অত্যন্ত কম। নগর রাষ্ট্রের সকল জনগণকে নাগরিক বলা হতো না। কেবল নগর রাষ্ট্রের যারা রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করতো অর্থাৎ রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালনায় যারা অংশগ্রহণ করতো তাদেরকেই 'নাগরিক' হিসেবে আখ্যায়িত করা হতো। উল্লেখ্য নারী, দাস ও বিদেশীরা এসব নগর রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে বিবেচ্য হতো না। এসব নগর রাষ্ট্রে বসবাসকারী নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্য, আচার-আচরণ, রীতিনীতি নিয়ে আলোচনা করা হতো পৌরনীতিতে। সুতরাং শব্দগত এবং মূলগত অর্থে পৌরনীতির ধারণা ছিল অনেকটা সীমিত ও সংকীর্ণ।

বর্তমানে পৌরনীতিকে কেবল শব্দগত অর্থে আলোচনা করা হয় না। কেননা, বর্তমান আধুনিক রাষ্ট্রগুলো গ্রিসের নগররাষ্ট্র (City State) এর মতো নয়, বরং এগুলো এখন জাতি রাষ্ট্র (Nation State) হিসেবেই পরিগণিত। প্রাচীন গ্রিসের নগররাষ্ট্রগুলোর অপেক্ষা বর্তমান আধুনিক জাতি রাষ্ট্রগুলো আয়তনে বড় এবং জনসংখ্যাও বেশি। এসব জাতি রাষ্ট্রের নাগরিকদের জীবন এবং কার্যাবলি জটিল ও বহুমুখী। আধুনিক জাতি রাষ্ট্রে নাগরিকদের ভূমিকা ও কার্যাবলি, আচার-আচরণ এবং তাদের বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ধারাবাহিক পর্যালোচনার মাধ্যমে যে শাস্ত্র আদর্শ নাগরিক জীবনের জ্ঞান দান করে তাকেই পৌরনীতি বলে।

ই এম হোয়াইট (E.M. White) মনে করেন, "পৌরনীতি হল জ্ঞানের সেই শাখা যা এক জন নাগরিকের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এবং স্থানীয়, জাতীয় ও মানবসত্তার সাথে জড়িত সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করে।" (Civics is that branch of human knowledge which deals with everything relating to a citizen– past, present and future; local, national and human.)

ফ্রেডরিখ জেমস গোল্ড (Frederick James Gould) বলেন, "পৌরনীতি হচ্ছে প্রতিষ্ঠান, আচরণ ও চেতনার অধ্যয়ন শাস্ত্র যার মাধ্যমে একজন পুরুষ বা নারী কোন একটি রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের সদস্য হিসাবে কর্তব্য পালন করতে পারে এবং এর সুযোগ-সুবিধাগুলো গ্রহন করতে পারে।" (Civics is the study of institutions, habits and spirit by means of which a man or women may fulfill the duties and receive the benifit of membership in a political community.)

Webster's International Dictionary তে বলা হয়েছে, "পৌরনীতি হল রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সেই শাখা, যা নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্য নিয়ে আলোচনা করে"। (Civics is that department of Political Science dealing with rights of citizenship and duties of citizen.)

পৌরনীতির উপরোক্ত সংজ্ঞা ও ধারণা থেকে যেসব অর্থ ও প্রকৃতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তা নিম্নে ছকের মাধ্যমে প্রকাশ করা হল–

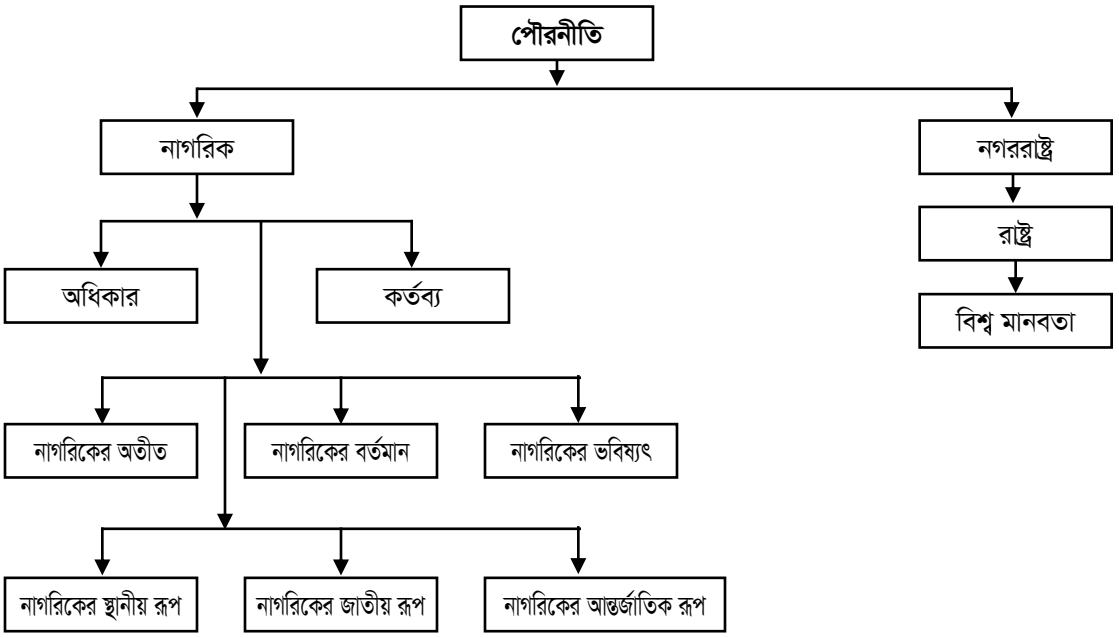

সুতরাং পৌরনীতি হল সে শাস্ত্র যা নাগরিক, নাগরিকের কার্যক্রম, অধিকার ও কর্তব্য, নাগরিকের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত দিক এবং নাগরিকের সংগঠনসমূহ, রাষ্ট্র ও বিশ্বমানবতা সংক্রান্ত সকল বিষয়ের সমস্যা ও সমাধান সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করে।

সুশাসনের ধারণা

সুশাসন প্রত্যয়টি পৌরনীতির সাম্প্রতিক সংযোজন। সুশাসনের ইংরেজি প্রতিশব্দ হল 'Good Governance'। সুশাসনকে স্পষ্টভাবে বুঝতে হলে শাসন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। Governance হল একটি বহুমাত্রিক ধারণা যা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ, ক্ষেত্র এবং প্রেক্ষাপট থেকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। Government এর মতই Governance শব্দটি এসেছে 'kubernao' নামক ল্যাটিন শব্দ থেকে, যার অর্থ পরিচালনা করা। সাধারণত Governance বা শাসন এমন একটি পদ্ধতিকে বোঝায়, যেখানে একটি পরিকল্পিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কোনো সংস্থা, সমাজ বা রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নীতি নির্ধারণ করা হয়ে থাকে।

বর্তমান বিশ্বে একটি জনপ্রিয় ধারণা হল সুশাসন। সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে সুশাসন। ১৯৮৯ সালে বিশ্বব্যাংকের এক প্রতিবেদন সর্বপ্রথম সুশাসন প্রত্যয়টি ব্যবহার করা হয়। ২০০০ সালে বিশ্বব্যাংক সুশাসনের চারটি স্তম্ভ ঘোষণা করে। এ চারটি স্তম্ভ হল– (i) দায়িত্বশীলতা (ii) স্বচ্ছতা (iii) আইনী কাঠামো ও (iv) অংশগ্রহণ।

ম্যাক করণী (Mac Corney) এ প্রসঙ্গে বলেন, "সুশাসন বলতে রাষ্ট্রের সাথে সুশীল সমাজের, সরকারের সাথে জনগণের এবং শাসকের সাথে শাসিতের সম্পর্ককে বুঝায়"।

মারটিন মিনোগ (Martin Minogue) সুশাসন সম্পর্কে বলেন, "ব্যাপক অর্থে সুশাসন হচ্ছে কতগুলো উদ্যোগের সমষ্টি এবং একটি সংস্কার কৌশল যা সরকারকে অধিকতর গণতান্ত্রিক, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক করতে সুশীল সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে কার্যকর করে তোলে।"

ল্যান্ডেল মিল (Landell Mill) মনে করেন, সুশাসন একটি জাতির রাজনেতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে দিক নির্দেশ করে এবং জন প্রশাসন এবং আইনী কাঠামোর মধ্যে এটি কিভাবে কাজ করে তা জানায়।

বিশেষজ্ঞদের মতে, সুশাসন সরকার পরিচালনা অপেক্ষা একটি বিস্তৃত ধারণা যা একটি নির্দিষ্ট ভূখন্ডে সামাজিক নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষায় এবং নির্বাহী ক্ষমতা ব্যবহারের প্রশ্নে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের ভূমিকার সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কিত।"

পরিশেষে বলা যায় যে, সরকারের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, দায়িত্বশীলতা এবং জনগণের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে জনগণের কল্যাণ শাসনকার্য পরিচালনাই হচ্ছে সুশাসন। সুশাসন সেই শাসনব্যবস্থা যেখানে জনগণের তথা রাষ্ট্রের সার্বিক কল্যাণ সাধিত হয়।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	পৌরনীতি ও সুশাসন সংজ্ঞায়িত করুন।

সার-সংক্ষেপ

পৌরনীতি হল নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান। রাষ্ট্র ও নাগরিকতার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি এখানে বিবৃত হয়। সরকারের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, দায়িত্বশীলতা এবং জনগণের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে, জনগণের কল্যাণে শাসনকার্য পরিচালনাই হচ্ছে সুশাসন। গণতান্ত্রিক ও মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ এবং সরকার ও জনগণের মধ্যে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করাই পৌরনীতি ও সুশাসনের প্রধান লক্ষ্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। পৌরনীতির ইংরেজি প্রতিশব্দ কী?

(ক) Civics (খ) Civis
(গ) Civies (ঘ) Civitas

২। Civics শব্দটি উদ্ভব হয়েছে কোন ভাষার শব্দ থেকে?

(ক) ইংরেজি (খ) আরবি
(গ) ল্যাটিন (ঘ) জার্মান

৩। Civitas কোন ভাষার শব্দ?

(ক) ল্যাটিন (খ) গ্রিক
(গ) ফরাসি (ঘ) স্প্যানিশ

৪। প্রাচীনকালে এথেন্স ও স্পার্টায় কোন ধরণের রাষ্ট্র প্রচলিত ছিল?

(ক) বিশ্ব রাষ্ট্র (খ) জাতীয় রাষ্ট্র
(গ) নগর রাষ্ট্র (ঘ) যুক্তরাষ্ট্র

৫। সুশাসন কয়টি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত?

(ক) ৪ (খ) ৬
(গ) ৮ (ঘ) ১০

পাঠ-১.২ পৌরনীতি ও সুশাসনের পরিধি (Scope of Civics and Good Governance)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- পৌরনীতি ও সুশাসনের পরিধি সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	সুনাগরিকতা, নির্বাচকমন্ডলী, নির্বাচন কমিশন, সাম্য, স্বাধীনতা, ই-গভর্নেন্স, জবাবদিহিতা, আইনের শাসন, মানব সম্পদ।

পৌরনীতি ও সুশাসনের পরিধি

পৌরনীতি ও সুশাসনের পরিধি ব্যাপক। পৌরনীতি ও সুশাসনের পরিধি সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হল–

১। **নাগরিকতা বিষয়ক ঃ** পৌরনীতি ও সুশাসন মূলত নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান। নাগরিকের উত্তম ও মর্যাদাপূর্ণ জীবন প্রতিষ্ঠা করা পৌরনীতি ও সুশাসনের প্রধান লক্ষ্য। পৌরনীতি ও সুশাসন নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য, সচেতনতা, সুনাগরিকতা, নাগরিকতা অর্জন ও বিলোপ, নাগরিকতার অর্থ ও প্রকৃতি, সুনাগরিকের গুণাবলি প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা করে।

২। **মৌলিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত ঃ** মানব সভ্যতার ইতিহাসে পরিবার হল আদি ও অকৃত্রিম প্রতিষ্ঠান। কালের বিবর্তন ধারায় পরিবারের সম্প্রসারণ হয়েছে এবং গড়ে উঠেছে রাষ্ট্র ও অন্যান্য বহুবিধ সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। পৌরনীতি ও সুশাসন পরিবার থেকে শুরু করে সমাজ, রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও বিকাশ, রাষ্ট্রের কার্যাবলি প্রভৃতি মৌলিক প্রতিষ্ঠান পৌরনীতি ও সুশাসনের অন্তর্ভূক্ত।

৩। **রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আলোচনা ঃ** পৌরনীতি ও সুশাসনের সাথে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের ধারণা, রাষ্ট্রের উৎপত্তি, রাষ্ট্রের কার্যাবলি, রাষ্ট্র সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ, রাষ্ট্রের উপাদান, সংবিধান, সংবিধানের শ্রেণিবিভাগ, সংবিধানের বৈশিষ্ট্য, সরকার, সরকারের শ্রেণিবিভাগ, সরকারের বিভিন্ন অঙ্গ, জনমত, জনমতের বাহন, নির্বাচকমন্ডলী, রাজনৈতিক দল, নির্বাচন কমিশন প্রভৃতি পৌরনীতি ও সুশাসনের আলোচনার অন্তর্ভূক্ত।

৪। **সামাজিক ও রাজনৈতিক বিমূর্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা ঃ** পৌরনীতি ও সুশাসন সামাজিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনের বিভিন্ন বিমূর্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। আইন, আইনের উৎস ও প্রকৃতি, আইন ও নৈতিকতা, স্বাধীনতা, স্বাধীনতার প্রকৃতি, স্বাধীনতার রক্ষাকবচ, সাম্য ও স্বাধীনতা, সাম্যের প্রকারভেদ প্রভৃতি সম্পর্কে পৌরনীতি ও সুশাসন আলোচনা করে।

৫। **রাজনৈতিক ঘটনাবলি ঃ** পৌরনীতি ও সুশাসন রাজনৈতিক বিভিন্ন ঘটনাবলি নিয়ে আলোচনা করে। যেমন– বাংলাদেশে পৌরনীতি ও সুশাসন পলাশীর যুদ্ধ, সিপাহী বিদ্রোহ, ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ১৯৬৬ সালের ছয় দফা, ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের নির্বাচন, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ, সামরিক অভ্যুত্থান ইত্যাদি রাজনৈতিক পর্যায় সম্পর্কে আলোচনা করে।

৬। **সুশাসন সম্পর্কে আলোচনা ঃ** পৌরনীতি ও সুশাসন রাষ্ট্রের সুশাসনের বহুমাত্রিক ধারণা সম্পর্কে আলোচনা করে। সুশাসনের উপাদান, সুশাসনের সমস্যা, সুশাসনের সমস্যার সমাধান, সুশাসনের সমস্যা সমাধানে সরকার ও জনগণের ভূমিকা সম্পর্কে পৌরনীতি ও সুশাসন আলোচনা করে।

৭। **নাগরিকের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা ঃ** পৌরনীতি ও সুশাসন নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্যের বর্তমান স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা করে এবং এর মাধ্যমে ভবিষ্যৎ নাগরিক জীবনের আদর্শ ও স্বরূপের ইঙ্গিত প্রদান করে।

৮। **নাগরিকের স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিক নিয়ে আলোচনা ঃ** পৌরনীতি ও সুশাসন নাগরিকের সামাজিক ও রাজনৈতিক কার্যাবলির সাথে সম্পৃক্ত স্থানীয় সংস্থার (যেমন, ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা, জেলা পরিষদ, সিটি কর্পোরেশন ইত্যাদি) গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলি নিয়ে আলোচনা করে। নাগরিকের জাতীয় বিষয় (যেমন, স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমি, মুক্তিযুদ্ধ, বিভিন্ন জাতীয় নেতার অবদান, দেশ রক্ষায় নাগরিকের ভূমিকা, জাতীয় রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহ) সম্পর্কে আলোচনা করে। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠন এবং বিভিন্ন ঘটনাবলি সম্পর্কেও পৌরনীতি ও সুশাসন আলোচনা করে।

৯। **নাগরিক জীবনের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়াদি ঃ** পৌরনীতি ও সুশাসন আধুনিক নাগরিক জীবনের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন বিষয়াবলি নিয়ে আলোচনা করে। বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানও পাওয়া যায় এর মাধ্যমে। যেমন– ইভটিজিং, দুর্নীতি, ইলেকট্রনিক গভর্নেন্স (ই-গভর্নেন্স), দারিদ্র বিমোচনের মত বিষয়গুলির আলোচনা পৌরনীতি ও সুশাসনের পরিধিকে সমৃদ্ধ করেছে।

১০। **সুশাসন ও ই-গভর্নেন্স ঃ** পৌরনীতি ও সুশাসন বর্তমান সময়ে সুশাসন ও ই-গভর্নেন্স নিয়ে আলোচনা করে। সরকার কিভাবে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, আইনের শাসন, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, নিরপেক্ষ নির্বাচন, দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ, দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তুলতে পারে সে বিষয়ে পৌরনীতি ও সুশাসন আলোচনা করে।

পরিশেষে বলা যায় যে, পৌরনীতি ও সুশাসনের পরিধি ও বিষয়বস্তু ব্যাপক ও বিস্তৃত। নাগরিকের জীবন ও কার্যাবলি যতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত পৌরনীতি ও সুশাসনের পরিধিও ততদূর পর্যন্ত বিস্তৃত।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	পৌরনীতি ও সুশাসন এর আলোচ্য বিষয়ের একটি তালিকা তৈরি করুন।

সার-সংক্ষেপ

পৌরনীতি ও সুশাসনের পরিধি ব্যাপক ও বিস্তৃত। নাগরিক জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র ও সরকারের কার্যাবলি যতদূর বিস্তৃত পৌরনীতি ও সুশাসনের পরিধিও ততদূর বিস্তৃত। নাগরিক জীবন, নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য, সংবিধান, ঐতিহাসিক ঘটনা, রাজনৈতিক ঘটনাবলি, প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন, সরকারের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, নিরপেক্ষ নির্বাচন, আইনের শাসন, বিচার বিভাগের স্বাধীনতার মত বিষয়গুলো নিয়ে আলাপ-আলোচনা পৌরনীতি ও সুশাসনের পরিধিকে আরো বেশি বিস্তৃত করেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। "পৌরনীতি হল জ্ঞানের সেই শাখা যা নাগরিকের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করে।"– উক্তিটি কে করেছেন?

(ক) ই এম হোয়াইট (খ) এফ আই গ্লাউড
(গ) ম্যাক্স ওয়েবার (ঘ) আর্নেস্ট বার্কার

২। পৌরনীতি ও সুশাসন নিচের কোন বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে?

(ক) অর্থব্যবস্থা (খ) ব্যাংকিং ব্যবস্থা
(গ) ইলেকট্রনিক গর্ভনেন্স (ঘ) ধর্মীয় অনুশাসন

পাঠ-১.৩ পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠের গুরুত্ব
(Importance of Studying of Civics and Good Governance)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, বুদ্ধিমত্তা, বিবেক, স্বদেশ প্রেম, জাতীয় চেতনা, আইনের শাসন, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, গণ মাধ্যম, বিশ্বশান্তি।

পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠের গুরুত্ব

আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিকের সার্বিক কল্যাণের নিমিত্তে পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠের বিকল্প নেই। কেননা পৌরনীতি ও সুশাসন নাগরিকতার সাথে জড়িত সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। সুশাসন পাঠের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হল–

১। **রাষ্ট্র ও সরকার সম্বন্ধে জানা ঃ** রাষ্ট্র ও সরকার ব্যতীত নাগরিক জীবন কল্পনা করা যায় না। আর নাগরিক হিসেবে রাষ্ট্র ও সরকার সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান থাকা আবশ্যক। রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের উপাদান, সরকার, সরকারের শ্রেণি বিভাগ, রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত মতবাদ, সংবিধান ইত্যাদি সম্পর্কে জানার জন্য পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠের কোন বিকল্প নেই।

২। **সুনাগরিক হওয়ার শিক্ষা ঃ** রাষ্ট্রের একজন সাধারণ নাগরিক থেকে কিভাবে সুনাগরিক হওয়া যায় সে সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা যায় পৌরনীতি ও সুশাসন থেকে। একজন সুনাগরিক বুদ্ধিমত্তা, বিবেক ও আত্মসংযমের অধিকারী হওয়ায় রাষ্ট্রের প্রতি তার অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন থাকে। সুনাগরিক হিসেবে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করার জন্যও পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

৩। **স্বদেশ প্রেম জাগ্রত করার জন্য ঃ** দেশের প্রত্যেক নাগরিকের মধ্যে স্বদেশ প্রেম জাগ্রত করার জন্য পৌরনীতি ও সুশাসন সম্পর্কে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। একটি দেশের সার্বিক উন্নয়ন নির্ভর করে প্রকৃত দেশ প্রেমিক জনগণের উপর। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক পল জাঁনে (Paul Janet) বলেন, "স্বদেশ প্রেম জাগ্রত করার জন্য পৌরনীতির জ্ঞান খুবই জরুরি।"

৪। **সুস্থ ও সুন্দর সমাজ জীবন গঠনের শিক্ষা ঃ** পৌরনীতি ও সুশাসন নাগরিকের সুস্থ ও সুন্দর সমাজ জীবন গঠনে শিক্ষা দিয়ে থাকে। মানুষের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনকে কেন্দ্র করে পৌরনীতি ও সুশাসন গড়ে উঠেছে। পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার মাধ্যমে কিভাবে সুস্থ ও সুন্দর সমাজ জীবন গঠন করে মানুষের সর্বাধিক কল্যাণ করা যায় তা পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠের মাধ্যমে জানা যায়।

৫। **ব্যক্তিত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে ঃ** নাগরিকের ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও প্রদত্ত অধিকারসমূহ পাঠ ও চর্চার মাধ্যমে নাগরিক তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ করে থাকে। রাষ্ট্র থেকে নাগরিক যেমন বিভিন্ন অধিকার গ্রহণ করে তেমনি রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের কিছু কর্তব্য বা দায়বদ্ধতা রয়েছে যা একজন নাগরিক পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠের মাধ্যমে জানতে পারে।

৬। **দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঃ** পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠ মানব মনের সংকীর্ণতা দূর করে মহৎ জীবন গঠনের অনুপ্রেরণা দেয়। বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ ও মানবতাবোধ সৃষ্টিতে পৌরনীতি ও সুশাসন অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। দেশ ও বিশ্বের কল্যাণার্থে এ শাস্ত্র নাগরিকের মানসিক দৃষ্টিভঙ্গির উন্নতি ঘটায়।

৭। **জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঃ** পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠের মাধ্যমে নাগরিকের মনে জাতীয় চেতনার উন্মেষ হয়। সচেতন নাগরিক রাষ্ট্রের অমূল্য সম্পদ। জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সচেতন নাগরিকেরা দেশ সেবায় আত্মনিয়োগ করে। এর ফলে রাষ্ট্রের সামগ্রিক সমৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়।

৮। **সুশাসন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ ঃ** সুশাসন প্রত্যয়টি সাম্প্রতিক সময়ে পৌরনীতির সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে। যার ফলে পৌরনীতি আরো বেশি সমৃদ্ধ হয়েছে। কোন রাষ্ট্র সুশাসনের মাধ্যমে পরিচালিত হলে অতি শীঘ্র ইপ্সিত লক্ষ্যে আরোহন করতে পারে। পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠের মাধ্যমে সরকারের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, আইনের শাসন, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা, নিরপেক্ষ নির্বাচনের মত বিষয়গুলো সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা সহজতর হয়।

৯। **গণতন্ত্রের বিকাশ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ ঃ** বর্তমান সময়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় শাসনব্যবস্থা হল গণতন্ত্র। গণতন্ত্রের স্বরূপ, ভবিষ্যৎ, কার্যকারিতা এবং বিকাশ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করার জন্য পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠের বিকল্প নেই।

১০। **বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ঃ** রাষ্ট্র যেমন নাগরিকের কল্যাণ সাধন করে থাকে তেমনি নাগরিক রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে থাকে। একজন সুনাগরিক রাষ্ট্রের অগ্রগতির জন্য নানাবিধ পরিকল্পনা করে। সে পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে রাষ্ট্র ও বিশ্বের শান্তি ও উন্নয়নের জন্য পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠ অত্যাবশ্যক।

পরিশেষে বলা যায় যে, পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। সুস্থ ও সুন্দর জীবন গঠনে তথা কল্যাণকর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। তাই প্রত্যেক নাগরিকের নিজের স্বার্থে পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠ করা প্রয়োজন।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠ করা প্রয়োজন কেন?

সার-সংক্ষেপ

নাগরিক জীবন ও রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও সুশৃঙ্খল জ্ঞান লাভ করতে পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠের বিকল্প নেই। পৌরনীতি ও সুশাসন নাগরিক জীবনের সঠিক দিক-নির্দেশনা প্রদান করে বিধায় সভ্য সমাজের প্রত্যেক সদস্যের এ শাস্ত্র পাঠ অপরিহার্য। এর মাধ্যমে নাগরিকের চিন্তাধারায় ইতিবাচক পরিবর্তন এসে রাষ্ট্র সম্পর্কিত সঠিক ধারণা জাগ্রত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সুনাগরিক হওয়ার শিক্ষা দেয় কোন শাস্ত্র?
(ক) অর্থনীতি (খ) সমাজবিজ্ঞান
(গ) লোক প্রশাসন (ঘ) পৌরনীতি ও সুশাসন

২। "স্বদেশ প্রেম জাগ্রত করার জন্য পৌরনীতির জ্ঞান খুবই জরুরি।"– কে বলেছেন?
(ক) ফ্রেডরিক জেমস গোল্ড (খ) পল জাঁনে
(গ) ই এম হোয়াইট (ঘ) রবার্ট পুটনাম

৩। পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠ করলে একজন নাগরিক উদ্বুদ্ধ হয়–
(ক) রাষ্ট্র সম্পর্কিত বোধে (খ) সাহিত্য চর্চায়
(গ) আত্মস্বার্থে (ঘ) কোনটিই নয়

পাঠ-১.৪ বাংলাদেশে পৌরনীতি ও সুশাসন অধ্যয়নের গুরুত্ব (Importance of Studying Civics and Good Governance in Bangladesh)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- বাংলাদেশে পৌরনীতি ও সুশাসন অধ্যয়নের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, গণ-অভ্যুত্থান, নাগরিক চেতনা, জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র।

বাংলাদেশে পৌরনীতি ও সুশাসন অধ্যয়নের গুরুত্ব

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল রাষ্ট্র। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন পরিস্থিতির ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য পৌরনীতি ও সুশাসন অধ্যয়নের গুরুত্ব অপরিসীম। নিম্নে বাংলাদেশে পৌরনীতি ও সুশাসন অধ্যয়নের গুরুত্ব তুলে ধরা হল–

১। **দেশকে ভালোবাসার শিক্ষা ঃ** পৌরনীতি ও সুশাসন দেশকে ভালোবাসার শিক্ষা দেয়। ত্রিশ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা। এ কষ্টার্জিত স্বাধীনতাকে রক্ষা করা সকল নাগরিকের কর্তব্য। দেশ, স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধকে ভালোবাসতে শেখায় পৌরনীতি ও সুশাসন।

২। **জাতীয় ইতিহাস জানা ঃ** বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস রয়েছে। এ ইতিহাস প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম প্রত্যেকের জানা দরকার। জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাস, যেমন- ভাষা আন্দোলন, গণ অভ্যুত্থান, মুক্তিযুদ্ধকে ভুলে গেলে দেশ কখনো উন্নতির শিখরে পৌঁছাতে পারবে না।

৩। **নাগরিক চেতনা বৃদ্ধি ঃ** পৌরনীতি ও সুশাসন নাগরিক চেতনা বৃদ্ধি করে। বাংলাদেশে জনসংখ্যা অত্যন্ত বেশি কিন্তু এর আয়তন ছোট। এ রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বহু সমস্যা বিদ্যমান। পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠ নাগরিকের চেতনা বৃদ্ধি করে এ সব বহুমুখী সমস্যা সমাধানের পথ তৈরি করে দেয়।

৪। **নাগরিক গুণাবলির বিকাশ ঃ** পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠ নাগরিকের মানসিক গুণাবলির বিকাশ সাধন করে। সুনাগরিক হওয়ার শিক্ষা, রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার, রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষা, নির্বাচনে যোগ্য প্রার্থীকে ভোট দেওয়া, সময়মত কর পরিশোধ করা ইত্যাদি বিষয়ে নাগরিকের গুণাবলির বিকাশ সাধন করে পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠ।

৫। **সুশাসন প্রতিষ্ঠা ঃ** বাংলাদেশের মত একটি উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত জরুরি। সুশাসন ব্যতীত এ রাষ্ট্রের গণতন্ত্র ও উন্নয়ন টেকসই হওয়া সম্ভব নয়। কিভাবে বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও স্থায়ী করা যায় তা পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠ করে জানা যায়।

৬। **নাগরিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঃ** পৌরনীতি ও সুশাসন অধ্যয়নের ফলে নাগরিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সাধিত হয়। মনের সংকীর্ণতা ও কুসংস্কার দূরীভূত হয় পৌরনীতি ও সুশাসন অধ্যয়নের ফলে। দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের ফলে রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের কর্তব্যবোধ জাগ্রত হয়। এর প্রভাবে নাগরিক জীবনে পূর্ণতা আসে।

৭। **গণতন্ত্রের বিকাশ ঃ** বাংলাদেশের গণতন্ত্র টেকসই, মজবুত, দীর্ঘস্থায়ী এবং বিশ্ব দরবারে প্রশংসনীয় করার জন্য এদেশের মানুষের পৌরনীতি ও সুশাসন অধ্যয়নের বিকল্প নেই। প্রত্যেক নাগরিকের গণতান্ত্রিক চেতনা বৃদ্ধির জন্য পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠ আবশ্যক। কেননা গণতন্ত্রের বিকাশ ব্যতীত বাংলাদেশের সত্যিকারের উন্নয়ন সম্ভব নয়।

৮। **সংবিধান সম্পর্কে জানা ঃ** সংবিধান রাষ্ট্রের দর্পণ স্বরূপ। ১৯৭২ বাংলাদেশের সালে সংবিধান কার্যকর হয়। রাষ্ট্র পরিচালনার সকল বিধি-বিধান বাংলাদেশ সংবিধানে লিপিবদ্ধ রয়েছে। সংবিধানের মাধ্যমে মানুষ জানতে পারে তাদের

অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে। পৌরনীতি ও সুশাসন অধ্যয়নের মাধ্যমে সংবিধান এবং সংবিধানে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়।

পরিশেষে বলা যায় যে, বাংলাদেশে পৌরনীতি ও সুশাসন অধ্যয়নের গুরুত্ব অপরিসীম। উত্তম নাগরিক জীবন ও সুখী সমৃদ্ধ দেশ গড়ার লক্ষ্যে পৌরনীতি ও সুশাসন অধ্যয়নের বিকল্প নেই।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	কি কি কারণে বাংলাদেশে পৌরনীতি ও সুশাসন অধ্যয়ন করা প্রয়োজন?

সার-সংক্ষেপ

বাংলাদেশ একটি স্বল্পোন্নত রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্রে নানাবিধ আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অনেক সমস্যা বিদ্যমান। এসব সমস্যা সমাধান করে আধুনিক, উন্নত ও কল্যাণকর নাগরিক জীবন প্রতিষ্ঠার জন্য পৌরনীতি ও সুশাসন অধ্যয়ন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর ফলে নাগরিক চেতনা বৃদ্ধি পায়, অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতা আসে, সরকার ও জনগণের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপিত হয়, দেশপ্রেম জাগ্রত হয়, গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস সম্পর্কে জানা যায়। গণতন্ত্র, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা পেয়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর হয় কত সালে?

(ক) ১৯৭১ সালে (খ) ১৯৭২ সালে

(গ) ১৯৭৩ সালে (ঘ) ১৯৭৪ সালে

২। নাগরিকের প্রধান কর্তব্য কি?

(ক) ভোট দেওয়া (খ) কর দেওয়া

(গ) রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করা (ঘ) প্রার্থী হওয়া

পাঠ-১.৫ পৌরনীতি ও সুশাসনের সাথে ইতিহাসের সম্পর্ক
(Relations between Civics and Good Governance and History)

এ পাঠ শেষে আপনি–

- পৌরনীতি ও সুশাসনের সাথে ইতিহাসের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, ঐতিহাসিক ঘটনাবলী, মানব সমাজ বিবর্তন।

পৌরনীতি ও সুশাসনের সাথে ইতিহাসের সম্পর্ক

পৌরনীতি ও সুশাসন এবং ইতিহাস উভয় শাস্ত্রই সামাজিক বিজ্ঞানের দুটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। ইতিহাস ব্যতীত পৌরনীতি ও সুশাসন যেমন পরিপূর্ণ নয়, তেমনি পৌরনীতি ও সুশাসন ছাড়া ইতিহাস স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে না। তাই পৌরনীতি ও সুশাসনের সাথে ইতিহাসের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।

সাদৃশ্য ঃ পৌরনীতি ও সুশাসন এবং ইতিহাসের মধ্যে বিদ্যমান সাদৃশ্যসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১। **পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতা ঃ** পৌরনীতি ও সুশাসন এবং ইতিহাস শাস্ত্রের মধ্যে পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিরাজমান। ইতিহাসের তথ্য বিনা পৌরনীতি ও সুশাসনের আলোচনা পূর্ণতা পায় না। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক জন সিলি (John Seely) বলেন, "পৌরনীতি ব্যতীত ইতিহাস মূল্যহীন, আর ইতিহাস ব্যতীত পৌরনীতি ভিত্তিহীন।"

২। **পারস্পরিক সহযোগিতা ঃ** পৌরনীতি ও সুশাসন এবং ইতিহাসের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতামূলক সম্পর্ক বিদ্যমান। ইতিহাস অতীতের ঘটনা প্রবাহ, বিপ্লব, সংগ্রাম, আন্দোলন, যুদ্ধ এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের বিবর্তন ও তত্ত্বসমূহ বিশ্লেষণ করে। পৌরনীতি ও সুশাসনে যখন অতীত ঘটনা প্রবাহ আলোচনা করা হয় তখন সেখানে ঐতিহাসিক বিকাশ ধারা সন্নিবেশিত হয়ে থাকে।

৩। **পরস্পরকে পরিপূর্ণতা দান ঃ** পৌরনীতি ও সুশাসন এবং ইতিহাস পরস্পরকে পরিপূর্ণতা দান করে থাকে। পৌরনীতি ও সুশাসনের আলোচনা ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ইতিহাসের সহযোগিতার প্রয়োজন হয়। ইতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহ ব্যতীত পৌরনীতি ও সুশাসনের ব্যাখ্যা পরিপূর্ণতা পায় না।

৪। **বিষয়বস্তুগত সাদৃশ্য ঃ** পৌরনীতি ও সুশাসন এবং ইতিহাসের মধ্যে বিষয়বস্তুগত সাদৃশ্য রয়েছে। পৌরনীতি ও সুশাসন এবং ইতিহাস উভয় শাস্ত্রেই মানব জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করে। পৌরনীতি ও সুশাসন নাগরিকের সামাজিক ও রাজনৈতিক কার্যকলাপ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করে থাকে। ইতিহাস মানব সমাজের বিবর্তনের ধারাবাহিকতার সংকলন করে থাকে। তাই উভয় শাস্ত্রের মৌলিক বিষয়বস্তুগত মিল লক্ষণীয়।

৫। **এক অপরের পরিপূরক ঃ** পৌরনীতি ও সুশাসন এবং ইতিহাস একে অপরের পরিপূরক হিসেবে বিবেচিত হয়। পৌরনীতি ও সুশাসনের আলোচ্য বিষয়ে ঐতিহাসিক দিক-নির্দেশনা ও তথ্যসমৃদ্ধ না হলে তা গ্রহণযোগ্যতা পায় না। তেমনি ঐতিহাসিক ঘটনা রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাপ্ত না করলে তা নিরর্থক হয়ে দাঁড়ায়।

বৈসাদৃশ্য ঃ

পৌরনীতি ও সুশাসন এবং ইতিহাসের মধ্যে বৈসাদৃশ্যসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১। **বিষয়বস্তুগত পার্থক্য ঃ** ইতিহাসের আলোচ্য বিষয়বস্তু পৌরনীতি ও সুশাসনের আলোচ্য বিষয়বস্তু থেকে ব্যাপক। পৌরনীতি ও সুশাসন কেবল নাগরিকের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা করে। প্রথাগত ইতিহাস শাস্ত্র কেবল রাজা-রাজত্ব নিয়ে আলোচনা করলেও, আধুনিক কালের জন ইতিহাস চর্চা নাগরিকের সামগ্রিক জীবন ধারা নিয়ে আলোচনা করা হয়। এভাবে দেখলে বিষয়বস্তুগত দিক থেকে ইতিহাস শাস্ত্র অনেকটা বিস্তৃত। পক্ষান্তরে পৌরনীতি ও সুশাসনের আলোচ্য বিষয় অনেকটাই সীমাবদ্ধ।

২। **প্রকৃতি ও পদ্ধতিগত পার্থক্য ঃ** পৌরনীতি ও সুশাসন এবং ইতিহাসের মধ্যে প্রকৃতি ও পদ্ধতিগত পার্থক্য বিদ্যমান। পৌরনীতি ও সুশাসনের আলোচনা প্রকৃতপক্ষে তত্ত্ব অনুসন্ধানমূলক। এটি করা হয় তুলনামূলক পদ্ধতিতে। অন্যদিকে ইতিহাসের আলোচনার পদ্ধতি প্রধানত তথ্য ও বর্ণনামূলক।

৩। **পরিধিগত পার্থক্য ঃ** পরিধিগত দিক দিয়ে ইতিহাসের চেয়ে পৌরনীতি ও সুশাসন কিছুটা সংকুচিত। পৌরনীতি ও সুশাসন রাষ্ট্র ও নাগরিকের রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে আলোচনা করে। ইতিহাস রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের পাশাপাশি একটি নির্দিষ্ট সময়ের শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, সভ্যতা, বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি, চিকিৎসা শাস্ত্রসহ নানাবিধ বিষয়াবলি নিয়ে আলোচনা করে।

৪। **প্রাধান্যগত পার্থক্য ঃ** প্রথাগত ইতিহাস শাস্ত্র মূলত অতীতের রাজনৈতিক, কিছু মাত্রায় সামাজিক, অর্থনৈতিক ঘটনাবলি আলোচনা করে। অন্যদিকে, পৌরনীতি ও সুশাসন ঐতিহাসিক ঘটনাবলি আলোচনার মাধ্যমে বর্তমান, ভবিষ্যৎ নাগরিক জীবনের কর্ম-পরিকল্পনার নির্দেশনা দিয়ে থাকে।

পরিশেষে বলা যায় যে, পৌরনীতি ও সুশাসন এবং ইতিহাসের মধ্যে কিছু বৈসাদৃশ্য থাকলেও উভয় শাস্ত্রের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	পৌরনীতি ও সুশাসন এর সাথে ইতিহাসের সম্পর্ক চিহ্নিত করুন।

সার-সংক্ষেপ

পৌরনীতি ও সুশাসন এবং ইতিহাস শাস্ত্র পরস্পরের পরিপূরক ও সহায়ক। এই দুই শাস্ত্র পারস্পরিক সহযোগিতায় পূর্ণতা লাভ করে। একটি ব্যতীত অপরটির আলোচনা অনেকটাই মূল্যহীন হয়ে পড়ে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। "পৌরনীতি ব্যতীত ইতিহাস মূল্যহীন, আর ইতিহাস ব্যতীত পৌরনীতি ভিত্তিহীন।"– উক্তিটি কে করেছেন?
(ক) লর্ড অ্যাকটন (খ) জন সিলি
(গ) ডেভিড ইস্টন (ঘ) কার্ল মার্কস

২। ইতিহাসের আলোচনা পদ্ধতি কেমন?
(ক) তত্ত্ব ও অনুসন্ধানমূলক (খ) তত্ত্ব ও বর্ণনামূলক
(গ) তথ্য ও বর্ণনামূলক (ঘ) তথ্য ও অনুসন্ধানমূলক

৩। কোনটি পৌরনীতি ও সুশাসনের আলোচ্য বিষয় নয়?
(ক) সরকার (খ) সভ্যতা ও সংস্কৃতি
(গ) নাগরিকতা (ঘ) সংবিধান

পাঠ-১.৬ পৌরনীতি ও সুশাসনের সাথে সমাজবিজ্ঞানের সম্পর্ক (Relations between Civics and Good Governance and Sociology)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- পৌরনীতি ও সুশাসনের সাথে সমাজবিজ্ঞানের সম্পর্ক আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	সামাজিক কাঠামো, শাসন প্রণালী, জনমত, মানবাধিকার, আমলাতন্ত্র, নৈতিকতা।

পৌরনীতি ও সুশাসনের সাথে সমাজবিজ্ঞানের সম্পর্ক

পৌরনীতি ও সুশাসন এবং সমাজবিজ্ঞান উভয়ই সামাজিক বিজ্ঞানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দুটি শাখা। সমাজবিজ্ঞানের মূল লক্ষ্যই হল সামাজিক কাঠামোর অভ্যন্তরে শৃঙ্খলা ও সংহতি সংরক্ষণের নীতিমালা উদঘাটন করা। সমাজবিজ্ঞান সম্পর্কে এল এফ ওয়ার্ড (L.F. Ward) বলেন, "Sociology is the science of society or of social phenomena." অন্যদিকে পৌরনীতি ও সুশাসন সমাজবিজ্ঞানের একটি শাখা হিসেবে নাগরিকের আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য, রাষ্ট্রের শাসন প্রণালীসহ নাগরিকের সামগ্রিক বিষয়াবলি সম্বন্ধে আলোচনা করে। তাই পৌরনীতি ও সুশাসন এবং সমাজবিজ্ঞানের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান।

সাদৃশ্য ঃ পৌরনীতি ও সুশাসন এবং সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে সাদৃশ্যসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১। **বিষয়বস্তুগত সাদৃশ্য ঃ** পৌরনীতি ও সুশাসন এবং সমাজবিজ্ঞানের অনেক বিষয়ের মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে। উভয় শাস্ত্রই পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, সংগঠন ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করে। এছাড়াও সামাজিক ও পারিবারিক মূল্যবোধ, সামাজিক পরিবর্তন, মানবাধিকার, নেতৃত্ব, আমলাতন্ত্র, জনমত, নৈতিকতা ইত্যাদি বিষয়াদি পৌরনীতি ও সুশাসন এবং সমাজবিজ্ঞানের আলোচনার অন্তর্ভূক্ত। তাই বিষয়বস্তুগত দিক থেকে উভয় শাস্ত্রের মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে।

২। **পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ঃ** পৌরনীতি ও সুশাসন এবং সমাজবিজ্ঞান একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। রাষ্ট্র সমাজেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। পৌরনীতি ও সুশাসন রাষ্ট্র নিয়ে আলোচনা করে তেমনি সমাজবিজ্ঞান সমাজ নিয়ে আলোচনা করে। রাষ্ট্র ব্যতীত যেমন সমাজের আলোচনা হয় না তেমনি সমাজ ছাড়া রাষ্ট্রের আলোচনা পূর্ণতা পায় না।

৩। **পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ঃ** পৌরনীতি ও সুশাসন এবং সমাজবিজ্ঞান পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। সমাজবিজ্ঞানের মূল আলোচ্য বিষয় সমাজ ও সামাজিক বিষয়াবলি এবং পৌরনীতি ও সুশাসনের মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে রাষ্ট্র ও নাগরিক। রাষ্ট্র ও নাগরিক আবার সমাজের অচ্ছেদ্য অংশ। তাই প্রকৃতপক্ষে পৌরনীতি ও সুশাসন এবং সমাজবিজ্ঞানের গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান।

৪। **পরস্পরের সহযোগী ঃ** পৌরনীতি ও সুশাসন এবং সমাজবিজ্ঞান একে অপরের সহযোগী। সমাজবিজ্ঞানের মূল আলোচনার বিষয়বস্তু সমাজ। আবার সমাজ সম্পর্কিত আলোচনায় পৌরনীতি ও সুশাসন সমাজের উৎপত্তি, সমাজের ক্রমবিকাশ, সামাজিক পরিবর্তন, সামাজিক মূল্যবোধ, সামাজিক নীতি ও আদর্শ আলোচনায় সমাজবিজ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ করে থাকে। অন্যদিকে, রাষ্ট্র ও নাগরিকতা বিষয়ক আলোচনায় সমাজবিজ্ঞান পৌরনীতি ও সুশাসনের সাহায্য গ্রহণ করে থাকে। কেননা, রাষ্ট্র ও নাগরিক পৌরনীতি ও সুশাসনের মুখ্য আলোচ্য বিষয়।

বৈসাদৃশ্য ঃ পৌরনীতি ও সুশাসন এবং সমাজবিজ্ঞানে মধ্যে বৈসাদৃশ্যসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১। **উৎপত্তিগত পার্থক্য ঃ** পৌরনীতি ও সুশাসন এবং সমাজবিজ্ঞানের উৎপত্তিগত পার্থক্য রয়েছে। পৌরনীতিতে বিশেষ করে সুশাসন একটি সাম্প্রতিক কালের ধারণা হলেও জ্ঞানের ক্ষেত্রে সমাজবিজ্ঞান অত্যন্ত পুরনো একটি শাখা। সমাজ জীবনের ঘটনাপ্রবাহ থেকে সমাজবিজ্ঞান এবং সমাজবদ্ধ মানুষের রাজনৈতিক কর্মকান্ড বিশ্লেষণ থেকে পৌরনীতি ও সুশাসনের উৎপত্তি।

২। **পরিধিগত পার্থক্য ঃ** পৌরনীতি ও সুশাসন এবং সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে পরিধিগত পার্থক্য রয়েছে। সমাজবিজ্ঞানের পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। সমাজের সার্বিক বিষয় সমাজবিজ্ঞানের মাধ্যমে পাওয়া যায়। অন্যদিকে পৌরনীতি ও সুশাসন সমাজেরই একটি অংশ রাষ্ট্র ও নাগরিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। সেক্ষেত্রে পৌরনীতি ও সুশাসনের পরিধি তুলনামূলকভাবে কম।

৩। **দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য ঃ** পৌরনীতি ও সুশাসন নাগরিকদের রাজনৈতিক দৃষ্টিকোন থেকে বিশ্লেষণ করে থাকে। অন্যদিকে সমাজবিজ্ঞান সমাজের দৃষ্টিকোণ থেকে নাগরিকের আচার-আচরণ বিশ্লেষণ করে থাকে। পৌরনীতি ও সুশাসন এবং সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্যের মূলে আছে, মানুষের মধ্যে একাধারে সামাজিক ও রাজনৈতিক সত্তার উপস্থিতি।

৪। **প্রকৃতিগত পার্থক্য ঃ** পৌরনীতি ও সুশাসন এবং সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য রয়েছে। পৌরনীতি ও সুশাসনের প্রকৃতি ব্যবহারিক যা মূলত সর্ববৃহৎ সামাজিক সংগঠন অর্থাৎ রাষ্ট্রের কর্মকান্ড নিয়ে ব্যাপৃত থাকে।

৫। **জ্ঞানের দুটি পৃথক শাখা ঃ** পৌরনীতি ও সুশাসন এবং সমাজবিজ্ঞান হল জ্ঞানের দুটি পৃথক শাখা। পৌরনীতি ও সুশাসন অধ্যয়নের ফলে রাষ্ট্র ও নাগরিকতা বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা যায়। অন্যদিকে সমাজবিজ্ঞান অধ্যয়নের ফলে সমাজের সার্বিক পরিবেশ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়।

পরিশেষে বলা যায় যে, পৌরনীতি ও সুশাসন এবং সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে কিছু বৈসাদৃশ্য থাকলেও উভয় শাস্ত্রের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও নিবিড়। একে অপরের পরিপূরক ও সহযোগী। এদের কোন একটিকে বাদ দিয়ে নাগরিকের সার্বিক কল্যাণ সম্ভব নয়।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	পৌরনীতি ও সুশাসন এর সাথে সমাজবিজ্ঞানের সম্পর্ক চিহ্নিত করুন।

সার-সংক্ষেপ

পৌরনীতি ও সুশাসন এবং সমাজবিজ্ঞান উভয়ই সামাজিক বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ দুটি শাখা। বিষয়বস্তুগত ও পরিধিগত কিছু বৈসাদৃশ্য থাকলেও উভয়ের সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন। পৌরনীতি ও সুশাসন এবং সমাজবিজ্ঞান একে অপরের কাছ থেকে রাষ্ট্র ও সমাজ সম্পর্কে বিভিন্ন তত্ত্ব, তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করে থাকে। সেজন্য পৌরনীতি ও সুশাসন এবং সমাজবিজ্ঞান একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী নয় বরং পরিপূরক। সমাজ ও রাষ্ট্রের সার্বিক কল্যানের জন্য একজন নাগরিকের যেমন পৌরনীতি ও সুশাসনের জ্ঞান থাকা আবশ্যক, তেমনি সমাজবিজ্ঞান পাঠেও তার মনযোগ থাকা বাঞ্ছনীয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। "Sociology is the sceince of society or of social phenomena."– উক্তিটি করেছেন কে?
(ক) এফ আই গ্লাউড (খ) এল এফ ওয়ার্ড
(গ) এরিস্টটল (ঘ) ম্যাকাইভার

২। সমাজবিজ্ঞানের মূল্য আলোচ্য বিষয় কি?
(ক) ব্যক্তি জীবন (খ) ধর্মীয় জীবন
(গ) রাষ্ট্রীয় জীবন (ঘ) সামাজিক জীবন

৩। জ্ঞানের কোন শাখা মানুষের রাষ্ট্রীয় জীবন সম্বন্ধে আলোচনা করে?
(ক) পৌরনীতি ও সুশাসন (খ) ইতিহাস
(গ) অর্থনীতি (ঘ) নীতিশাস্ত্র

৪। নাগরিকের কোন ধরনের কার্যাবলি পৌরনীতি ও সুশাসনের অন্যতম প্রধান বিষয়বস্তু?
(ক) ধর্মীয় (খ) সামাজিক
(গ) রাজনৈতিক (ঘ) অর্থনৈতিক

পাঠ-১.৭ পৌরনীতি ও সুশাসনের সাথে অর্থনীতির সম্পর্ক (Relations between Civics and Good Governance and Economics)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- পৌরনীতি ও সুশাসনের সাথে অর্থনীতি সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	অর্থনৈতিক জীবনধারা, বাজেট, জাতীয়করণ, সমবায় ব্যবস্থা, বৈদেশিক বাণিজ্য, পররাষ্ট্র নীতি।

পৌরনীতি ও সুশাসনের সাথে অর্থনীতির সম্পর্ক

পৌরনীতি ও সুশাসন এবং অর্থনীতির সম্পর্ক অন্যান্য বিষয়ের চেয়ে বেশি সুদৃঢ়। রাষ্ট্রের নাগরিকের রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ এবং অর্থনৈতিক জীবনধারা ইতিবাচক হলেই কেবল রাষ্ট্রে স্থিতিশীলতা বিরাজ করে। তাই উভয় শাস্ত্রের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।

সাদৃশ্য ঃ পৌরনীতি ও সুশাসন এবং অর্থনীতির মধ্যে সাদৃশ্যসমূহ নিম্নরূপঃ

১। **অভিন্ন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ** পৌরনীতি ও সুশাসন এবং অর্থনীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন। বিষয় আলাদা হলেও উভয়ের লক্ষ্য হল কল্যাণকর রাষ্ট্র গঠন ও মানবকল্যাণ সাধন করা। পৌরনীতি ও সুশাসন নাগরিকের গুণাবলি, নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য, নাগরিকতা অর্জন পদ্ধতি ইত্যাদি আলোচনার মাধ্যমে রাষ্ট্রের উন্নয়নে ভূমিকা রাখে। অর্থনীতি নাগরিকদের অসীম চাহিদার মাঝে সীমিত সম্পদকে কাজে লাগিয়ে কিভাবে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করা যায় সে বিষয়ে আলোচনা করে।

২। **অভিন্ন বিষয়বস্তু ঃ** পৌরনীতি ও সুশাসন এবং অর্থনীতির বিষয়বস্তুগত অভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। সমাজে বিদ্যমান প্রতিটি অর্থনৈতিক সমস্যার যেমন রাজনৈতিক দিক রয়েছে তেমনি রাজনৈতিক সমস্যারও অর্থনৈতিক দিক রয়েছে। সম্পদ, সম্পদের উৎপাদন ও বন্টন ব্যবসা, বাজেট, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, সমবায় ব্যবস্থা, জাতীয়করণ, বৈদেশিক বাণিজ্য, পররাষ্ট্রনীতি, জনসংখ্যা সমস্যা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে উভয় শাস্ত্রই আলোচনা করে।

৩। **পরস্পরের পরিপূরক ঃ** পৌরনীতি ও সুশাসন এবং অর্থনীতি পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। আধুনিক কল্যাণমূলক রাষ্ট্রে মানুষের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবন গভীরভাবে সম্পৃক্ত। একটির পরিবর্তনের সাথে অন্যটির পরিবর্তন সাধিত হয়। এ প্রসঙ্গে ম্যাকাইভার বলেন, "প্রত্যেক সরকার ব্যবস্থাই তার অনুরূপ সম্পত্তি ব্যবস্থাকে সংরক্ষণ করে, একটির পরিবর্তন হলে অন্যটিরও পরিবর্তন সাধিত হয়।

৪। **পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ঃ** পৌরনীতি ও সুশাসন এবং অর্থনীতি পরস্পর নির্ভরশীল। আধুনিক রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থায় অধিকাংশ কার্যপদ্ধতি অর্থনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট। রাষ্ট্র ও সরকারের সাফল্য এবং অগ্রগতি নির্ভর করে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার উপর। এ ধরনের পারস্পরিক সম্পর্কের কারণে যেকোন একটির ক্ষেত্রে অস্থিতিশীলতার জন্য রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হতে পারে। এ কারণেই বলা হয় যে, পৌরনীতি ও সুশাসন এবং অর্থনীতিকে বিচ্ছিন্নভাবে বিবেচনায় নেয়ার সুযোগ নেই।

৫। **জনকল্যাণ সাধন ঃ** পৌরনীতি ও সুশাসন এবং অর্থনীতি উভয় শাস্ত্রের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে জনগণের কল্যাণ সাধন। আধুনিক কল্যাণমূলক রাষ্ট্রকে জনগণের কল্যাণার্থে বহুমুখী অর্থনৈতিক কর্মপরিকল্পনা ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হয়। এসব কর্ম-পরিকল্পনা পরিচালিত হয় রাষ্ট্র ও সরকার কর্তৃক। তাই জনগণের সার্বিক কল্যাণ সাধনে উভয় শাস্ত্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

বৈসাদৃশ্য ঃ পৌরনীতি ও সুশাসন এবং অর্থনীতির মধ্যে বৈসাদৃশ্যসমূহ নিম্নরূপঃ

১। **বিষয়বস্তুগত পার্থক্য ঃ** পৌরনীতি ও সুশাসন মূলত রাষ্ট্র, সরকার, নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য অর্থাৎ নাগরিকতার সাথে জড়িত বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। অন্যদিকে, অর্থনীতির প্রধান আলোচ্য বিষয় হচ্ছে মানুষের সামগ্রিক অর্থনৈতিক কার্যাবলি।

২। **পদ্ধতিগত পার্থক্য ঃ** পৌরনীতি ও সুশাসন এবং অর্থনীতির মধ্যে পদ্ধতিগত পার্থক্য দৃশ্যমান। পৌরনীতি ও সুশাসনের অনুশীলন পদ্ধতি ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক। এ পদ্ধতি অনেকটা তাত্ত্বিক ধরনের। কিন্তু অর্থনীতির অনুশীলন পদ্ধতি অনেক ক্ষেত্রেই গাণিতিক সূত্র সংশ্লিষ্ট।

৩। **গুরুত্বের ক্ষেত্রে পার্থক্য ঃ** পৌরনীতি ও সুশাসন রাষ্ট্র, সরকার, সংবিধান, নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য, আইনের শাসন, জবাবদিহিতার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে। অন্যদিকে অর্থনীতি মানুষের আয়, সম্পদ, চাহিদা, বন্টন বাজেট, সুদ, লোন, বাজার ব্যবস্থা অর্থাৎ সামগ্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর বেশি গুরুত্ব প্রদান করে।

পরিশেষে বলা যায় যে, পৌরনীতি ও সুশাসন এবং অর্থনীতির মধ্যে কিছু ক্ষেত্রে পার্থক্য থাকলেও উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত কার্যকরী। উভয়ের সমন্বিত উদ্যোগে রাষ্ট্রের কল্যাণ সাধিত হয়।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	পৌরনীতি ও সুশাসন এর সাথে অর্থনীতির সম্পর্ক এত নিবিড় হবার কারণ কি?

সার-সংক্ষেপ

পৌরনীতি ও সুশাসন এবং অর্থনীতি সামাজিক বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ দুটি শাখা। কিছু বৈসাদৃশ্য থাকলেও উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। উভয় শাস্ত্রের মূল লক্ষ্য হল নাগরিকের সার্বিক কল্যাণ সাধন করা। নাগরিকের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় এর মাধ্যমে। রাষ্ট্রের রাজনৈতিক পরিস্থিতি স্থিতিশীল হলে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি যেমন স্থিতিশীল হয়, তেমনি অর্থনৈতিক পরিস্থিতি স্থিতিশীল হলে রাজনৈতিক পরিস্থিতিও স্থিতিশীল হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। মানুষের অসীম চাহিদার মাঝে সীমিত সম্পদকে কাজে লাগিয়ে উন্নয়নের পথ নির্দেশ করে কোন শাস্ত্র?
(ক) পৌরনীতি ও সুশাসন (খ) সমাজবিজ্ঞান
(গ) অর্থনীতি (ঘ) ভূগোল ও পরিবেশ

২। "প্রত্যেক সরকার ব্যবস্থাই তার অনুরূপ সম্পত্তি ব্যবস্থাকে সংরক্ষণ করে, একটির পরিবর্তন হলে অন্যটিরও পরিবর্তন সাধিত হয়"– উক্তিটি কার?
(ক) অধ্যাপক গেটেল (খ) অধ্যাপক ম্যাকাইভার
(গ) অধ্যাপক ফাইনার (ঘ) অধ্যাপক গার্নার

৩। কোন বিষয়ের অনুশীলন পদ্ধতি অনেক ক্ষেত্রেই গাণিতিক সূত্র সংশ্লিষ্ট?
(ক) অর্থনীতি (খ) বাংলা
(গ) সমাজবিজ্ঞান (ঘ) সমাজকর্ম

৪। কোন বিষয়ের অনুশীলন পদ্ধতি ঐতিহাসিক?
(ক) অর্থনীতি (খ) সমাজবিজ্ঞান
(গ) সমাজকর্ম (ঘ) পৌরনীতি ও সুশাসন

পাঠ-১.৮ পৌরনীতি ও সুশাসনের সাথে নীতিশাস্ত্রের সম্পর্ক (Relations between Civics and Good Governance and Ethics)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- পৌরনীতি ও সুশাসনের সাথে নীতিশাস্ত্রের সম্পর্ক পর্যালোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	নীতিশাস্ত্র, নৈতিকতা, মূল্যবোধ, রীতিনীতি।

পৌরনীতি ও সুশাসনের সাথে নীতিশাস্ত্রের সম্পর্ক

পৌরনীতি ও সুশাসন রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের নাগরিকের বাহ্যিক আচরণ নিয়ে আলোচনা করে। অন্যদিকে, নীতিশাস্ত্র নাগরিকের নৈতিকতা সম্বন্ধীয় বিষয়াবলি আলোচনা করে থাকে। উভয় শাস্ত্রের উদ্দেশ্য জনগণের কল্যাণ সাধন করা। সেক্ষেত্রে পৌরনীতি ও সুশাসন এবং নীতিশাস্ত্রের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।

সাদৃশ্য ঃ পৌরনীতি ও সুশাসন এবং নীতিশাস্ত্রের মধ্যে বিরাজমান সাদৃশ্যসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১। **অভিন্ন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ** পৌরনীতি ও সুশাসন এবং নীতি শাস্ত্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অভিন্ন। পৌরনীতি ও সুশাসনের মূল উদ্দেশ্য সুনাগরিকতা অর্জন। অন্যদিকে, নীতিশাস্ত্রের মূল উদ্দেশ্য নাগরিকদের নৈতিকভাবে উন্নত মনের মানুষ গড়ে তোলা। নাগরিকদেরকে ন্যায়-অন্যায়, সৎ-অসৎ, ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিত সম্পর্কিত শিক্ষা দেয় নীতিশাস্ত্র। তাই উদ্দেশ্যগত অর্থে উভয়শাস্ত্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অভিন্ন।

২। **বিষয়বস্তুগত সাদৃশ্য ঃ** পৌরনীতি ও সুশাসন এবং নীতিশাস্ত্রের মধ্যে বিষয়বস্তুগত সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। পৌরনীতি ও সুশাসন নাগরিকের আচার-আচরণ, অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য নিয়ে আলোচনা করে। অন্যদিকে নীতিশাস্ত্র মানুষের আচরণ, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ নিয়ে আলোচনা করে। তাই উভয় শাস্ত্রের মধ্যে বিষয়বস্তুগত সাদৃশ্য রয়েছে।

৩। **পরস্পর পরিপূরক ঃ** পৌরনীতি ও সুশাসন এবং নীতিশাস্ত্র পরস্পরের পরিপূরক। যেকোন নৈতিক আদর্শ নাগরিক দ্বারা স্বীকৃত হলে রাষ্ট্র সহজেই সেটাকে আইনে পরিণত করতে পারে। আবার রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত হলেও কোন আইন নৈতিকতা বিরোধী হলে জনগণ তা প্রত্যাখ্যান করে। এ প্রসঙ্গে সি জে ফক্স (C. J. Fox) বলেন, "ন্যায়নীতির দিক থেকে যা অন্যায় তা রাজনৈতিক দিক থেকে ন্যায় হতে পারে না।"

৪। **পরস্পর নির্ভরশীল ঃ** পৌরনীতি ও সুশাসন এবং নীতিশাস্ত্র পরস্পর নির্ভরশীল। উভয় শাস্ত্রের মূল লক্ষ্য নৈতিকতা ও সুনাগরিকতার জ্ঞানের মাধ্যমে জনগণের কল্যাণ সাধন। এ প্রসঙ্গে আইভর ব্রাউন (Ivor Brown) বলেন, "নীতিশাস্ত্রের ধারণা রাজনৈতিক মতবাদ ছাড়া অসম্পূর্ণ এবং নীতিশাস্ত্রের ধারণা প্রতিফলিত না হলে রাজনৈতিক মতবাদ অর্থহীন।"

বৈসাদৃশ্য ঃ পৌরনীতি ও সুশাসন এবং নীতিশাস্ত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বৈসাদৃশ্যসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১। **পরিধি ও বিষয়বস্তুগত পার্থক্য ঃ** পৌরনীতি ও সুশাসন এবং নীতিশাস্ত্রের মধ্যে বিষয়বস্তুগত পার্থক্য রয়েছে। পৌরনীতি ও সুশাসনের চেয়ে নীতিশাস্ত্রের বিষয়বস্তু ও পরিধি ব্যাপক। পৌরনীতি ও সুশাসন মানুষের বাহ্যিক আচরণ নিয়ে আলোচনা করে। অন্যদিকে নীতিশাস্ত্র মানুষের বাহ্যিক আচরণের পাশাপাশি চিন্তাগত অবস্থান নিয়েও আলোচনা করে।

২। **বাধ্যবাধকতার পার্থক্য ঃ** পৌরনীতি ও সুশাসনে আলোচ্য রাষ্ট্রীয় আইন যা মান্য করা বাধ্যতামূলক। এ আইন অমান্য করলে তাকে শাস্তি পেতে হয়। কিন্তু নীতিশাস্ত্রে আলোচ্য নৈতিক বিধানাবলি বাধ্যতামূলক নয়।

৩। **স্থানভেদে আইন ও নৈতিকতা ঃ** পৌরনীতি ও সুশাসনের অন্তর্ভূক্ত রাষ্ট্রীয় আইন সকল দেশে একই রকম নাও হতে পারে। যেমন– অনেক দেশ মৃত্যুদন্ড বিধান রহিত করেছে। পক্ষান্তরে, অনেক দেশে মৃত্যুদন্ড চালু আছে। নীতিশাস্ত্রের অন্তর্ভূক্ত বিধি-বিধানগুলো পৃথিবীর সকল দেশে প্রায় একই রকম।

৪। **ভিত্তির ক্ষেত্রে পার্থক্য ঃ** পৌরনীতি ও সুশাসনের আলোচ্য বিষয়ের মূল ভিত্তি হল রাজনৈতিক। নৈতিকতার স্থান এখানে সুদৃঢ় নয়। অন্যদিকে, নীতিশাস্ত্রের অন্তর্ভূক্ত নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সামাজিক সমর্থনের উপর প্রতিষ্ঠিত ও স্বীকৃত।

পরিশেষে বলা যায় যে, উভয় শাস্ত্রের মধ্যে কিছু বৈসাদৃশ্য থাকলেও উভয়ের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। উভয় শাস্ত্রেরই লক্ষ্য মানব কল্যাণ করা।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	পৌরনীতি ও সুশাসন এর সাথে নীতিশাস্ত্রের সম্পর্ক এত নিবিড় হবার কারণ কি?

সার-সংক্ষেপ

পৌরনীতি ও সুশাসন এবং নীতি শাস্ত্রের মধ্যে বিষয়গত কিছু পার্থক্য থাকলেও, এদের মধ্যেকার সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। পৌরনীতি ও সুশাসনে আলোচিত নাগরিকের আচার-আচরণ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের, গঠন ও কার্যাবলি নীতিশাস্ত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত। নীতিশাস্ত্র মানুষের আচার-আচরণ, মূল্যবোধ ও সামাজিক ন্যায়-অন্যায়ের মানদন্ড। উভয় শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় হল মানুষ ও মানুষের আচরণকে ন্যায়বোধের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। "ন্যায় নীতির দিক থেকে যা অন্যায় তা রাজনৈতিক দিক থেকে ন্যায় হতে পারে না।"– উক্তিটি কে করেছেন?
(ক) আইভর ব্রাউন (খ) সি জে ফক্স
(গ) ম্যাকাইভার (ঘ) লর্ড অ্যাকটন

২। "নীতিশাস্ত্রের ধারণা রাজনৈতিক মতবাদ ছাড়া অসম্পূর্ণ এবং নীতিশাস্ত্রের ধারণা প্রতিফলিত না হলে রাজনৈতিক মতবাদ অর্থহীন।"– উক্তিটি কে করেছেন?
(ক) আর এম ম্যাকাইভার (খ) জেমস মিল
(গ) আইভর ব্রাউন (ঘ) আর জি গেটেল

৩। নাগরিকের বাহ্যিক আচরণ নিয়ে আলোচনা করে কোন শাস্ত্র?
(ক) পৌরনীতি ও সুশাসন (খ) নীতিশাস্ত্র
(গ) সমাজবিজ্ঞান (ঘ) অর্থনীতি

৪। নৈতিকতা ও মূল্যবোধ নিয়ে আলোচনা করে কোন শাস্ত্র?
(ক) পৌরনীতি ও সুশাসন (খ) সমাজবিজ্ঞান
(গ) ভূগোল (ঘ) নীতিশাস্ত্র

৫। কোন আইন মান্য করা বাধ্যতামূলক?
(ক) সামাজিক আইন (খ) রাষ্ট্রীয় আইন
(গ) সাংগঠনিক আইন (ঘ) কোনটিই নয়

পাঠ-১.৯ পৌরনীতি ও সুশাসনের সাথে লোক প্রশাসনের সম্পর্ক (Relations between Civics and Good Governance and Public Administration)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- পৌরনীতি ও সুশাসনের সাথে লোক প্রশাসনের সম্পর্ক আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	জনশক্তি, সম্পদ, সুষ্ঠু সংগঠন, ব্যবস্থাপনা, রাষ্ট্রের উৎপত্তি, আমলাতন্ত্র, সুনাগরিকতা, জনকল্যাণ।

পৌরনীতি ও সুশাসনের সাথে লোক প্রশাসনের সম্পর্ক

পৌরনীতি ও সুশাসন এবং লোক প্রশাসন সমাজবিজ্ঞানের অন্তর্ভূক্ত দুটি পৃথক শাখা। পৌরনীতি ও সুশাসন নাগরিক ও রাষ্ট্রের রাজনৈতিক দিক নিয়ে আলোচনা করে থাকে। অন্যদিকে লোক প্রশাসন সরকারের কার্যাবলি ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য জনশক্তি এবং সম্পদের সুষ্ঠু সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা করে থাকে। সেজন্য উভয় শাস্ত্রের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।

সাদৃশ্য ঃ পৌরনীতি ও সুশাসন এবং লোক প্রশাসনের মধ্যে সাদৃশ্যসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১। **উৎপত্তিগত সাদৃশ্য ঃ** পৌরনীতি ও সুশাসন এবং লোক প্রশাসনের মধ্যে উৎপত্তিগত সাদৃশ্য রয়েছে। উভয় শাস্ত্রই অতীতে সমাজবিজ্ঞানের অন্তর্ভূক্ত ছিল। একপর্যায়ে সমাজবিজ্ঞান থেকে পৌরনীতি ও সুশাসন এবং লোক প্রশাসন পৃথক হয়ে যায়।

২। **পরস্পর নির্ভরশীল ঃ** পৌরনীতি ও সুশাসন এবং লোক প্রশাসন পরস্পর নির্ভরশীল। নাগরিকের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা পৌরনীতি ও সুশাসনের মূল লক্ষ্য; তবে লোক প্রশাসন জ্ঞান ছাড়া তা বাস্তবায়ন করা যায় না। আবার লোক প্রশাসন সরকারের বিভিন্ন বিধি-বিধান বাস্তবায়নের মাধ্যমে নাগরিকের জীবনমান উন্নত করে। আর এক্ষেত্রে পৌরনীতি ও সুশাসন শাস্ত্রে পরামর্শ একান্ত আবশ্যক।

৩। **আলোচ্য বিষয়ে সাদৃশ্য ঃ** পৌরনীতি ও সুশাসন এবং লোক প্রশাসনের মধ্যে আলোচ্য বিষয়গত সাদৃশ্য বিদ্যমান। পৌরনীতি ও সুশাসন রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের উৎপত্তি, সংগঠন, ব্যবস্থাপনা, আমলাতন্ত্র ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। অন্যদিকে লোক প্রশাসন রাষ্ট্রের এসব প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন নিয়ে আলোচনা করে থাকে।

৪। **আবশ্যকতায় সাদৃশ্য ঃ** পৌরনীতি ও সুশাসন এবং লোক প্রশাসনের আবশ্যকতায় সাদৃশ্য রয়েছে। আধুনিক কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের জন্য লোক প্রশাসনের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা যেমন দরকার তেমনি দরকার পৌরনীতি ও সুশাসনের পরামর্শ। তাই পৌরনীতি ও সুশাসন এবং লোক প্রশাসন সুশাসন বাস্তবায়ন ও জনকল্যাণের বিভিন্ন বিষয়ে নির্দেশনা দিয়ে থাকে।

বৈসাদৃশ্য ঃ পৌরনীতি ও সুশাসন এবং লোক প্রশাসনের মধ্যে বৈসাদৃশ্যসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১। **উদ্দেশ্যগত পার্থক্য ঃ** পৌরনীতি ও সুশাসন এবং লোক প্রশাসনের মধ্যে উদ্দেশ্যগত পার্থক্য রয়েছে। পৌরনীতি ও সুশাসনের উদ্দেশ্য হচ্ছে নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতি, নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য, সুনাগরিকতা এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা। অন্যদিকে লোক প্রশাসনের মূল উদ্দেশ্য হল সরকারি সিদ্ধান্ত ও নীতির বাস্তবায়ন।

২। **পরিধিগত পার্থক্য ঃ** পৌরনীতি ও সুশাসন এবং লোক প্রশাসনের মধ্যে পরিধিগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। লোক প্রশাসনের পরিধি অপেক্ষা পৌরনীতি ও সুশাসনের পরিধি ব্যাপক। পৌরনীতি ও সুশাসন রাষ্ট্র, সরকার, নাগরিকতা সম্পর্কীয় বিষয়াবলি নিয়ে আলোচনা করে। অন্যদিকে লোক প্রশাসন প্রধানত রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন নীতি সম্পর্কে আলোচনা করে।

৩। ক্ষমতাগত পার্থক্য ঃ পৌরনীতি ও সুশাসন এবং লোক প্রশাসনের মধ্যে ক্ষমতাগত পার্থক্য দৃশ্যমান। পৌরনীতি ও সুশাসন হচ্ছে অনেকটা চর্চার বিষয়। অন্যদিকে, লোক প্রশাসন হল প্রায়োগিক বিষয়। পৌরনীতি ও সুশাসন ক্ষমতার নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। অন্যদিকে লোক প্রশাসন মূলত: প্রশাসনকেন্দ্রিক আলোচনা করে।

পরিশেষে বলা যায় যে, উভয় শাস্ত্রের মধ্যে কিছু বিষয়ে পার্থক্য থাকলেও উভয় শাস্ত্রের মধ্যে রয়েছে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। পৌরনীতি ও সুশাসনের দিক নির্দেশনা ও পরামর্শ এবং লোক প্রশাসনের বাস্তবিক প্রয়োগের মাধ্যমে রাষ্ট্রের যথাযথ কল্যাণ সম্ভব।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	পৌরনীতি ও সুশাসন এর সাথে লোক প্রশাসনের সম্পর্ক চিহ্নিত করুন।

সার-সংক্ষেপ

পৌরনীতি ও সুশাসন এবং লোক প্রশাসন উভয়ই সামাজিক বিজ্ঞানের দুটি শাখা। সময়ের বিবর্তনে এই দুই শাস্ত্র পৃথক ধারায় প্রবাহিত হয়েছে মাত্র। যে শাস্ত্র নাগরিকতা ও রাষ্ট্রের রাজনৈতিক দিক নিয়ে বিশ্লেষণ করে তাকে পৌরনীতি ও সুশাসন বলে। অন্যদিকে, সরকারের কার্যাবলি এবং উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য জনশক্তি ও সম্পদের সুষ্ঠু সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা হল লোক প্রশাসন। তাই উভয়ই শাস্ত্র একে অপরের পরিপূরক হয়ে রাষ্ট্রের উন্নয়ন পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৯

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। পৌরনীতি ও সুশাসন এবং লোক প্রশাসন কোন বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত?
(ক) সমাজবিজ্ঞান (খ) অর্থনীতি
(গ) ইতিহাস (ঘ) নীতিশাস্ত্র

২। সরকারের নীতি ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করে–
(ক) পৌরনীতি ও সুশাসন (খ) লোক প্রশাসন
(গ) অর্থনীতি (ঘ) ইতিহাস

৩। লোক প্রশাসনের প্রকৃতি কিরূপ?
(ক) কাল্পনিক (খ) বাহ্যিক
(গ) বাস্তবভিত্তিক (ঘ) কোনটিই নয়

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১। পৌরনীতির ও সুশাসনের আলোচ্য বিষয় হল–
(i) সুশাসন (ii) রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও বিকাশ (iii) ব্যবসায়িক মুনাফা অর্জন প্রক্রিয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২। সুশাসন শব্দটি সমর্থন করে–
(i) মানবাধিকারের নিশ্চয়তা (ii) স্বাধীন বিচার বিভাগ (iii) শাসক ও শাসিতের মধ্যে বিদ্যমান সুসম্পর্ক
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩নং ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দিন:
রায়হান মাহমুদ নিয়মিত কর পরিশোধ করেন। তার উদ্দেশ্য দেশ ও জাতির কল্যাণের পাশাপাশি প্রতিটি কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা রক্ষা করা।

৩। রায়হান মাহমুদ নিয়মিত কর পরিশোধের জ্ঞান অর্জন করেছেন কোন শাস্ত্র থেকে?
(ক) অর্থনীতি (খ) ইতিহাস
(গ) পৌরনীতি ও সুশাসন (ঘ) নীতিশাস্ত্র

৪। রায়হান মাহমুদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার উদ্দেশ্য–
(i) সুশাসন প্রতিষ্ঠা (ii) আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা (iii) মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii
(গ) i ও ii (ঘ) i, ii ও iii

৫। পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠ করলে–
(i) রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায়
(ii) উদার দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন হয়
(iii) সুশাসন প্রতিষ্ঠা হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৬। পৌরনীতি ও সুশাসন একটি–
(i) স্থিতিশীল সামাজিক বিজ্ঞান
(ii) গতিশীল সামাজিক বিজ্ঞান
(iii) গতিশীল রাষ্ট্রবিজ্ঞান
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii
(গ) iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন ঃ

১। সোমা মৈত্র রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষক। তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা নেয়ার উপরে গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, প্রত্যেককে নিজ নিজ রাষ্ট্রের উন্নয়নের পাশাপাশি বিশ্ব সভ্যতার উন্নয়নে কাজ করতে হবে। তবেই দেশ ও বিশ্ব এগিয়ে যাবে উন্নতির শিখরে।

(ক) পৌরনীতির সংজ্ঞা দিন।

(খ) পৌরনীতিকে নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান বলা হয় কেন?

(গ) উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়ে ধারণা নেওয়ার জন্য সোমা মৈত্র শিক্ষার্থীদের কোন বিষয়ের জ্ঞানার্জন করার কথা বলেন? ব্যাখ্যা করুন।

(ঘ) উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়ের জ্ঞান বিশ্বসভ্যতার উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে – আপনি কি একমত? আপনার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দিন।

২। একাদশ শ্রেণির পঠিতব্য বিষয়গুলোর মধ্যে একটি বিষয় সানজিদা খাতুনের খুব ভালো লাগে। এই বিষয়টিতে নাগরিক ও নগররাষ্ট্র নিয়ে আলোচনা হয়। ক্লাসে কাজী সরোয়ার স্যার যখন সুন্দরভাবে নাগরিক অধিকার, কর্তব্য, সাম্য, স্বাধীনতা সম্পর্কে আলোচনা করেন, তখন সে নিজের অবস্থান নির্ধারণ করারও চেষ্টা করে।

(ক) Civitas শব্দের অর্থ কী?

(খ) পৌরনীতি বলতে কি বোঝায়?

(গ) উদ্দীপকের সরোয়ার স্যারের ক্লাস সানজিদাকে আকৃষ্ট করে কেন? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করুন।

(ঘ) "শুধু সানজিদা খাতুন নয়– সকল নাগরিকই এরূপ বিষয় অধ্যয়ন করা প্রয়োজন।" আপনি কি একমত? বিশ্লেষণ করুন।

৩। তানভীর আহমেদ একটি উন্নয়নশীল দেশের নাগরিক। দেশটিতে আইনের শাসনের অনুপস্থিতি, রাজনৈতিক অস্থিরতা, দুর্নীতি, সন্ত্রাস, মানসম্মত শিক্ষার অভাবসহ নানাবিধ সমস্যা বিদ্যমান। বর্তমান সময়ে দেশটির গণতন্ত্রমনা রাজনৈতিক দলগুলো এসব সমস্যার সমাধানে বেশ আগ্রহী। এমন কী দেশটির সচেতন জনগণও এ ব্যাপারে ইতিবাচক।

(ক) সুশাসন কী?

(খ) আইনের শাসন বলতে কী বোঝায়?

(গ) তানভীর আহমেদের দেশটিতে কীভাবে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব? ব্যাখ্যা করুন।

(ঘ) সুশাসন প্রতিষ্ঠা কেন বাধাগ্রস্ত হয়? আপনার মতামত দিন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.১	ঃ	১। ক	২। গ	৩। ক	৪। গ	৫। ক			
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.২	ঃ	১। ক	২। গ						
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৩	ঃ	১। খ	২। ঘ	৩। খ	৪। ক				
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৪	ঃ	১। খ	২। ঘ	৩। গ					
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৫	ঃ	১। খ	২। গ	৩। খ	৪। ঘ				
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৬	ঃ	১। খ	২। গ	৩। ঘ	৪। ক	৫। গ			
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৭	ঃ	১। গ	২। খ	৩। ক	৪। ঘ				
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৮	ঃ	১। খ	২। গ	৩। ক	৪। ঘ	৫। খ			
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৯	ঃ	১। ক	২। খ	৩। গ					
চূড়ান্ত মূল্যায়ন	ঃ	১। ক	২। গ	৩। ক	৪। গ	৫। ঘ	৬। খ		

সুশাসন (Good Governance)

ইউনিট ২

পৌরনীতি ও সুশাসনের অন্যতম একটি বিষয়বস্তু হল সুশাসন। শাসন ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সম্পদের সুষ্ঠু বন্টন, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠাসহ আরো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা যায়। সময়ের উপযোগিতার দিকে লক্ষ্য রেখে এ বিষয়টি পাঠ অতীব জরুরি। তাই এই ইউনিটে সুশাসনের ধারণা, বৈশিষ্ট্য, গুরুত্ব, বাংলাদেশে সুশাসনের সমস্যা ও তার সমাধান এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার কার কি ধরনের ভূমিকা তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এই ইউনিটের পাঠসমূহ-

পাঠ-২.১ ঃ সুশাসনের ধারণা	পাঠ-২.৪ ঃ বাংলাদেশে সুশাসনের সমস্যা
পাঠ-২.২ ঃ সুশাসনের বৈশিষ্ট্য	পাঠ-২.৫ ঃ সুশাসনের সমস্যার সমাধান
পাঠ-২.৩ ঃ সুশাসনের গুরুত্ব	পাঠ-২.৬ ঃ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নাগরিক ও সরকারের ভূমিকা

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ**

পাঠ-২.১ সুশাসনের ধারণা (Concept of Good Governance)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- সুশাসন সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন।
- সুশাসন এর প্রধান কার্যক্রম কি তা বুঝতে পারবেন।
- সুশাসন এর প্রধান প্রধান উপাদান সম্পর্কে ধারণা পাবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	শাসন, সম্পদ বিতরণ, ব্যবস্থাপনা।

সুশাসনের ধারণা

পৌরনীতি শাস্ত্রের যাত্রালগ্ন থেকেই শাসনের (Governance) ধারণাটি বিস্তার লাভ করেছে। তাই বর্তমান বিশ্বে 'শাসন' শব্দটি বহুল প্রচলিত হলেও, এটা কোনো নতুন ধারণা নয়। মৌলিক অর্থে, শাসন বলতে বুঝানো হয়, সমাজ ও অর্থনীতিকে সকলের কল্যাণের স্বার্থে পরিচালনা করা। বব জেসপের (Bob Jessop) ভাষায় শাসন হচ্ছে একটি গতিশীল প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন উপায়ে অর্থনীতি ও সমাজের অগ্রগতির প্রচেষ্টার সাথে সকল শ্রেণির মানুষকে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করা হয়। সহজ কথায়, শাসন-এর অর্থ সমাজের জন্য সমষ্টিগত লক্ষ্য নির্ধারণ করা এবং কীভাবে এই লক্ষ্যে পৌঁছানো যায় তার উপায় ঠিক করা। বর্তমানে শাসন শুধুমাত্র সরকারের একার কাজ নয়। সরকারের পাশাপাশি নাগরিকদের সেবা দিতে এগিয়ে আসছে বাজার ব্যবস্থা ও বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। বেসরকারি খাত শাসন কার্যক্রমে

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। সরকারি হাসপাতালগুলোর পাশাপাশি এখন জনগণকে স্বাস্থ্য সেবা দিচ্ছে বেসরকারি হাসপাতালগুলোও। যদিও এই স্বাস্থ্য সেবা গরীব মানুষের নাগালের বাইরে। কারণ, বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার খরচ অনেক বেশি। বিকল্প হিসেবে কিছু-কিছু এনজিও স্বল্প মূল্যে দরিদ্রদের স্বাস্থ্য সেবা দিচ্ছে।

১৯৯০-এর দশক থেকেই শাসন প্রত্যয়টি বিশ্বব্যাপী নতুন করে গুরুত্ব পেতে শুরু করেছে। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থাগুলো উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়নের পথে বাঁধা হিসেবে সুশাসনের (Good Governance) অভাবকে চিহ্নিত করে। শাসনের গুনগত মান যে সব সময় একরকম হবে, তা নয়। সে কারণে প্রাচীন গ্রীসে আজ থেকে ২৬০০ বছর আগে দার্শনিক প্লেটো আদর্শ শাসকের কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, আদর্শ শাসক হবেন একজন দার্শনিক রাজা, যার ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও পরিবার থাকবে না। কারণ, এগুলো থাকলে একজন শাসক জনগণকে যে ধরনের ওয়াদা করেন, সে অনুযায়ী কাজ করতে পারবেন না। তিনি ব্যক্তিগত লোভে আসক্ত হয়ে পড়বেন। প্লেটোর পর থেকে আধুনিক যুগের দার্শনিকগণও উত্তম শাসনের বিষয়ে ভেবেছেন। জন লকের ভাষায়, উত্তম রাষ্ট্র হবে সেই রাষ্ট্র, যে রাষ্ট্র জনগণের জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তির নিরাপত্তা দেয়। কার্ল মার্কস মনে করেন শ্রমজীবী মানুষের সরকারই উত্তম সরকার। বৃহত্তর অর্থে নাগরিকদের কল্যাণের উদ্দেশ্য ভালোভাবে শাসন পরিচালনার নামই সুশাসন। জনগণকে দেয়া সরকারের প্রতিশ্রুতি ও তার বাস্তবায়নকেই সুশাসনের আওতায় ভাবা যায়। তবে একটি দেশের সুশাসন প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়ায় সেই দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্তর এবং সামাজিক পরিবেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সুশাসনের অন্তঃসার হচ্ছে সুষ্ঠু, বাস্তবায়নযোগ্য নীতি এবং নীতি বাস্তবায়নের জন্য একটি পেশাদারী আমলাতন্ত্র এবং শাসনবিভাগ, যা এর কর্মকাণ্ডের জন্য জনগণের কাছে জবাবদিহিমূলক হবে। সুশাসনের জন্য আরও প্রয়োজন হচ্ছে জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ভূমিকা রাখতে আগ্রহী একটি শক্তিশালী সুশীল সমাজ। সর্বোপরি, সুশাসন তখনই প্রতিষ্ঠিত হবে, যদি সমাজের সকল সদস্য আইনের শাসন মেনে চলে।

বিশ্বব্যাংক (১৯৯৪) 'শাসন: বিশ্বব্যাংকের অভিজ্ঞতা' শীর্ষক এক রিপোর্টে সুশাসনকে সরকারি খাতের ব্যবস্থাপনা, জবাবদিহিতা, উন্নয়নের জন্য আইনী কাঠামো, স্বচ্ছতা ও তথ্য এ চারটি কার্যক্রম দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়।

সুশাসন বলতে এমন এক অবস্থাকে বোঝায় যেখানে শাসন এর স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা আছে, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সম্পদ ও সেবা বিতরণের ফলে দরিদ্রতম ও দরিদ্র নাগরিকেরা মর্যাদাপূর্ণ জীবন-যাপন করার সুযোগ লাভ করেছে। বস্তুত বর্তমান সময়ে সুশাসনের বিষয়টি চিন্তাজগতে কেবল ভালো লাগা বা না লাগার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। বরং সুশাসনের বিষয়টি এমন এক কার্যকরী প্রক্রিয়ায় পরিণত হয়েছে যে, যখন সম্পূর্ণ অর্থে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন সমগ্র রাজনৈতিক ব্যবস্থা টেকসই উন্নয়ন ও পরিবর্তনের দিকে ধাবিত হয়। শাসন তখনই ভালো বা সুশাসন হয় যখন তা নি:স্ব ও সামাজিকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর উপকার বা মঙ্গল করে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি**)** **/শিক্ষার্থীর কাজ**	সুশাসন নিজের ভাষায় সংজ্ঞায়িত করুন।

সার-সংক্ষেপ

সুশাসন হল রাষ্ট্র, সমাজ ও সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা। সুশাসন সকলের স্বার্থই রক্ষা করার চেষ্টা করে থাকে। সুশাসনের নির্দিষ্ট কিছু উপাদান রয়েছে। সুশাসন চিহ্নিতকরণে সরকারি খাতের ব্যবস্থাপনা, উন্নয়নের জন্য আইনী কাঠামো, জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা ও অবাধ তথ্য প্রবাহের উপর জোর দেয়া হয়। সুতরাং সুশাসন বলতে এমন এক অবস্থাকে বোঝায় যেখানে শাসনের স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা আছে, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সম্পদ ও সেবা বিতরণের ফলে দরিদ্রতম ও দরিদ্র নাগরিকদের জীবনমান উন্নয়নের সুযোগ তৈরি হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সুশাসন দ্বারা শাসনের-

(ক) গুণগত দিক বুঝায় (খ) পরিমান বুঝায়

(গ) বিপরীত দিক বুঝায় (ঘ) উপরের সবই বুঝায়

২। কোন দশক থেকে সুশাসন ধারণাটি গুরুত্ব পেতে শুরু করেছে?

(ক) ১৯৬০ (খ) ১৯৭০

(গ) ১৯৮০ (ঘ) ১৯৯০

৩। সুশাসনের জন্য সরকারি খাতের ব্যবস্থাপনার কথা কোন প্রতিষ্ঠান বলেছে?

ক) আইএমএফ খ) জাতিসংঘ

গ) বিশ্বব্যাংক ঘ) ইইউ

পাঠ-২.২ সুশাসনের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Good Governance)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- সুশাসন এর প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সুশাসন এর বৈশিষ্ট্যগুলো কিভাবে রক্ষা করা যায় তাও জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	অংশগ্রহণ, আইনের শাসন, স্বচ্ছতা, সংবেদনশীলতা, কার্যকারিতা, দক্ষতা, সুশীল সমাজ।

সুশাসনের বৈশিষ্ট্য

সুশাসনের মৌলিক ও প্রাথমিক চরিত্র হচ্ছে- সুশাসনের আওতায় সকল কাজ হবে অপব্যবহার ও দুর্নীতিমুক্ত এবং ন্যায়পরায়ণভিত্তিক ও আইনের শাসনের প্রতি শর্তহীনভাবে অনুগত। সুশাসনের এই চরিত্র বা বৈশিষ্ট্য বিস্তারিতভাবে আলোচনা করলে তা কয়েকটি বিষয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করে। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হল:

(ক) অংশগ্রহণ: নারী-পুরুষ নির্বিশেষে শাসনের কাজে সকলের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অংশগ্রহণ হচ্ছে সুশাসনের অন্যতম ভিত্তি। রাষ্ট্রের আয়তন ও জনসংখ্যা অধিক হওয়ার কারণে বর্তমানকালে প্রত্যক্ষভাবে সকলে শাসন কার্যে অংশগ্রহণ করতে পারে না। সে কারণে পরোক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যম হচ্ছে বৈধ প্রতিষ্ঠানসমূহ। অংশগ্রহনের অর্থ হচ্ছে, বৈধ ও কার্যকরী যে কোন সংগঠন গড়ে তোলার স্বাধীনতা এবং এসব সংগঠনের মাধ্যমে মতামত প্রকাশের অবারিত সুযোগ। শুধু তাই নয়, রাষ্ট্রের সুশীল সমাজকেও নিরপেক্ষ, কল্যাণকর ও সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সুসংগঠিত থাকতে হবে।

(খ) আইনের শাসন: সুশাসনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আইনের শাসন। সুশাসনের জন্য এমন আইনগত কাঠামোর উপস্থিতি প্রয়োজন যা আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালনে সক্ষম। নিরপেক্ষভাবে আইন প্রয়োগের বিশেষভাবে প্রয়োজন মানবাধিকার সংরক্ষণ, বিশেষ করে চরম দরিদ্র ও দরিদ্র জনগোষ্ঠী এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য। আবার এসব কিছুর জন্য প্রয়োজন স্বাধীন বিচার বিভাগ এবং নিরপেক্ষ ও দুর্নীতিমুক্ত আইন প্রয়োগকারী সংস্থা।

(গ) স্বচ্ছতা: সাধারণভাবে স্বচ্ছতা বলতে সিদ্ধান্ত গ্রহণে ও তা বাস্তবায়নে আইনসম্মত পদ্ধতি অবলম্বন করাকে বোঝায়। কেবল তাই নয়, স্বচ্ছতা দ্বারা এটিও বুঝানো হয় যে, আইনসম্মতভাবে গৃহীত সিদ্ধান্ত ও তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে যারা প্রভাবিত হবে তাদের জন্য সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে তথ্য প্রবাহ অবাধ করা এবং তথ্য জানার অধিকার উন্মুক্ত করা। একথার অর্থ হচ্ছে তথ্য প্রবাহ যেন সকল স্তরের জনগণের কাছে সহজবোধ্য হয় এবং বিভিন্ন মাধ্যমে সকলের কাছে পৌছায়।

(ঘ) সংবেদনশীলতা: সংবেদনশীলতা হচ্ছে শাসনযন্ত্রের এমন দক্ষতা, যোগ্যতা ও সামর্থ্য যার মাধ্যমে জনসাধারণের বিশেষ করে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মর্যাদাপূর্ণ জীবন যাপনের জন্য সকল বৈধ প্রয়োজন ও দাবী-দাওয়া যথাসময়ে পূরণ করা সম্ভব হয়। অর্থাৎ, সরকার জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে যথাসময়ে সাড়াদানে প্রস্তুত থাকাটাই সংবেদনশীলতা।

(ঙ) ঐকমত্য: যেকোন রাষ্ট্রেই নানা মত ও স্বার্থের উপস্থিতি বিদ্যমান। এই সব মত ও স্বার্থের মাঝে সমন্বয় সাধন করে সামাজিক ঐক্য ধরে রাখা সুশাসনের গুরুত্বপূর্ণ একটি বৈশিষ্ট্য। সুশাসনের ক্ষেত্রে এরূপ সমন্বয় সাধন কাজ এমনভাবে সম্পন্ন করা হয় যাতে সামগ্রিকভাবে সমাজের সকল অংশ লাভবান হয়। এভাবে মত ও স্বার্থের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে সামাজিক ঐক্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক একরূপতা সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

(ঞ) জবাবদিহিতা: সুশাসনের জন্য জবাবদিহিতা গুরুত্বপূর্ণ একটা বৈশিষ্ট্য। এক্ষেত্রে কেবলমাত্র সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহই নয় বরং ব্যক্তিখাত ও সুশীল সমাজের সংগঠনসমূহও তাদের অংশীদারদের নিকট এবং সার্বিকভাবে জনসাধারণের নিকট

তাদের কাজকর্মের জন্য দায়বদ্ধ থাকবে এবং জবাবদিহি করবে। এরূপ দায়বদ্ধতা এবং জবাবদিহিতা স্বচ্ছতা ও আইনের শাসন ছাড়া সম্ভব নয়।

এসব ছাড়াও সুশাসনের জন্য ন্যায়পরায়নতা, কার্যকারিতা ও দক্ষতার শর্তপূরণ একান্ত আবশ্যক। উপরে আলোচিত বৈশিষ্ট্যসমূহের আলোকে বুঝা যায় যে, সম্পূর্ণরূপে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সহজ কাজ নয়। খুব কম রাষ্ট্রই সুশাসনের সম্পূর্ণতা অর্জন করতে পেরেছে। তবুও একথা অস্বীকার করা যাবে না যে, টেকসই উন্নয়নের জন্য সুশাসনের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলো অর্জন করার কোন বিকল্প নেই।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	সুশাসন এর বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করুন।

সার-সংক্ষেপ

কোন রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে সহজেই নাগরিকগণ তা অনুধাবন করতে পারে। অংশগ্রহণ, আইনের শাসন, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সংবেদনশীলতা, ঐকমত্য, কর্তব্য ও ন্যায়পরায়ণতা ও দক্ষতার মত বৈশিষ্ট্যগুলো তখন খুব সহজেই অনুমেয় হয়। সুশাসন না থাকলে সমাজে উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো পরিলক্ষিত হয় না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য আইনের শাসনের প্রয়োজন নেই। বক্তব্যটি–

(ক) মিথ্যা (খ) সত্য

(গ) আংশিক সত্য (ঘ) উপরের কোনটিই না

২। সুশাসনের বৈশিষ্ট্য-

(i) অংশগ্রহণ (ii) আইনের শাসন (iii) স্বচ্ছতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i খ) i ও ii

গ) i ii ও iii ঘ) i ও iii

পাঠ-২.৩ সুশাসনের গুরুত্ব
(Importance of Good Governance)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- সামাজিক উন্নয়নে সুশাসন এর গুরুত্ব জানতে পারবেন।
- রাজনৈতিক উন্নয়নে সুশাসন এর গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	উৎপাদন, বন্টন, বিনিয়োগ, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, সামাজিক উন্নয়ন, বাজার ব্যবস্থা।

সুশাসনের গরুত্ব

একটি রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব অপরিসীম। নিচে সুশাসন প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হল। সুশাসন ছাড়া স্থিতিশীল উন্নয়ন সম্ভব নয়। একটি রাষ্ট্রে সুশাসন না থাকলে, সে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়ন স্থিতিশীল হয় না। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সকল উপাদান যেমন, উৎপাদন, বন্টন, বিনিয়োগ এমনকি ভোগের ক্ষেত্রেও নানারকম বাঁধার সৃষ্টি হয়। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে গিয়ে বাজার ব্যবস্থাও নানা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়। যেমন ধরা যাক বাংলাদেশে যখন রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার সম্মুখীন হয় তখন এর উৎপাদন বাঁধাগ্রস্ত হয়। রাজনৈতিক কর্মসূচি হরতালের কারণে যানবাহন চলাচল না করলে পণ্যের যথাযথ বাজারজাতকরণ সম্ভব হয় না। ফলে ভোক্তারা বাজার থেকে তাদের প্রয়োজনীয় পণ্য কিনতে পারে না। অথবা কিনলেও বেশি অর্থ ব্যয়ে বাধ্য হয়। সুশাসন প্রতিষ্ঠিত থাকলে রাষ্ট্রীয় সম্পদের ন্যায্য বন্টন সম্ভবপর হয়।

সামাজিক উন্নয়নে সুশাসন

সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সুশাসন অপরিহার্য। শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়ন হলেই সুশাসনের ভূমিকা শেষ হয়ে যায় না। উন্নয়নের ফলাফল সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ ন্যায্যতার সাথে ভোগ করতে পারাই সুশাসনের লক্ষণ। একটি সমাজে বিভিন্ন ধর্ম-বর্ণ শ্রেণি পেশার মানুষ থাকে। যেমন, বাংলাদেশে রয়েছে মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ধর্মের মানুষ। এছাড়াও দেশটিতে আছে নানা জাতিসত্তার মানুষ। এখন এ সকল মানুষের কাছে সম্পদের ন্যায্য বন্টন না হলে সামাজিক অসন্তোষ বাড়বে। শুধু সম্পদের সুষ্ঠু বন্টন হলেই সুশাসন হবে না। যদি সংখ্যালঘু মানুষেরা স্বাধীনভাবে নির্ভয়ে তার সম্পত্তির অধিকার ভোগ না করতে পারে তাহলেও সুশাসন প্রতিষ্ঠা হবে না। নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্য দূর করার জন্যও সুশাসন প্রতিষ্ঠা জরুরি। অনগ্রসর নারী সমাজের উন্নয়নের জন্য সুশাসন প্রতিষ্ঠা তথা আইন সংস্কার জরুরি।

সুশাসন ও রাজনৈতিক উন্নয়ন

রাজনৈতিক উন্নয়ন ও সুশাসনের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। একটি দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যদি সুশাসন প্রতিষ্ঠার প্রতি আন্তরিক না হন, তাহলে সে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হয় না। সুশাসনের সাফল্য রাজনৈতিক নেতৃত্বের আন্তরিকতা ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের নিয়ম-নীতি মেনে চলার ওপর অনেকাংশেই নির্ভর করে। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান তথা রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে গঠনমূলক সহযোগিতা এবং জনগণের কল্যাণের জন্য কর্মসূচি প্রণয়নে তাদের নিজেদের মধ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	আপনার দৃষ্টিতে সুশাসন কেন প্রয়োজন?

সার-সংক্ষেপ

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের মূলে রয়েছে সুশাসন। সুশাসন ও উন্নয়ন পরস্পরের পরিপূরক। সুশাসন জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে নাগরিকদের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অধিকার রক্ষায় নিশ্চয়তা দেয়। ফলে একটি দেশের উন্নয়ন সূচকে ঊর্ধ্বগামী প্রবণতা দেখা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ঘুষ সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথে-

(ক) সহায়ক (খ) বাঁধা

(গ) উভয়ই (ঘ) কোনটিই না

২। 'ক' রাষ্ট্রটি জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর। কোন অন্যায়-অবিচার হলে বিচারের জন্য দ্বারে-দ্বারে ঘুরতে হয় না। পুলিশ নাগরিকের যে কোন অভিযোগ গ্রহণ করে থাকে। ফলে জনগণও সরকারের প্রতি অনেক কৃতজ্ঞ। রাষ্ট্রটিতে কি বিদ্যমান?

(ক) বিচার বিভাগের স্বাধীনতা (খ) আইনের শাসন

(গ) সুশাসন (ঘ) সহিষ্ণুতা

পাঠ-২.৪ বাংলাদেশে সুশাসনের সমস্যা (Problems of Good Governance in Bangladesh)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- সুশাসন তথা বাংলাদেশে সুশাসনের প্রধান সমস্যাগুলো জানতে পারবেন।
- সুশাসনের সমস্যা জানার পাশাপাশি সমস্যাগুলো কেন তৈরি হয় তা সম্পর্কেও ধারণা পাবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	দুর্নীতি, আমলাতন্ত্র, স্বজনপ্রীতি, অকার্যকারিতা।

বাংলাদেশে সুশাসনের সমস্যা

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের বিচারে ২০০১ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ পৃথিবীতে এক নম্বর দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ ছিলো। পরবর্তী সময়ে পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হলেও বাংলাদেশে এখনও ব্যাপকহারে দুর্নীতি বিদ্যমান। অনেকের মতে দুর্নীতিই বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথে প্রধান অন্তরায়। দুর্নীতি ছাড়াও আমলাতন্ত্রের প্রকোপ ও আইনের শাসন চর্চায় নানাবিধ দুর্বলতা সুশাসনের প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে। নিম্নে বাংলাদেশে সুশাসনের ক্ষেত্রে প্রধান সমস্যাগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হলঃ

(ক) দুর্নীতি: বাংলাদেশে দুর্নীতি এক সর্বগ্রাসী রূপ ধারণ করেছে। দুর্নীতির ব্যাধি আইন প্রয়োগকারী সংস্থা থেকে শুরু করে বিচার ব্যবস্থা ও প্রশাসনকেও আক্রান্ত করেছে। এছাড়া রাজনৈতিক অঙ্গনের একটি অংশের মধ্যেও দুর্নীতির সংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়েছে বলে মনে করেন অনেক গবেষক ও বিশ্লেষক। দুর্নীতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ার কারণে মানবাধিকার সংরক্ষণ, ন্যায়পরায়ণতা প্রতিষ্ঠা, অসাম্যের মাত্রা কমানোর চ্যালেঞ্জগুলো প্রকট হয়ে উঠেছে। এমতাবস্থায় সুশাসন তথা গণতন্ত্র কতদিনে অর্জিত হবে তা বড় এক প্রশ্ন হয়ে উঠেছে।

(খ) আমলাতন্ত্র: বাংলাদেশের আমলাতন্ত্র এখনো অনেকটাই উপনিবেশিক আমলের ধাঁচে কাজ করে। উপনিবেশিক সংস্কৃতির কারণে আমলাতন্ত্রের মধ্যে 'জনগণের সেবক' অপেক্ষা 'জনগণের প্রভু' সংস্কৃতি বেশি দেখা যায়। জনপ্রতিনিধিদের অনেকের মধ্যে আবার অমনোযোগিতা অথবা অদক্ষতাজনিত কারণে আমলাদের উপরে পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়ে পড়ার মনোভাব দেখা যায়। এর ফলে জনগণের সাথে জনগণের প্রতিনিধির দূরত্ব তৈরি হয়, যা বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় একটি বড় অন্তরায় হিসাবে বিরাজ করছে।

(গ) আইনের শাসনে দুর্বলতা: আইনের চোখে সকলে সমান এবং আইন তার নিজস্ব গতিতে চলে। কিন্তু বাংলাদেশে অনেক সময় আইনের শাসনের এই দুই শর্ত রক্ষিত হয় না। বাংলাদেশে আইন আছে, সংবিধান মৌলিক মানবাধিকারসমূহ স্পষ্টভাবে লিখিত রয়েছে। কিন্তু এসব আইন ও মানবাধিকারসমূহের সুফল সকলের জন্য সমানভাবে নিশ্চিত করা সম্ভব হয় নি। অনেক ক্ষেত্রেই আইনের সুফল ভোগ করার জন্য অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তির প্রয়োজন হয়। আইন ও প্রতিষ্ঠানের তুলনায় অনেক সময় এখানে ব্যক্তি প্রধান হয়ে উঠে। অনেক ক্ষমতাবান ব্যক্তি নিজের পছন্দমাফিক লোকজনের জন্য আইনের সুবিধা বা উপকার বিতরণ করেন। আইনের শাসনের এহেন দুর্বলতা মানুষের মধ্যে ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা জন্ম দেয়। এই পরিস্থিতিকে বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রতিবন্ধক হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

উপরোক্ত কারণগুলো ছাড়াও প্রায়শ অকার্যকর সংসদ, রাজনৈতিক সহিংসতার মত বিষয়গুলোও সুশাসনের ক্ষেত্রে বড় অন্তরায়।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	বাংলাদেশে সুশাসনের সমস্যাগুলো কি কি?

সার-সংক্ষেপ

অর্থনৈতিক ও সামাজিক নানান সূচকে সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ লক্ষণীয় উন্নতি করে চলেছে। কিন্তু দুর্নীতি, অনিয়ন্ত্রিত আমলাতন্ত্র, আইনের শাসনে দুর্বলতার মত সমস্যাগুলো বাংলাদেশের এগিয়ে চলার ক্ষেত্রে বিশেষ অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই সমস্যার সমাধান না হলে 'সুশাসন' অর্জন কোনভাবেই সম্ভব নয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সুশাসনের পথে অন্তরায় শাসন ক্ষমতার
(ক) কেন্দ্রীকরণ (খ) বিকেন্দ্রীকরণ
(গ) গণতন্ত্রায়ন (ঘ) উপরের কোনটিই না

২। বাংলাদেশের আমলাতন্ত্র কোন ধাঁচের?
(ক) গণতান্ত্রিক (খ) সমাজতান্ত্রিক
(গ) উপনিবেশিক (ঘ) উপরের কোনটিই না

পাঠ-২.৫ সুশাসনের সমস্যার সমাধান (Solutions to Problems of Good Governance)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- সুশাসনের সমস্যা কিভাবে সমাধান করা যায় তা জানতে পারবেন।
- সুশাসনের সমস্যা দূরীকরণে কার ভূমিকা কেমন তা সম্পর্কেও ধারণা পাবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	প্রতিনিধিত্বমূলক, দুর্নীতিমুক্ত, বাস্তবমুখী, জবাবদিহিতা।

সুশাসনের সমস্যার সমাধান

একটি দেশে সুশাসনের সমস্যা সমাধানের জন্য নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। নিচে উদ্যোগগুলো উল্লেখ করা হল।

১। সুশাসন কী, কেন দরকার এবং কীভাবে তা প্রতিষ্ঠা করা যায় এ বিষয়ে শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা দরকার। এ লক্ষ্যে স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকে সুশাসন বিষয়টি বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করে উপস্থাপন করা প্রয়োজন। এতে দেশের ভবিষ্যত শাসকগণ সুশাসন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনে সক্ষম হবে।

২। গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা যেহেতু প্রতিনিধিত্বমূলক, তাই জনগণের ইচ্ছা, কল্যাণ ও অগ্রগতির সঙ্গে সম্পর্কিত আইন প্রণয়ন ও তার যথাযথ প্রয়োগের আরেক নাম সুশাসন। সুশাসনের এই শর্ত পূরণে রাজনৈতিক নেতৃত্বই সর্বাধিক ভূমিকা রাখতে পারে।

৩। সরকারের সকল কাজেরই জবাবদিহিতা নিশ্চিত হতে হবে। সরকারের কাজকর্ম কতটা যুক্তিযুক্ত সে বিষয়ে জনগণের মতামত গ্রহণের সুযোগ থাকতে হবে।

৪। কার্যকর পেশাদারী মনোভাবসম্পন্ন আমলাতন্ত্র ছাড়া সুশাসন নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধসম্পন্ন আমলাতন্ত্রের জন্য সর্বোচ্চ নেতৃত্বকে সুস্পষ্ট নীতি নির্দেশনা প্রণয়ন করতে হবে।

৫। সক্রিয় নাগরিক এবং শাসনকারী কর্তৃপক্ষের মধ্যে প্রতিনিয়ত যোগাযোগের মাধ্যমে সুশাসনের সুযোগ অবারিত হয়। এক্ষেত্রে নানান উপায়ে নাগরিকদের শাসন প্রক্রিয়ায় অংশীদার করে নেয়া অত্যন্ত ফলদায়ী হিসেবে বিবেচিত হয়।

৬। তথ্যের ভাণ্ডারে নাগরিকদের প্রবেশ না থাকলে সুশাসন নিশ্চিত করা যাবে না। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

৭। কেন্দ্রীয় সরকার সব কাজ একা করতে পারে না, সেজন্য বিকেন্দ্রীকরণের কোনো বিকল্প নেই। বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১১ তে স্পষ্ট বলা আছে প্রশাসনের সকল স্তরে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। এলক্ষ্যে উপজেলা, জেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদকে শক্তিশালী করলে তা হবে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক।

৮। সরকারের সার্বিক কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, আইনের শাসন নিশ্চিত হল কিনা তা মূল্যায়ন করার জন্য সাংবিধানিক ব্যবস্থা থাকা দরকার। এক্ষেত্রে ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠা কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি**)** **/শিক্ষার্থীর কাজ**	সুশাসন নিশ্চিতকরণে করণীয় কি কি?

সার-সংক্ষেপ

সুশাসন প্রত্যেক নাগরিকেরই কামনা। এর মাধ্যমের নাগরিকের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে সুশাসন প্রতিষ্ঠার বিষয়টি অনেকগুলো শর্তের উপর নির্ভরশীল। সরকারের কাজ-কর্মে জবাবদিহিতা, আইনের শাসন, সম্পদের সুষ্ঠু বন্টন, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণসহ তথ্যের আদান-প্রদান অবাধ করে সুশাসন প্রতিষ্ঠাকে ত্বরান্বিত করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সুশাসনের জন্য প্রয়োজন হচ্ছে, সরকারের কর্মকান্ডের-

(i) জবাবদিহিতা (ii) দায়হীনতা (iii) স্বচ্ছতা বৃদ্ধি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i খ) i ও ii

গ) i ও iii ঘ) উপরের কোনটিই না

২। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সর্বাধিক ভূমিকা রাখতে পারে?

(ক) আমলাগোষ্ঠী (খ) ব্যবসায়ী

(গ) রাজনৈতিক নেতৃত্ব (ঘ) দাতা সংস্থা

পাঠ-২.৬ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নাগরিক ও সরকারের ভূমিকা (Role of Citizen and Government in Establishing Good Governance)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নাগরিকদের করণীয় সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারের ভূমিকা সম্পর্কেও অবগত হতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	সরকার, নাগরিক, জবাবদিহিতা, নাগরিক স্বাধীনতা, ভোটাধিকার, সংবিধানের মূলনীতি।

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নাগরিক ও সরকারের ভূমিকা

সুশাসন একটি জটিল ও ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্রের সকল নাগরিক ও প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা রয়েছে। নাগরিকদের সক্রিয় ভূমিকা ছাড়া সুশাসন প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করতে গিয়ে সরকার বিভিন্ন সময় নানা ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। এ ক্ষেত্রে নাগরিকদের সচেতন অভিমত সরকারের কার্যক্রমকে আরও সক্রিয় ও অর্থবহ করে তোলে। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নাগরিক ও সরকারের করণীয় এখানে আলোচনা করা হল:

১। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নাগরিকের প্রধান করণীয় হচ্ছে ব্যক্তিগত অথবা সংগঠিতভাবে সরকারকে জনকল্যাণে সুনীতি গ্রহণে বাধ্য করা। এক্ষেত্রে তারা আলোকিত মতামত দিয়ে সরকারকে সাহায্য করতে পারে বা সরকারের অন্যায় বা ভুল নীতির সমালোচনা বা প্রতিবাদের মাধ্যমে সরকারকে জবাবদিহি করতে বাধ্য করতে পারে।

২। ক্ষেত্রবিশেষে নাগরিকগণ নিজেদের সমস্যা সমাধানে নিজেরাই উদ্যোগ নিতে পারে। সরকার অংশীদারিত্বের নীতির মাধ্যমে এই কর্মকাণ্ডে অংশ নিতে পারে। এ ধরনের উদ্যোগের ফলে নাগরিকদের মধ্যে উদ্দীপনা ও অংশগ্রহণের মনোভাব বাড়বে। নাগরিক উদ্যোগগুলোতে সরকার নির্দিষ্ট দূরত্ব থেকে সহায়তা দিলে, নাগরিকরা স্ব-শাসনের শিক্ষা লাভ করবে। এসব উদ্যোগ সুশাসনকে ত্বরান্বিত করবে।

৩। সরকারের করণীয় হচ্ছে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নাগরিকদের অংশগ্রহণের সুযোগকে বিস্তৃত করা। নাগরিকদের বাক্‌স্বাধীনতা, সংগঠনের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে এই সুযোগকে বর্ধিত করতে পারে। রাষ্ট্রের ভূমিকা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় তখনই সহায়ক হয় যখন রাষ্ট্র স্বচ্ছতার নীতির ভিত্তিতে নাগরিকদের প্রতি তার দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হয়।

৪। প্রত্যেক নাগরিকের দায়িত্ব হচ্ছে সচেতনভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করা, কর প্রদান করা, রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপচয় না করা, ঘুষ নিজে না খাওয়া এবং কেউ ঘুষ নিলে বা দিলে তার প্রতিবাদ করাও নাগরিক দায়িত্ব।

৫। নানামত, নানা চিন্তা এবং সকল ধর্ম ও জাতিসত্তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া প্রত্যেক নাগরিকের দায়িত্ব। নারীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনও নাগরিক দায়িত্ব। সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডকে ঘৃণা ও প্রতিরোধ করা নাগরিক দায়িত্বেরই অংশ। রাষ্ট্রের সংবিধানের মূলনীতিগুলো মান্য করা নাগরিকের দায়িত্ব।

৬। সরকারের উচিত রাষ্ট্রীয় সকল প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে আমলাতন্ত্র, বিচারবিভাগ, আইনবিভাগের কার্যক্রমকে গতিশীল, স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও জবাবদিহিমূলক করা এবং সাধারণ জনগনের জন্য অধিক সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির বিষয়ে আরও মনোযোগী হওয়া। প্রয়োজনে সুশাসন প্রতিষ্ঠার সহায়ক এমন নতুন ও কার্যকরী আইন করা যেতে পারে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারের করণীয় কি?

সার-সংক্ষেপ

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত জরুরি। প্রশাসনকে জনসেবায় নিয়োজিত করা, কাজের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, আইনের শাসন নিশ্চিত করার বিষয়ে সরকারের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারে। প্রয়োজনে প্রশাসনে যথাযথ প্রযুক্তি প্রয়োগ করেও অধিকতর সুশাসন নিশ্চিত করা যায়। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নাগরিকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমেও সুশাসন প্রতিষ্ঠা ত্বরান্বিত করা যায়। নাগরিক কর্তব্য যেমন- নির্বাচনে অংশগ্রহণ, যোগ্য প্রার্থী নির্বাচন, তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে আইনের দারস্থ হওয়া, সরকারকে জবাবদিহি করা, স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে সরকারকে সহযোগিতা করা, আইনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও নিয়মিত কর প্রদান করে সরকারি সেবা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখে সুশাসন নিশ্চিত করা যেতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সুনীতি গ্রহণে সরকারকে বাধ্য করার দায়িত্ব কার?
(ক) বিদেশীদের (খ) নাগরিকের
(গ) আমলাদের (ঘ) সামরিকবাহিনীর

২। সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারের দায়িত্ব শাসন ব্যবস্থায় নাগরিকদের অংশগ্রহণের সুযোগ–
(ক) বন্ধ করে দেওয়া (খ) প্রসারিত করা
(গ) কমিয়ে দেওয়া (ঘ) খ ও গ

৩। নীচে উল্লেখিত নাগরিকদের কোন আচরণ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে না?
(ক) নিয়মিত কর দেওয়া
(খ) ভোটাধিকার প্রয়োগ করা
(গ) জন্মনিবন্ধন করা
(ঘ) সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হওয়া

৪। কোনটি বর্জনীয়?
ক) জাতীয় পরিচয়পত্র সংরক্ষণ খ) জন্মনিবন্ধন
গ) নারীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ঘ) ঘুষ গ্রহণ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল

১। সোহাগপুর গ্রামের দরিদ্র কৃষক তাহের মিয়া। তাঁর তিন ছেলে-মেয়েসহ পাঁচ জনের সংসার। সামান্য চাষের জমির ওপর তাঁর জীবিকা চালাতে হয়। একই গ্রামের জোতদার মজিদ মোল্লা দুর্বল পেয়ে তাঁকে ভিটামাটি থেকে উচ্ছেদ করে। তাহের মিয়া ছেলে-মেয়ে নিয়ে থানায় যান। কিন্তু, পুলিশ তাঁকে সাহায্য করতে অপারগ হয়। অবশেষে তিনি জেলা প্রশাসকের অফিসে যান নালিশ করতে। কিন্তু, সেখানে তিনি জেলা প্রশাসকের সাথে দেখা করতে ব্যর্থ হন। নিরুপায় হয়ে ছেলে-মেয়ে নিয়ে আত্মীয়-স্বজনের বাড়ী-বাড়ী দিন কাটাচ্ছিলেন তাহের মিয়া। একটা সময়ে এসে তাহের মিয়া গণমাধ্যম কর্মী ও সুশীল সমাজের দ্বারস্থ হলেন এবং অন্যায়ের বিচার পেলেন।

ক) সুশাসন এর ইংরেজি প্রতিশব্দ কি?
খ) সুশাসন এর প্রধান উপাদানগুলো কি কি?
গ) সুশাসন এর অভাব থাকলে কি অবস্থা হয়? উদ্দীপকের আলোকে বর্ণনা করুন?
ঘ) কিভাবে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা যায়? উদ্দীপকে বর্ণিত পন্থা কতটুকু কার্যকর?

২। কোন একটি উপজেলার সাধারণ মানুষ স্থানীয় পল্লীবিদ্যুৎ অফিসের ওপর ক্ষুদ্ধ। কেননা, সারা দিনে তারা মাত্র তিন ঘন্টা বিদ্যুৎ সেবা পায়। অথচ বিদ্যুৎ অফিসের লোকজন তাদেরকে বিদ্যুৎ দেওয়ার কথা বলে হাজার-হাজার টাকা ঘুষ নেয়। কিন্তু, তাতেও তারা বিদ্যুৎ পায় না। এক পর্যায়ে এই উপজেলার অনেক মানুষ একত্রিত হয়ে পল্লী বিদ্যুৎ অফিস আক্রমণ করে। পুলিশ এসে এদেরকে লাঠিপেটা করে। স্থানীয় সংসদ সদস্য বিষয়টিকে আইন-শৃঙ্খলার সমস্যা বলে এড়িয়ে যান।

ক) সুশাসন এর প্রধান পাঁচটি বৈশিষ্ট্য লিখুন।
খ) সুশাসন প্রতিষ্ঠায় একজন সুনাগরিকের কর্তব্য কি?
গ) পরিস্থিতি কেন এমন হল?
ঘ) এ ধরনের পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাবার জন্য কি করা উচিত বলে মনে করেন?

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.১ ঃ ১। ক ২। ঘ ৩। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.২ ঃ ১। ক ২। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৩ ঃ ১। খ ২। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৪ ঃ ১। ক ২। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৫ ঃ ১। গ ২। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৬ ঃ ১। খ ২। খ ৩। ঘ ৪। ঘ

মূল্যবোধ, আইন, স্বাধীনতা ও সাম্য
(Values, Law, Liberty & Equality)

ইউনিট ৩

পৌরনীতি ও সুশাসন অধ্যয়নে মূল্যবোধ, আইন, স্বাধীনতা ও সাম্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়। আধুনিক সমাজে নাগরিক হিসেবে নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সুচারুরূপে পালন করার জন্য এ বিষয়গুলোর ধারণা থাকা উচিত। সমাজে বসবাস করতে গেলে অনেক ধরনের নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হয়। তাদের মধ্যে কিছু নিয়ম-কানুন মানুষ বিবেকবোধ থেকে মেনে চলে। আবার কতগুলো নিয়ম-কানুন মানুষ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে মান্য করে। অর্থাৎ মানুষ নিজের যা খুশি তা করতে পারে না। এমন পরিস্থিতি তৈরি হলে সমাজে ও রাষ্ট্রে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকে। সকল নাগরিকগণ যার-যার যোগ্যতা অনুযায়ী সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারে। তাদের মাঝে একটি সাম্যের ভাব বহাল থাকে। যদি কেউই নিয়মকানুন না মানে, যার যা খুশি তাই করে, তাহলে সকলেরই অসুবিধা হয় এবং সমাজ ও রাষ্ট্র বসবাসের অনুপযোগী হয়ে যায়। মূল্যবোধ, আইন, স্বাধীনতা ও সাম্যের মতো বিষয়গুলো অনুশীলন করে মানুষ তার মানবিক গুনাবলি বিকাশ ঘটানোর সর্বোত্তম সুযোগ পায়। এ ইউনেটে এ বিষয়গুলোর উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

এই ইউনিটের পাঠসমূহ-

পাঠ-৩.১: মূল্যবোধের ধারণা ও বৈশিষ্ট্য	পাঠ-৩.৭: স্বাধীনতার রক্ষাকবচ
পাঠ-৩.২: গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ধারণা ও গুরুত্ব	পাঠ-৩.৮: আইন ও স্বাধীনতার সম্পর্ক
পাঠ-৩.৩: সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ	পাঠ-৩.৯: নৈতিকতার ধারণা, আইন ও নৈতিকতার সম্পর্ক
পাঠ-৩.৪: আইনের ধারণা ও শ্রেণিবিভাগ	পাঠ-৩.১০: সাম্যের ধারণা ও শ্রেণিবিভাগ
পাঠ-৩.৫: আইনের শাসন	পাঠ-৩.১১: সাম্য ও স্বাধীনতার সম্পর্ক
পাঠ-৩.৬: স্বাধীনতার ধারণা ও শ্রেণিবিভাগ	

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ**

পাঠ-৩.১ মূল্যবোধের ধারণা ও বৈশিষ্ট্য (Concept and Nature of Values)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- মূল্যবোধের ধারণা পাবেন।
- মূল্যবোধ কি? তা সংজ্ঞায়িত করতে পারবেন।
- মূল্যবোধের মূল বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	মূল্যবোধ, নৈতিকতা, বিবেক, আচার-আচরণ, চর্চা।

মূল্যবোধের ধারণা ও বৈশিষ্ট্য

মূল্যবোধ একটি মানবিক গুনাবলী। এটি একজন মানুষের নীতি-নৈতিকতা ও বিবেকের উপর নির্ভরশীল। মূল্যবোধ সামাজিক আচার-ব্যবহার, সংস্কৃতি চর্চা ও সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয়। এটি অর্জনের

বিষয়, আরোপিত নয়। মূল্যবোধ এর নির্দিষ্ট কোন মাপকাঠি বা যৌক্তিকতা প্রমাণের সুযোগ নেই। কেননা একজনের কাছে যা আর্দশ, তা অন্য জনের কাছে বিরক্তির কারণও হতে পারে। তবে অনেকের মতে মানবিক গুনাবলী এবং সঠিক বিবেক-বুদ্ধির বহি:প্রকাশই মূল্যবোধ। বিভিন্ন পন্ডিত মূল্যবোধকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

সমাজবিজ্ঞানী এইচ এম জনসন (H.M. Johnson) এর মতে "সামাজিক মূল্যবোধ হল একটি মানদন্ড"।

ক্লাইড ক্লুখোন (Clyde Kluokhon) বলেন "সামাজিক মূল্যবোধ হচ্ছে সেসব প্রকাশ্য ও অনুমেয় আচার-আচরণের ধারা যা ব্যক্তি ও সমাজের মৌলিক বৈশিষ্ট্য বলে স্বীকৃত"।

সমাজবিজ্ঞানী এফ ই মেরিল (F. E. Meril) বলেন "সামাজিক মূল্যবোধ হচ্ছে বিশ্বাসের এক প্রকৃতি বা ধরণ, যা গোষ্ঠীগত কল্যাণে সংরক্ষণ করাকে মানুষ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে।

অতএব, সামাজিক মূল্যবোধ হচ্ছে সেসব ধারণার চূড়ান্ত ব্যাপ্তি যা মানুষ হিসেবে একজন ব্যক্তির জীবনে একান্ত কাম্য। সমাজের এসব মূল্যবোধ মানুষের জীবনের জন্য লক্ষ্য ও প্রাপ্তি স্থির করতে সাহায্য করে।

মূল্যবোধের বৈশিষ্ট্য

১। নৈতিক প্রাধান্য: মূল্যবোধ বিষয়টি নৈতিকতার উপর নির্ভরশীল। নীতি-নৈতিকতাহীন ব্যক্তি সাধারণত মূল্যবোধসম্পন্ন হয় না।

২। নির্দিষ্টতা : যেমন, মায়ের প্রতি কারো সম্মান। আবার তা সাধারণও হতে পারে। যেমন, যে প্রতিবেশীকে ভালবাসে আসলে সে নিজেকেই ভালবাসে।

৩। বিভিন্নতা: সংস্কৃতি ভেদে মূল্যবোধ ভিন্ন হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক থেকে শুরু করে নানা দিক থেকে পশ্চিমা সংস্কৃতির মূল্যবোধের সাথে বাঙালি সংস্কৃতির মূল্যবোধের পার্থক্য আছে।

৪। আপেক্ষিকতা: মূল্যবোধ একটি আপেক্ষিক বিষয়। একই মূল্যবোধ ভিন্ন-ভিন্ন দেশে বা সংস্কৃতিতে নানারকম হতে পারে। অর্থাৎ স্থান, কাল, পাত্রভেদে মূল্যবোধের মাত্রা কম বা বেশি দেখা যায়।

৪। সামাজিক মানদন্ড: বিদ্যমান মূল্যবোধ দিয়ে একটি সমাজের বা রাষ্ট্রের পরিবেশ, সংস্কৃতি, চিন্তা-ভাবনার মূল্যায়ন করা যায়। যেমন, কৃষি প্রধান সমাজের মূল্যবোধ একরকম, আবার শিল্পসমৃদ্ধ সমাজের মূল্যবোধ অন্যরকম।

৫। পরিবর্তনশীলতা: মূল্যবোধ যেহেতু চর্চার বিষয় এবং অভ্যাসের দ্বারা গড়ে উঠে, তাই ভিন্ন সংস্কৃতিতে দীর্ঘদিন বসবাসের ফলে একজন ব্যক্তির পুরনো মূল্যবোধে পরিবর্তন আসতে পারে। যেমন, একজন বাঙালি দীর্ঘ দিন পশ্চিমা কোন সংস্কৃতিতে বসবাস করলে তার আচারণ-আচরণে চিন্তায় নানান পরিবর্তন ঘটতে পারে।

৬। সম্পর্কের সেতু: অপরিচিত ব্যক্তিরা অনেক সময় একই মূল্যবোধের হলে, তাদের মাঝেও একটি আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠে। যেমন কোন বাংলাদেশি নাগরিক লন্ডনে আরেকজন অপরিচিত বাংলাদেশী নাগরিককের সাথে দেখা হলে সহজেই তাদের মধ্যে সখ্যতা গড়ে উঠে।

মূল্যবোধের উপাদান

মূল্যবোধ একটি অর্জিত বিষয়, যা কোন সমাজে দীর্ঘ সময় বসবাসের মধ্য দিয়ে একজন ব্যক্তির মাঝে গড়ে ওঠে। এক জন ব্যক্তির মূল্যবোধ কেমন হবে তা সমাজের পারিপার্শ্বিক অবস্থা বা সমাজের বিভিন্ন উপাদানের উপর নির্ভর করে। এই অবস্থাগুলোই হল মূল্যবোধের ভিত্তি বা উপাদান। নিম্নে এরকম কয়েকটি উপাদান আলোচনা করা হল-

ক. নীতিবোধ: নৈতিকতা মূল্যবোধের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য যা নীতিবোধ থেকে সৃষ্টি হয়। কোন কাজ করতে গেলে নিজের বিবেক, নীতি ও যুক্তি প্রয়োগ করে তা করা উচিত। যৌক্তিকতা সাধারণত নীতিবোধের উপর নির্ভরশীল। কেননা নৈতিক কাজ যুক্তি বিরুদ্ধ হতে পারে না। তাই যে যত বেশি নীতিবান হবে তার মূল্যবোধ তত পরিশীলিত হবে।

খ. শৃঙ্খলা: শৃঙ্খলা মূল্যবোধের অপরিহার্য উপাদান। শৃঙ্খলা অনুসরণ করলে উচ্চ মূল্যবোধের সৃষ্টি হয়।

গ. সহমর্মিতা: মূল্যবোধ ও সহমর্মিতা নিবিড়ভাবে জড়িত। সহমর্মিতা না থাকলে কেউ সামাজিক মূল্যবোধসম্পন্ন হতে পারে না।

ঘ. সৌজন্যবোধ: ব্যক্তির আচার-আচরণের মধ্য দিয়েই তার মূল্যবোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। সৌজন্যবোধ তার একটি অংশ। আচার-ব্যবহার সৌজন্য, শালীনতা মূল্যবোধ থেকে সৃষ্টি হয়।

চ. মানবিকতা: মানবিকতা মানুষের শ্রেষ্ঠ গুণ। মানবিকতা না থাকলে তাকে মানুষ বলা যায় না; মূল্যবোধসম্পন্ন বলার তো প্রশ্নই আসে না। অর্থাৎ মূল্যবোধসম্পন্ন ব্যক্তি অবশ্যই মানবিক গুনাবলির অধিকারী হবে।
ছ. শ্রমের মর্যাদা: শ্রমের মর্যাদা দেওয়া প্রত্যেকের কর্তব্য। এটি অনুশীলনের মধ্য দিয়ে একজন ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আসে। এর মধ্য দিয়ে একজন ব্যক্তি অন্য একজন ব্যক্তিকে সম্মান করতে শিখে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	আপনার দৃষ্টিতে মূল্যবোধ কি?

সার-সংক্ষেপ

মূল্যবোধ একটি মানবিক গুনাবলী। এটি একজন মানুষের নীতি-নৈতিকতা ও বিবেকের উপর নির্ভরশীল, যা সামাজিক আচার-ব্যবহার, সংস্কৃতি চর্চা ও পরিমন্ডলে বসবাসের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয়। মূল্যবোধ বিষয়টি আপেক্ষিক। এটি সম্পর্কের ভিত্তিতে নির্ধারিত, পরিবর্তিত ও নির্দিষ্ট হয়ে থাকে। নীতিবোধ, শৃঙ্খলা, মানবিকতা, সহমর্মিতা, সৌজন্যবোধ, আইনের প্রতি শ্রদ্ধাসহ এর অনেকগুলো উপাদান রয়েছে। সুন্দর ও আর্দশ সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য মূল্যবোধসম্পন্ন নাগরিক অপরিহার্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। "সামাজিক মূল্যবোধ হল একটি মানদন্ড"-উক্তিটি কার?
ক) পল সাঁত্রে খ) জন লক
গ) এইচ এম জনসন ঘ) এফ ই মেরিল

২। সামাজিক মূল্যবোধের উপাদান
(i) নীতিবোধ (ii) অমানবিকতা (iii) শ্রমের মর্যাদা
নিচের কোনটি সঠিক
(ক) i (খ) i ও ii
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৩.২ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ধারণা ও গুরুত্ব (Concepts and Importance of Democratic Values)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ কি তা শিখতে পারবেন।
- গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এর গুরুত্ব বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	গণতন্ত্র, মূল্যবোধ, মানবিক, জাতীয় স্বার্থ, জাতীয় ঐক্যমত।

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ধারণা

বিভিন্ন ধরনের মূল্যবোধের মাঝে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ অন্যতম। নৈতিকতা, সহমর্মিতা, আত্মসংযম, পরমত সহিষ্ণুতা এর মতো গুনাবলিগুলো মানুষকে গণতান্ত্রিক আচরণ করতে শেখায়। একটি রাষ্ট্র কেবল গণতন্ত্র ঘোষণা করলেই হবে না, তা প্রতিষ্ঠা করার জন্য জনগণের মাঝে গণতান্ত্রিক চেতনা, সংকল্প ও উদ্দেশ্য তথা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ থাকতে হবে। সমাজের কথা, প্রতিবেশীর সুবিধা-অসুবিধা, অন্যের অধিকার সম্পর্কে চিন্তা করা মূল্যবোধের অবিচ্ছেদ্য অংশ যা আবার গণতান্ত্রিক মূল্যবোধেরই প্রতিফলন। মূলত উদারতাবাদ নামক মতবাদ থেকেই এর উৎপত্তি। অধ্যাপক জর্জ এইচ সেবাইন উদারতাবাদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন "ব্যক্তিস্বাধীনতা, আইনি সুরক্ষা এবং সাংবিধানিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার তত্ত্ব ও অনুশীলন হচ্ছে উদারতাবাদ। মানুষের মানবিক ব্যক্তিত্ব, ব্যক্তিস্বাধীনতা, সহজাত যুক্তিবোধ ও গুণ, এবং পারস্পরিক সম্মতিসহ এমন আরো কয়েকটি গুণের চর্চাই হল উদারতাবাদ, যার সবকটিই গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ। গণতন্ত্র ব্যর্থ হবার পেছনে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অভাবকেই দায়ী করা হয়।"

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের গুরুত্ব

সমাজে বসবাসের জন্য মূল্যবোধ অপরিহার্য। একে অপরের সাথে আন্তঃসম্পর্কের মূল ভিত্তিই হল এই মূল্যবোধ। মূল্যবোধহীন ব্যক্তি সমাজের জন্য বিপদস্বরূপ। অন্যদিকে গণতন্ত্রের মূল কাজ হল ব্যক্তি স্বাধীনতা ও অধিকার নিশ্চিত করা। একজনের অধিকার ও স্বাধীনতা অন্যের উপর নির্ভরশীল, যা বজায় রাখার জন্য পারস্পরিক মূল্যবোধ প্রয়োজন। অপরের বক্তব্য ও অধিকারকে সম্মান দেখানোর অর্থই হল গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ। একটি সমাজে মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হলে ব্যক্তির অধিকার, মর্যাদা, সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা নিশ্চিত হয়। ব্যক্তি অন্যের প্রতি কর্তব্যপরায়ণ, সহমর্মী ও সংযত হয়। জাতি, ধর্ম, বর্ণের ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে একটি সুষ্ঠু ও গণতান্ত্রিক সমাজের সৃষ্টি হয়। বর্তমান সমাজে মূল্যবোধের অবক্ষয়ের ফলে হানাহানি, প্রতিহিংসা ও সংঘাত লেগেই থাকে। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা প্রয়োজন। দীর্ঘ সময়ের সামষ্টিক উদ্যোগের মাধ্যমেই গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হয়। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের গুরুত্ব নিচে আলোচনা করা হল-

মূল্যবোধ মানুষকে সহনশীলতার শিক্ষা দিয়ে থাকে, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য যা অপরিহার্য। অন্যের মতামত বিশেষ করে বিরুদ্ধ মত সহ্য করা ও বিবেচনা করা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ত্বরান্বিত করে। এহেন মূল্যবোধ সম্পন্ন নাগরিক সৃষ্টি হলে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ নাগরিক অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করে। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ চর্চার মাধ্যমে নাগরিকেরা নিজ-নিজ অধিকার ভোগ ও কর্তব্য সম্পাদনে তৎপর হয়।

সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের গুরুত্ব অপরিসীম। এ মূল্যবোধ সম্পন্ন ব্যক্তি জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সবার প্রতি সমান দৃষ্টি দিয়ে থাকে। এর ফলে সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ভূমিকা অনস্বীকার্য। জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণে দ্বন্দ্ব ভুলে ঐক্যমতে পৌঁছানো জরুরি, যা কেবল গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ চর্চার মধ্য দিয়েই সম্ভব।

সরকারের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার জন্য কার্যসম্পাদনকারী ব্যক্তিবর্গের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধসম্পন্ন হওয়া উচিত। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে উদ্দীপ্ত ব্যক্তি দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ থেকে বিরত থাকে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এত গুরুত্বপূর্ণ কেন?

সার-সংক্ষেপ

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার জন্য মূল্যবোধসম্পন্ন নাগরিকের গুরুত্ব অপরিসীম। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হলে নাগরিকদের মাঝে অবশ্যই গণতান্ত্রিক চেতনার বিকাশ ঘটতে হবে। বাক-স্বাধীনতা, আইনের শাসন, সহমর্মিতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মতো গুনাবলিও নাগরিকদের অবশ্যই থাকতে হবে। তবেই গণতন্ত্র স্থায়ী হওয়া সম্ভব।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ভিত্তি কোনটি?

ক) উপযোগবাদ খ) নৈতিকতা

গ) উদারতাবাদ ঘ) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ

২। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রয়োজন

i) বর্ণবৈষম্য সৃষ্টিতে ii) আত্মসংযমী হতে iii) সচেতন হতে

নিচের কোনটি সঠিক

ক) i ও iii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৩.৩ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ (Democratic Values for Good Governance)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ কি ভূমিকা পালন করে জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	সুশাসন, গণতন্ত্র, মূল্যবোধ, সমাজ।

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ

সুশাসন ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এর নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। একটি সমাজে যখন স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, আইনের শাসন, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, কর্তব্যপরায়ণতার মতো গণতান্ত্রিক মূল্যবোধগুলো নিশ্চিত হয় তখনই সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। পরমত সহিষ্ণুতা, ব্যক্তিস্বাধীনতা, অন্যের মতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মতো গণতান্ত্রিক মূল্যবোধগুলোও সুশাসনের জন্য আবশ্যক। সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় গণতান্ত্রিক মূল্যবোধগুলো নিম্নে আলোচনা করা হল:-

পরমত সহিষ্ণুতা: গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের একটি ভিত্তি হল পরমত সহিষ্ণুতা। নানা মত, নানা চিন্তায় বিভক্ত রাজনৈতিক দল, সামাজিক শক্তিগুলো যদি পরস্পরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এবং অপর পক্ষের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতায় সম্মত থাকে, তাহলে একটি রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়।

স্বচ্ছতা: রাষ্ট্রীয়, সরকারি কিংবা প্রশাসনিক কর্মকান্ডের স্বচ্ছতা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অন্যতম বহি:প্রকাশ। এই মূল্যবোধের চর্চা সাধারণ জনগণের মধ্যে শাসনকারী কর্তৃপক্ষের ব্যাপারে আস্থার জন্ম দেয়, যা সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য জরুরি।

আইনের শাসন: সমাজের প্রয়োজনেই আইনের সৃষ্টি। আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকলেই সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব যা কেবলমাত্র গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের মাধ্যমেই তৈরি হয়। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ না থাকলে আইনের কোন মূল্যায়ন থাকে না। সেক্ষেত্রে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

ন্যায়পরায়ণতা: গণতান্ত্রিক মূল্যবোধসসম্পন্ন ব্যক্তি সাধারণত ন্যায়পরায়ণ হয়। সমাজে এমন নাগরিকের সংখ্যা বেশি হলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ত্বরান্বিত হয়। তাই একটি সমাজে বা রাষ্ট্রে ন্যায়পরায়ণতার বোধ সৃষ্টি করা অত্যন্ত জরুরি।

সচেতনাবোধ সৃষ্টি: সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সচেতন নাগরিক একান্ত কাম্য। মানবিক গুনাবলী ও মূল্যবোধসম্পন্ন ব্যক্তিরাই সচেতন হয়ে থাকে। ফলে সরকার ও প্রশাসন কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ও তা বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এছাড়াও কেবলমাত্র সচেতন ব্যক্তিরাই সুশাসন বিরোধী কর্মকান্ডের বিরোধীতা করতে পারে।

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সবসময় নিজস্ব সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে ধারণ করে। ফলে এ ধরনের নাগরিকদের মাঝে সহজেই দেশ প্রেমের সৃষ্টি হয়।

দায়বদ্ধতা: নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্রের যেমন দায়বদ্ধতা আছে, তেমনি রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকেরও দায়বদ্ধতা আছে। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধসম্পন্ন ব্যক্তি কেবলমাত্র অধিকার ভোগ করে না বরং রাষ্ট্রের প্রতি তার যে দায়িত্ব সেগুলোও ভালোভাবে পালন করে। সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্র ও নাগরিক উভয় পক্ষের দায়বদ্ধতা কাম্য।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	সুশাসনের সাথে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সম্পর্ক নিরূপণ করুন।

সার-সংক্ষেপ

সুশাসন ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। সুশাসন হল আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ও প্রশাসনিক বিষয়গুলোকে রাষ্ট্রীয় পরিসরে একটি সঠিক সমন্বয়ের মাধ্যমে পরিচালনা করা। সুশাসন প্রতিষ্ঠা একটি জটিল ও দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া। এটি প্রতিষ্ঠার জন্য গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ অপরিহার্য। কেননা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ পরমত সহিষ্ণুতা, আইনের শাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা, ন্যায়পরায়ণতা ও সচেতনতা জাগিয়ে তোলে। এভাবেই সুশাসন প্রতিষ্ঠা পায় ও স্থায়ী হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। "ক" রাষ্ট্রে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, আইনের শাসন, বাক-স্বাধীনতা রয়েছে। সরকারও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর কিন্তু জনগণ মানবিকতা ও ন্যায়পরায়ণতার বিষয়ে এখনও নিশ্চিত নয়। এমতাবস্থায় "ক" রাষ্ট্রে অনেকটা সুশাসন থাকলেও কিসের অভাব রয়েছে?

(ক) গণতন্ত্র (খ) সামাজিক মূল্যবোধ
(গ) স্বেচ্ছাচারিতা

২। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করে

i) দায়বদ্ধতা ii) স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা iii) ন্যায়পরায়ণতা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) ii
(গ) i ও ii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৩.৪ আইনের ধারণা ও শ্রেণিবিভাগ (Concept and Classification of Law)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- আইন সম্পর্কে ধারণা পাবেন।
- আইন এর সংজ্ঞা বলতে পারবেন।
- আইন এর বিভিন্ন প্রকারভেদ সম্পর্কে জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	আইন, বিধি-বিধান, সরকারি, বেসরকারি, জাতীয়, আন্তর্জাতিক, আইনের বৈশিষ্ট্য।

আইন

সৃষ্টির আদি কাল থেকেই মানুষ কোন না কোন নিয়ম-কানুন বা প্রথা মেনে আসছে। এই নিয়মকানুন যখন সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের স্বীকৃতি পায় তা আইন হিসেবে গন্য হয়। আইন মানব সমাজের দর্পণস্বরূপ। মানুষ সামাজিক জীব। সমাজে একসাথে বসবাস করার জন্য নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলা অপরিহার্য। মানব কল্যাণের স্বার্থেই নিয়ম-কানুন প্রয়োজন। স্বীকৃত এই নিয়ম-কানুনই হল আইন। আইন হল ফার্সী শব্দ যার অর্থ সুনির্দিষ্ট নীতি বা নিয়ম। আইন এর ইংরেজি প্রতিশব্দ "Law"। Law শব্দের অর্থ স্থির বা অপরিবর্তনীয় এবং সকলের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য। বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্নভাবে আইনের সংজ্ঞা দিয়েছেন। এরিস্টটল বলেন, "সমাজের যুক্তিসিদ্ধ ইচ্ছার অভিব্যক্তিই হচ্ছে আইন"।

The *Dictionary of the History of Ideas* (1973) এ আইনকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, "আইন হচ্ছে মানুষের আচরণকে পরিচালিত করার সবচেয়ে স্পষ্ট, প্রাতিষ্ঠানিক এবং জটিল মাধ্যম"।

অধ্যাপক হল্যান্ড এর মতে আইন হচ্ছে, "সেই সাধারণ নিয়ম যা মানুষের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং সার্বভৌম রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ যা প্রয়োগ করেন।"

জন অস্টিন বলেন, "আইন হল সার্বভৌম শাসকের আদেশ"।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, আইন হল মানবজাতির বৃহত্তর কল্যাণে মানুষের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র যে সকল বিধিনিষেধ প্রণয়ন করে সাধারণভাবে সেগুলোকেই আইন বলা হয়।

আইনের বৈশিষ্ট্য বা প্রকৃতি

আইন সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণের মতামত থেকে আইনের কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন-

(১) সার্বভৌম ক্ষমতা কর্তৃক অনুমোদিত
(২) সর্বজনীন
(৩) বিধিবদ্ধ নিয়মাবলি
(৪) বাহ্যিক আচরণের নিয়ন্ত্রক
(৫) ব্যক্তিস্বাধীনতার রক্ষক
(৬) সুস্পষ্ট
(৭) গতিশীল
(৮) দেশকাল ভেদে পরিবর্তনশীল

আইনের প্রকারভেদ

আইনের প্রয়োগ ও অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের উপর ভিত্তি করে আইনকে প্রধানত তিনভাগে ভাগ করা যায়ঃ (১) সরকারি আইন (২) বেসরকারি আইন (৩) আন্তর্জাতিক আইন

(১) সরকারি আইন

সরকার কর্তৃক প্রণীত ও বলবৎকৃত নিয়মকানুনই হল সরকারি আইন। রাষ্ট্র পরিচালনা করতে নানা ধরনের আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করতে হয়। সরকারি আইন সাধারণত জাতীয় সংসদ বা পার্লামেন্টে প্রণীত হয়ে থাকে। পার্লামেন্টে আইন প্রণীত

হবার কয়েকটি পর্যায় থাকে। সকল পর্যায়েই সাধারণত সংখ্যা গরিষ্ঠ সদস্যগণের সম্মতির প্রয়োজন পড়ে। সরকারি আইন আবার কয়েক প্রকার। যেমন-

ফৌজদারি আইন: ব্যক্তির বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য রাষ্ট্র মূলত এ আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করে থাকে। সমাজে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, শান্তি বজায় রাখা এবং ব্যক্তির অধিকার নিশ্চিত করা এবং অপরাধীকে দন্ড দেয়ার জন্য ফৌজদারি আইন প্রয়োগ করা হয়।

প্রশাসনিক আইন: রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান পরিচালনা এবং এসব প্রতিষ্ঠান থেকে জনগণকে সেবা প্রদান নিশ্চিত করতে প্রশাসনিক আইন প্রণয়ন করা হয়। আইনের মানের উপর নির্ভর করে প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ।

সাংবিধানিক আইন: রাষ্ট্রের ভিত্তি হল সংবিধান। এটি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন। অন্য যেকোন আইন এ আইনের সাথে সাংঘর্ষিক হলে তা বাতিল হয়ে যায়। এ আইন দ্বারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সীমা, বন্টন ও প্রয়োগকারী নির্ধারণ করা হয়।

২. বেসরকারি আইন

এ আইন রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রণীত নয় তবে সামাজিকভাবে স্বীকৃত হয়। এ আইন দ্বারা ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক রক্ষা এবং সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা হয়। যেমন, কোন সংঘের আইন, চুক্তি ও দলিল সংক্রান্ত আইন।

৩. আন্তর্জাতিক আইন

আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক নির্ধারণ ও বজায় রাখার জন্য যে আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করা হয় তাকে আন্তর্জাতিক আইন বলে। আন্তর্জাতিক আইনকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন- শান্তিকালীন আইন, যুদ্ধসংক্রান্ত আইন এবং নিরপেক্ষতার আইন। এক রাষ্ট্রের সাথে অন্য রাষ্ট্রের সম্পর্ক, রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক, আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধান, আন্তর্জাতিকভাবে যুদ্ধাপরাধের বিচারের মত বিষয়গুলি আন্তর্জাতিক আইনের অন্তর্ভূক্ত।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	আইনের প্রকারভেদগুলো কি কি?

সার-সংক্ষেপ

আইন মানব সমাজের দর্পণস্বরূপ। মানুষ সামাজিক জীব। সমাজে একসাথে বসবাস করার জন্য নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলা অপরিহার্য। আইন সার্বভৌম ক্ষমতা কর্তৃক অনুমোদিত, সর্বজনীন, বিধিবদ্ধ, বাহ্যিক আচরণের নিয়ন্ত্রক, ব্যক্তিস্বাধীনতার রক্ষক, সুস্পষ্ট, গতিশীল এবং দেশকাল ভেদে পরিবর্তনশীল। সরকারি আইন, প্রশাসনিক, সাংবিধানিক, দেওয়ানি ও ফৌজদারি, বেসরকারি আইন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইনসহ বিভিন্ন ধরনের আইন রয়েছে। রাষ্ট্র বিভিন্ন প্রয়োজনে বিভিন্ন ধরনের আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৪

১। আইন প্রধানত কত প্রকার?

(ক) ২ প্রকার (খ) ৩ প্রকার

(গ) ৪ প্রকার (ঘ) ৫ প্রকার

২। বাংলাদেশ-ভারত -এর অভিন্ন একটি ইস্যু হল পানি। দুই দেশের মাঝে আলোচনায় বিষয়টি সুরাহা না হলে দেশ দুটি কোন আইনের দ্বারস্থ হতে পারে?

(ক) ব্যক্তিগত আইন (খ) সরকারি আইন

(গ) বেসরকারি আইন (ঘ) আন্তর্জাতিক আইন

পাঠ-৩.৫ আইনের শাসন (Rule of Law)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- আইনের শাসন কি জানতে পারবেন।
- আইনের শাসন কিভাবে নিশ্চিত করা যায় বুঝতে পারবেন।
- আইন মান্য করার কারণ জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	অনুশাসন, যুক্তিসংগত, অপরাধ, সাম্য, দৃষ্টিভঙ্গি।

নাগরিক জীবনে আইনের শাসন

আইনের শাসনের মূল কথা হল আইনের দৃষ্টিতে সকলে সমান। অর্থাৎ রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ব্যক্তি থেকে সাধারণ নাগরিক পর্যন্ত সকলের জন্য আইন একইভাবে প্রযোজ্য হবে। একটি গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা টিকে থাকার জন্য আইনের শাসন অপরিহার্য। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আইনের শাসন একটি অপরিহার্য অনুষঙ্গে পরিণত হয়েছে। রাষ্ট্র সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য। আইনের শাসনের একটি অর্থ হচ্ছে নাগরিক হিসেবে প্রত্যেকের ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে সমাজ থেকে অন্যায়, বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য দূর হয়। ফলে সমাজে স্থিতিশীলতা আসে। আইনের শাসন না থাকলে সবল-দুর্বল, ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান প্রকট হতে থাকে। আইনের শাসনের অভাবে রাজনৈতিক কারণে বিচার ব্যবস্থাও প্রভাবিত হয়।
আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করার উপায়সমূহ নিম্নরূপ:

আইন মান্য করা: রাষ্ট্রের বিদ্যমান আইন মেনে চলা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য। পৃথিবীর প্রত্যেক সভ্য জাতিই আইন মেনে চলে। আইন মেনে চলা, আইনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন উন্নত জাতিরই বহি:প্রকাশ।

যথাযথভাবে আইনের প্রয়োগ: আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। অপরাধীর সার্বিক অপরাধ বিবেচনায় নিয়ে যে আইনটি তার জন্য প্রযোজ্য তাই প্রয়োগ করা উচিত। আইন প্রয়োগে আবেগের কোন স্থান দেয়া উচিত নয়।

যুক্তিসংগত ও যুগোপযোগী আইন প্রণয়ন: সেকেলে আইন সংস্কার করা এবং বাস্তবসম্মত ও সুদূরপ্রসারী আইন আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর সকল আইন একবিংশ শতাব্দীতে প্রযোজ্য নাও হতে পারে। তাই নিয়মিতভাবে আইনের সংস্কার জরুরি।

বিদ্যমান আইন সম্পর্কে নাগরিকদের সচেতন করা: সচেতন নাগরিক সুশাসন প্রতিষ্ঠার প্রথম শর্ত। আইন সম্পর্কে নাগরিকগণ যদি সচেতন হয় তাহলে অপরাধ প্রবণতা কমে আসে এবং রাষ্ট্রে শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা সহজ হয়। তাই রাষ্ট্রে বিদ্যমান আইন এবং নতুন প্রণিতব্য আইন সম্পর্কে নাগরিকদেরকে সচেতন করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

যথাসময়ে আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করা: ইংরেজিতে বলা হয় Justice delayed, justice denied. অর্থাৎ, বিচার বিলম্বিত হওয়া মানে বিচার না হওয়া। যখন যে অপরাধ সংঘটিত তখনই তার বিচার করাই উত্তম। কখনো-কখনো দেখা যায় যে, রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সুবাদে অপরাধকারী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়ানো থেকে রেহাই পেয়ে যায়। তাই আইনের শাসন নিশ্চিত করার জন্য যথাসময়ে বিচারকার্য সম্পাদন করা একান্ত প্রয়োজন।

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় নাগরিক কর্তব্য

আইন রাষ্ট্র কর্তৃক প্রণীত ও বাস্তবায়িত হলেও, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় নাগরিকদেরও দায়িত্ব রয়েছে। তাই নাগরিকগণ যদি বিদ্যমান আইনের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে নিজের বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে কাজ করে তবেই আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। যেমন, রাস্তায় কোন চুরি-ছিনতাই হতে দেখলে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী যদি তার কাছে কোন তথ্য জানতে চায় তবে তা জানিয়ে দেয়াটা নাগরিক কর্তব্য। প্রত্যেক নাগরিকের মাঝে এ বোধ আসতে হবে যে, আইনের শাসনের মাধ্যমেই তারা সবচেয়ে বেশি লাভবান হতে পারে।

আইন মান্য করার কারণ

আইনের শাসন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ একটি শর্ত হল আইন মান্য করা। আইনের যথাযথ প্রয়োগ যেমন জরুরি তেমনি আইন মান্য করাটাও গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যেক আইনেই কিছু নির্দেশনা এবং তা অমান্য করলে শাস্তির ব্যবস্থা থাকে। তারপরও দেখা যায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে আইন ভঙ্গ হয়। উন্নত দেশগুলোতে অধিকাংশ জনগণই আইন মেনে চলে এবং আইনকে শ্রদ্ধা করে। আইন মান্য করার অনেকগুলো কারণ আছে। তার মধ্যে একটি হল আইনের উপযোগিতা। জনগণ এটি বুঝতে পারে যে, আইন অধিকার রক্ষা করে, দুর্বলকে সবলের অত্যাচার থেকে রক্ষা করে এবং সমাজে শৃঙ্খলা রক্ষা করে। লর্ড ব্রাইস আইন মান্য করার কারণগুলোকে পাঁচ ভাগে ভাগ করেনঃ (ক) যৌক্তিকতার উপলব্ধি (খ) অপরের প্রতি শ্রদ্ধা (গ) নির্লিপ্ততা (ঘ) সহানুভূতি (ঙ) শাস্তির ভয়

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিন।

সার-সংক্ষেপ

রাষ্ট্র সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য। আইনের শাসনের অর্থ হচ্ছে আইনের দৃষ্টিতে সকল নাগরিকের সমতা অর্থাৎ সকল নাগরিকের জন্য সমানভাবে আইন প্রয়োগ। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় নাগরিক ও রাষ্ট্র উভয়েরই দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। নাগরিক আইনের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করবে। রাষ্ট্র যথাযথ আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করবে, সময়মতো বিচার করবে এবং সময়ে-সময়ে আইন সংস্কার করবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কোনটি আইনের শাসন বোঝায় না?

ক) আইন ব্যক্তিকেন্দ্রিক খ) আইন দিয়ে শাসন

গ) আইনকে শ্রদ্ধা ঘ) আইনের দৃষ্টিতে সাম্য

২। লর্ড ব্রাইস এর মতে আইন মান্য করার কারণ হল-

i) দায়বদ্ধতা ii) অপরের প্রতি শ্রদ্ধা iii) শাস্তির ভয়

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) ii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৩.৬ স্বাধীনতার ধারণা ও শ্রেণিবিভাগ (Concepts and Classification of Liberty)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- স্বাধীনতা সম্পর্কে ধারণা পাবেন।
- স্বাধীনতাকে সংজ্ঞায়িত করতে পারবেন।
- বিভিন্ন প্রকার স্বাধীনতা সম্পর্কে জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	স্বাধীনতা, অধিকার, যৌক্তিক, অপরিহার্য, সংবিধান।

স্বাধীনতা ও স্বাধীনতার বিভিন্ন রূপ

'স্বাধীনতা' নামক প্রত্যয়টি পৌরনীতি ও সুশাসন এর আলোচনায় খুবই গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়। রাষ্ট্রে একজন নাগরিকের অস্তিত্ব বিভিন্ন বিষয়ে প্রাপ্ত স্বাধীনতা থেকেই প্রকাশ পায়। স্বাধীনতা শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ হল 'Liberty'। স্বাধীনতাকে শাব্দিক অর্থে বলা যায় নিজের ইচ্ছে মতো কাজ করা। কিন্তু একজনের স্বাধীনতার সাথে অন্যের স্বাধীনতা ভোগের বিষয় যেহেতু জড়িত তাই পৌরনীতিতে স্বাধীনতা মানে যা খুশি তাই করা নয়। স্বাধীনতা মানে যৌক্তিক ও আইনসিদ্ধভাবে কোন কিছু করাকেই বুঝায়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিকগণ নানা ধরনের স্বাধীনতা ভোগ করে থাকে। যেমন- চলাফেরার স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, ধর্ম সংক্রান্ত স্বাধীনতা। জাতীয় স্বাধীনতা আবার একটু ভিন্ন। এটি অর্জন করা কঠিন। সাধারণত স্বাধীনতার আন্দোলন বা স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধের মাধ্যমে একটি জাতি স্বাধীনতা লাভ করে। নাগরিক বা জাতি সে যা-ই হোক না কেন, এদের স্বাভাবিক অস্তিত্বের জন্য স্বাধীনতা অপরিহার্য। তাই দেখা যায় পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের সংবিধানেই নাগরিকদের স্বাধীনতা ভোগের বিষয়ে নানান ধরনের ধারা সংযুক্ত থাকে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অধ্যাপক এইচ জে লাস্কি (H.J.Laski) বলেছেন "স্বাধীনতা হল অধিকারের ফল"।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী টি এইচ গ্রিন (T.H. Green)বলেন, "যা উপভোগ করার এবং সম্পন্ন করার যোগ্য তা উপভোগ ও সম্পাদন করার ক্ষমতাকে স্বাধীনতা বলে"।

প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বাধীনতা ভোগ করতে চায়। স্বাধীনতা হচ্ছে ব্যক্তির অধিকার। জীবনের সুকুমার বৃত্তিগুলোর বিকাশের জন্য এটি অপরিহার্য। আদর্শ নাগরিক সৃষ্টিতে স্বাধীনতা ভোগের বিকল্প নেই। স্বাধীনতার বিপরীত হল পরাধীনতা বা স্বাধীনতাহীনতা। স্বাধীনতাহীনতায় কেউ বাঁচতে চায় না। পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্তির জন্য অনেক জাতি যুগের পর যুগ সংগ্রাম করে যাচ্ছে। আবার আত্মপরিচয়ের এবং ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য নাগরিকদের স্বাধীনতা প্রদান করা রাষ্ট্রের কর্তব্য।

স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা:

স্বাধীনতাহীনতায় মানুষ দাসে পরিণত হয়। সকল মৌলিক অধিকার যেমন প্রয়োজন স্বাধীনতাও তেমনি গুরুত্বপূর্ণ। নাগরিকগণ স্বাধীনভাবে জীবন-যাপন করতে পারলে রাষ্ট্রের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। পরাধীনতায় ব্যক্তি নিজেকে মেলে ধরার সুযোগ পায় না, ফলে তার স্বাভাবিকতা বিঘ্নিত হয়। স্বাধীনতা চর্চার মধ্য দিয়ে একজন ব্যক্তি বা একটি জাতি তার সম্ভাবনার সর্বোচ্চ বিকাশ ঘটানোর সুযোগ পায়।

স্বাধীনতার বিভিন্ন রূপ

একটি রাষ্ট্রে নাগরিকগণ বিভিন্ন ধরনের স্বাধীনতা ভোগ করে। স্থান, কাল, পাত্রভেদে এটি আবার ভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন- (১) ব্যক্তিগত স্বাধীনতা (২) সামাজিক স্বাধীনতা (৩) রাজনৈতিক স্বাধীনতা (৪) অর্থনৈতিক স্বাধীনতা (৫) জাতীয় স্বাধীনতা ও (৬) পৌর স্বাধীনতা

১. ব্যক্তিগত স্বাধীনতা

এই স্বাধীনতা একান্তই ব্যক্তিগত। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ভোগে অন্যের উপর কোন প্রভাব পড়ে না। যেমন, ধর্ম সংক্রান্ত স্বাধীনতা কিংবা মত প্রকাশের স্বাধীনতা।

২. সামাজিক স্বাধীনতা

মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার জন্য সামাজিক স্বাধীনতা অপরিহার্য। যেমন, জীবন ধারণ, সম্পত্তি ভোগ কিংবা সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের স্বাধীনতা। সামাজিক স্বাধীনতা মানুষকে সুন্দর জীবনের পথ দেখায়। তার মনের সুকুমার বৃত্তির বিকাশ ঘটায়।

৩. রাজনৈতিক স্বাধীনতা

ভোটার হবার স্বাধীনতা, ভোটদানের স্বাধীনতা, রাজনৈতিক দল গঠনের স্বাধীনতার মতো বিষয়গুলো রাজনৈতিক স্বাধীনতার অন্তর্গত। ন্যায়সঙ্গতভাবে একজন নাগরিক সব ধরনের স্বাধীনতা ভোগের অধিকার রাখে। নেতৃত্বের বিকাশের জন্য রাজনৈতিক স্বাধীনতা থাকা উচিত। একনায়কতান্ত্রিক, সামরিক ও স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থায় নাগরিকগণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হয়।

৪. অর্থনৈতিক স্বাধীনতা

এ ধরনের স্বাধীনতার মধ্যে পেশা বাছাই ও জীবিকার স্বাধীনতা অন্যতম। মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য অর্থনৈতিক স্বাধীনতার বিকল্প নেই। তাছাড়া অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না থাকলে শ্রেণি-বৈষম্য বেড়ে গিয়ে যেকোন শ্রেণি শোষণ-বঞ্চনার পরিস্থিতি তৈরি হয়। অর্থনৈতিক স্বাধীনতার আইনগত ভিত্তি রয়েছে। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না থাকলে অন্যান্য স্বাধীনতাও খর্ব হয়।

৫. জাতীয় স্বাধীনতা

বর্তমানে রাষ্ট্রগুলো হচ্ছে জাতি রাষ্ট্র। অর্থাৎ তারা স্বাধীন জাতি হিসেবে রাষ্ট্র গঠন করেছে। একটি জাতির নিজস্ব পরিচয় প্রতিষ্ঠার সক্ষমতাই হল জাতীয় স্বাধীনতা। জাতি হিসেবে স্বাধীন থাকা যেমন গর্বের, তেমনি তা অর্জন করাও কষ্টসাধ্য। স্বাধীনতা অর্জনের পথে অনেক জাতিকে বিপুল আত্মদান করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ ৩০ লক্ষ শহীদের বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জন করে।

৬. পৌর স্বাধীনতা

জীবনের অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, ধর্ম সংক্রান্ত অধিকারগুলো পৌর স্বাধীনতার অন্তর্গত। ব্যক্তিজীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ ও সমাজে সুখ-শান্তি নিশ্চিতকরণে এই সব স্বাধীনতা অপরিহার্য।

স্বাধীনতা নাগরিকের অধিকারস্বরূপ। ফলে এই স্বাধীনতা ভোগের জন্য কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা জরুরি। রাষ্ট্র যাতে নাগরিকের এই সব স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে পারে সে ব্যাপারে নাগরিকদের সবসময় সচেতন থাকতে হবে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচারিতার মধ্যে পার্থক্য কি?

সার-সংক্ষেপ

স্বাধীনতা মানে যৌক্তিক ও আইনসিদ্ধভাবে কোন কিছু করাকেই বুঝায়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিকগণ নানা ধরনের স্বাধীনতা ভোগ করে থাকে। স্বাধীনতা বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ ব্যক্তি স্বাধীনতা, জাতীয় স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও ধর্ম সংক্রান্ত স্বাধীনতা। অগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কিংবা উপনিবেশিক রাষ্ট্রে নাগরিকেরা স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন

১। "স্বাধীনতা হল অধিকারের ফল" উক্তিটি কার?

ক) রুশো খ) ম্যাকিয়াভেলি

গ) লক ঘ) লাস্কি

২। 'ক' দেশটির নির্দিষ্ট ভূখন্ড, জনসংখ্যা ও একটি সরকার রয়েছে। কিন্তু তবু দেশটি পৃথিবীর বুকে একটি রাষ্ট্র হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পারছে না। দেশটিতে কোন স্বাধীনতার অভাব রয়েছে?

ক) অর্থনৈতিক স্বাধীনতা খ) আইনগত স্বাধীনতা

গ) জাতীয় স্বাধীনতা ঘ) রাজনৈতিক স্বাধীনতা

পাঠ-৩.৭ স্বাধীনতার রক্ষাকবচ (Safeguards to Liberty)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- স্বাধীনতার রক্ষাকবচগুলো কি জানতে পারবেন।
- স্বাধীনতার রক্ষাকবচ সম্পর্কে ধারণা পাবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	স্বাধীনতা রক্ষা, গণতান্ত্রিক, অধিকার, সংবিধান, আইনের শাসন, জনমত, সংবিধান মান্যতা, ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ

স্বাধীনতার রক্ষাকবচ

প্রবাদ আছে "স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে স্বাধীনতা রক্ষা করা বেশি কঠিন"। ব্যক্তি স্বাধীনতা থেকে শুরু করে জাতীয় স্বাধীনতা, সব ধরনের স্বাধীনতা অর্জনের জন্যই যুগ যুগ ধরে সংগ্রাম করতে হয়। জাতীয় স্বাধীনতা লাভের পর দেখা যায় অন্যান্য স্বাধীনতার সংগ্রাম বিদ্যমান। রাষ্ট্রের প্রাণ যেমন জাতীয় স্বাধীনতা, তেমনি গণতন্ত্রের সৌন্দর্য হল ব্যক্তি স্বাধীনতা। গণতন্ত্রই ব্যক্তিকে সর্বাধিক স্বাধীনতা দিয়ে থাকে।

স্বাধীনতা রক্ষা করার কয়েকটি উপায় নিচে আলোচনা করা হল-

১। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা: প্রকৃত গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় জনগণের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অংশ গ্রহণ থাকে। এখানে জনগণের ইচছার একটি প্রতিফলন দেখা যায়। ফলে সরকার বা শাসকশ্রেণী জনগণের অধিকার, বাক-স্বাধীনতা, চলাফেরার স্বাধীনতা, সভা-সমাবেশ করাসহ অন্যান্য সকল অধিকার নিশ্চিত করতে বাধ্য থাকে। প্রাপ্ত স্বাধীনতাকে স্বেচ্ছাচারিতায় পরিণত না করা হচ্ছে নাগরিকের দায়িত্ব। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় অন্য যেকোন ব্যবস্থার চেয়ে স্বাধীনতা বেশি নিশ্চিত হয়।

২। সংবিধান মান্যতা: সংবিধান রাষ্ট্র পরিচালনা ও জনগণের অধিকারের দলিল। সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা হলে জনগণের স্বাধীনতা সহজেই নিশ্চিত হয়। যেমন, বাংলাদেশের সংবিধানের দ্বিতীয় অধ্যায়ে জনগণের অনেক অধিকার ও স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে। সরকার যদি সংবিধান মান্য করে তাহলে স্বাধীনতা খর্ব হবার কোন সম্ভাবনা থাকে না।

৩। আইনের শাসন: আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান। একজন অপরাধ করলে তাকে শাস্তি পেতে হবে। আবার অভিযুক্ত ব্যক্তিরও নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের পূর্ণ অধিকার আছে। এক্ষেত্রে বিচার বিভাগ সকল পক্ষের ঊর্ধ্বে থেকে বিচারকার্য পরিচালনা করবে।

৪। ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতি: রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য তিনটি বিভাগ আছে। এগুলো হচ্ছে আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ। এই তিনটি বিভাগ যদি স্ব-স্ব অবস্থানে থেকে নিজ-নিজ দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয় তাহলে আশা করা যায় যে রাষ্ট্রের নাগরিকেরা তাদের প্রাপ্য স্বাধীনতাগুলো ভোগে সক্ষম হবে। উদাহরণস্বরূপ শাসন বিভাগ যদি বিচার বিভাগের কাজের উপর হস্তক্ষেপ করে তবে একজন নাগরিক ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হতে পারে এবং তার স্বাধীনতা খর্ব হতে পারে। তাই রাষ্ট্রের তিন বিভাগ ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা করে পৃথকভাবে সক্রিয় থাকা একান্ত প্রয়োজন।

৫। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা: বিচার বিভাগ একটি রাষ্ট্রের প্রাণস্বরূপ। নাগরিকের শেষ ভরসার আশ্রয়স্থল হল বিচার বিভাগ। আশা করা হয় যে অন্য কোন বিভাগ থেকে কেউ যদি ন্যায় বঞ্চিত হয়ও বিচার বিভাগ অবশ্যই ন্যায় বিচার করবে। কিন্তু বিচার বিভাগ যদি স্বাধীনভাবে কাজ না করতে পারে তবে এই বিভাগটি দুর্বল হয়ে যায়।

৬। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ: চরম ক্ষমতা চরমভাবে নষ্ট হয়। অর্থাৎ সকল ক্ষমতা এক স্থানে কেন্দ্রীভূত থাকলে নাগরিকের স্বাধীনতা বিনষ্ট হবার আশঙ্কা থাকে। তাই উন্নত দেশগুলোতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত না করে স্থানীয়ভাবে বন্টন করে দেয়া হয়। এর ফলে নাগরিকগণ অধিকতর সেবা পেয়ে থাকে এবং সরকারী কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করার সুযোগ লাভ করে।

৭। সুশাসন: সুশাসন স্বাধীনতা রক্ষার অন্যতম কবচ। সুশাসন হল নাগরিক অধিকার নিশ্চিতকরণে রাষ্ট্রযন্ত্রের সুষ্ঠু পরিচালনা। রাষ্ট্রে সুশাসন থাকলে স্বাধীনতা রক্ষা করায় নাগরিককে খুব বেশি বিচলিত হতে হয় না।

৮। জনমত: জনমত স্বাধীনতার রক্ষাকবচ। যৌক্তিক ও সুষ্ঠু জনমত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধাচরণ করে না এবং নাগরিকের ক্ষতিও কামনা করে না। ফলে স্বাধীনতা রক্ষা হয়। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন থাকলেই তা সব সময় জনমত হয় না। জনমতের সাথে অবশ্যই জনকল্যাণ যুক্ত থাকতে হবে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	স্বাধীনতা কিভাবে রক্ষা করা যায়?

সার-সংক্ষেপ

স্বাধীনতা লাভ করা গেলেও অনেক সময় সে স্বাধীনতা রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে। কেননা একজন ব্যক্তির স্বাধীনতা অনেকগুলো বিষয়ের উপর নির্ভর করে। আইনসিদ্ধ স্বাধীনতা অধিকারের পর্যায়ে পড়ে। স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অনেকগুলো উপাদান কাজ করে। যেমন- গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা, সংবিধান মান্যতা, আইনের শাসন, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, ক্ষমতার পৃথকীকরণ, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের মতো বিষয়গুলো নিশ্চিত করা স্বাধীনতা সংরক্ষণের প্রাথমিক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন

১। কোন ধরনের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যুগ যুগ ধরে সংগ্রাম করতে হয়?

i) ব্যক্তি স্বাধীনতা ii) আইনগত স্বাধীনতা iii) জাতীয় স্বাধীনতা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) ii

(গ) ii ও iii (ঘ) iii

২। নিচের কোনটি স্বাধীনতার রক্ষাকবচ হিসেবে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা পালন করে?

ক) সংবিধান প্রতিপালন খ) গণমাধ্যম

গ) স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা ঘ) ন্যায়পরায়ণতা

পাঠ-৩.৮ আইন ও স্বাধীনতার সম্পর্ক (Relations between Law and Liberty)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- আইন ও স্বাধীনতার সম্পর্ক কেমন ধরনের তা জানতে পারবেন।
- আইন ও স্বাধীনতার সম্পর্ক বিষয়ে ধারণা পাবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	আইন, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র

আইন ও স্বাধীনতা

আইন ও স্বাধীনতার সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড় এবং পরস্পর নির্ভরশীল। প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাধীনতার সুরক্ষার জন্য আইনের প্রয়োজন আছে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে কোন কোন আইনকে স্বাধীনতার পরিপন্থীও মনে হয়। আইন ও স্বাধীনতার সম্পর্ক সংক্রান্ত দুটি পরস্পর বিরোধী মতবাদ প্রচলিত রয়েছে। প্রথম দলটি মনে করেন, আইন ও স্বাধীনতা গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। এরিস্টটল, মন্টেস্কু, উইলোবি, বার্কার, লক প্রমুখ মনীষী এই মতের সমর্থক। আবার কেউ কেউ মনে করেন যে, আইন ও স্বাধীনতা পরস্পর বিরোধী। হার্বার্ট, এ ভি ডাইসি প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এই দলের অন্তর্গত।
আইন ও স্বাধীনতার সম্পর্ক নিচে আলোচনা করা হল-

আইন স্বাধীনতার ভিত্তি

স্বাধীনতার কোন পরিমাপ নেই। অনেকে মনে করেন, নির্বিচার স্বাধীনতা নাগরিকের কল্যাণের চেয়ে ক্ষতির কারণ হয়ে থাকে। কোন স্বাধীনতা কতটুকু উপভোগ করা যাবে তা আইনের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। আইন ব্যতীত স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতায় পরিণত হবার আশঙ্কা থেকে এমনটি করা হয়। জন লকের মতে, "যেখানে আইন নেই সেখানে স্বাধীনতাও নেই।"

আইন স্বাধীনতার রক্ষাকবচ

একজনের স্বাধীনতা যেন অন্যের অধিকার খর্ব না করে সেজন্য বিভিন্ন ধরনের আইন রয়েছে। স্বাধীনতা বঞ্চিতরা আইনের আশ্রয় নিতে পারে। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন সংবিধানে নাগরিকদের জন্য অনেক স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেয়া হয়। জন লকের মতে, যেখানে আইন থাকে না সেখানে কোন স্বাধীনতাও থাকে না।

আইন স্বাধীনতার পরিপূরক

আইন যেমন কেবল নিয়ন্ত্রণ নয় তেমনি স্বাধীনতা মানে যা ইচ্ছে তা করা নয়। উভয়টির সাথেই যৌক্তিকতা বিষয়টি রয়েছে। আইন স্বাধীনতাকে পূর্ণ করে। স্বাধীনতা কোনভাবে বাধাগ্রস্ত হলে আইনের মাধ্যমে তা বলবৎ করা হয়। অর্থাৎ আইন ছাড়া স্বাধীনতা পূর্ণতা পায় না।

আইন স্বাধীনতার বিরোধী

আইন সবসময় স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে পারে না। কেবল জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারা প্রণীত আইনই স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারে। স্বেচ্ছাচারী ও স্বৈরাচার কর্তৃক প্রণীত আইন অনেক সময়ই স্বাধীনতা বিরোধী। দৃষ্টান্ত হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্যমূলক আইনের কথা বলা যায়, যা ঐ দেশের কৃষ্ণাঙ্গ নাগরিকদের অধিকার খর্ব করত। তাছাড়া মার্কসবাদীগণ মনে করেন, পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আইন তৈরি হয় মূলত সমাজের প্রভাবশালী শ্রেণির শাসন-শোষণ টিকিয়ে রাখার জন্য। অর্থাৎ পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আইন হল শোষণের হাতিয়ার।

আইন ও স্বাধীনতার সম্পর্কে অনেক বিরুদ্ধ যুক্তি থাকতে পারে। তারপরেও এটাই বাস্তবতা যে, আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বিপুল সংখ্যক নাগরিকের স্বাধীনতা নূন্যতম পর্যায়ে হলেও রক্ষা করার জন্য আইনের বিকল্প নেই। তাই উপসংহারে আর্নেস্ট বার্কারের ভাষায় বলা যায় "স্বাধীনতা ও আইনের মধ্যে বিরোধ নেই"।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	আইন ও স্বাধীনতা পরস্পর বিরোধী- এই মতটি বিশ্লেষণ করুন।

সার-সংক্ষেপ

আইন ও স্বাধীনতার সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। আইন না থাকলে স্বাধীনতা বলবৎ করা সম্ভব নয়। আবার আইনের জন্য স্বাধীনতা খর্ব হলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। কোন কোন চিন্তাবিদ আইনকে ব্যক্তির স্বাধীনতার বিরোধী মনে করলেও, বেশিরভাগই আইনকে স্বাধীনতার রক্ষাকবচ হিসেবে বিবেচনা করেন। পরিশেষে বলা যায় যে, একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার বিকল্প নেই।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। "আইন হল স্বাধীনতার _____"। শূন্যস্থানে কোনটি বসবে?

ক) ফসল খ) অন্য রূপ

গ) সম্পূরক ঘ) শর্ত

২। "স্বাধীনতা ও আইনের বিরোধ নেই" উক্তিটি কার?

ক) এরিস্টটল খ) সক্রেটিস

গ) প্লেটো ঘ) আর্নেস্ট বার্কার

পাঠ-৩.৯ নৈতিকতার ধারণা, আইন ও নৈতিকতার সম্পর্ক (Concepts of Morality, Relation between Law and Morality)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- নৈতিকতা কি তা বলতে পারবেন।
- নৈতিকতার সংজ্ঞা জানতে পারবেন।
- আইন ও নৈতিকতার মাঝে সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য সম্পর্কে জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	আইন, নৈতিকতা, মানদন্ড।

নৈতিকতার ধারণা

নৈতিকতা ব্যক্তিগত একটি বিষয়। পৃথিবীতে ভালো-মন্দ যাচাই করার কোন শ্বাশত মানদন্ড না থাকার ফলে একজনের দৃষ্টিতে যে বিষয়টি ভালো অন্য জনের দৃষ্টিতে তা খারাপ হতে পারে। তবে ভালো-মন্দের একটি গড়পড়তা মানদন্ড সব সমাজে প্রায় একই রকম। সততা, সদাচারী, সৌজন্যমূলক আচরণকারী, প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারি ব্যক্তিকে সব সমাজই নৈতিক গুনসম্পন্ন ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করে। এ রকম ব্যক্তি কোন বিষয়টি সমাজ বা রাষ্ট্রের জন্য ভালো বা মন্দ তা নির্ণয় করতে পারে। এই ভালো ও মন্দের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করতে পারাটাই হল ব্যক্তির নৈতিকতা। নৈতিকতাকে বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। উদাহরণস্বরূপ-

ডি এন সিডলি'র মতে "সঠিক ও বেঠিক এর মাঝে পার্থক্যই হল নৈতিকতা"।

আইন ও নৈতিকতার সম্পর্ক

আইন ও নৈতিকার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলে দেখা যায় এ দুটি প্রত্যয়ের মাঝে দুই ধরনের সম্পর্ক থাকতে পারে। একটি হল মিল বা সুসম্পর্ক; অন্যটি অমিল বা পার্থক্য।

আইন ও নৈতিকতার সুসম্পর্ক

উদ্দেশ্যগত: আইন ও নৈতিকতা উভয়েরই উদ্দেশ্য হল সৎ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ সমাজ ও দেশ গঠন। আইনের লক্ষ্য হচ্ছে মানুষকে সৎ, যুক্তিসংগত, নিয়মের মাঝে রাখা। অন্যদিকে, নৈতিকতারও একই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। নীতিবান ব্যক্তি তার কর্মে ও কথায় সবসময় সৎ, সদাচারী, সৌজন্যমূলক ও সৎচিন্তাশীল হয়ে থাকে। এসব গুণ সমাজজীবনে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য অপরিহার্য। সাধারণত সমাজে যেসব বিষয়গুলো আইন বিরোধী, সেগুলো সাধারণত নীতিবিরোধীও হয়। যেমন, প্রতারণা বিষয়টি নীতিবিরোধী আবার তা আইন বিরোধীও। বাংলাদেশে কেউ প্রতারণা করলে ফৌজদারী কার্যবিধির ৪২০ ধারায় তার বিরুদ্ধে মামলা করা যায়। এ ধরনের বিবেচনা থেকে অধ্যাপক আর জি গেটেল বলেন, "আইন ও নৈতিকতার মাঝে নিবিড় সম্পর্ক বিরাজমান।"

প্রভাবগত: সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে অবস্থানকারী ব্যক্তিকে নীতি-নিষ্ঠ আখ্যা দেওয়া হয়। নীতি-নিষ্ঠতা মানুষের কাছ থেকে স্বাভাবিক প্রত্যাশা। কিন্তু স্বার্থের দ্বন্দ্ব, সীমাহীন চাহিদা, হিংসাত্নক মনোভাবের কবলে পড়ে অনেক সময় মানুষ নীতিবোধ বিসর্জন দেয়। আইনের হস্তক্ষেপে মানুষ অনেক সময় নীতিবোধ বিসর্জিত হওয়াটা বুঝতে শিখে।

আইন ও নৈতিকতার পার্থক্য

আইন ও নৈতিকতার মধ্যে কয়েকটি পার্থক্য নীচে উল্লেখ করা হল:

ক) কার্যক্ষেত্রগত পার্থক্য: আইন ও নৈতিকতার কার্যক্ষেত্রে অনেক পার্থক্য রয়েছে। আইন কেবল মানুষের বাহ্যিক আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং ঘটনা ঘটে যাবার পর ব্যবস্থা নিতে পারে। অন্যদিকে, নৈতিকতা মানুষের অন্তর্জীবন ও বহি:জীবন উভয়কে প্রভাবিত করে। যেমন, মাদক গ্রহণ করা আইনত দন্ডনীয়, তারপরও অনেকে মাদক গ্রহণ করে। কিন্তু

যে ব্যক্তির মনে এই চিন্তাটি থাকে যে, মাদক তার নিজের পরিবারের, সমাজের ও রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকর সে ব্যক্তি সাধারণত নেশা করে না। আইন মানুষের অন্যায় কাজকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে কিন্তু অন্যায় চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।

খ) অনুমোদনগত পার্থক্য: আইন নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে অনুমোদিত হতে হবে। তা না হলে আইন কার্যকর করা সম্ভব নয়। অন্যদিকে, নৈতিকতা বিষয়টি ব্যক্তিগত। এর জন্য কারও অনুমোদনের প্রয়োজন নেই। আইন প্রয়োগের জন্য নির্দিষ্ট সংস্থা বা ব্যক্তিবর্গ প্রয়োজন হয়। কিন্তু নীতির প্রয়োগের জন্য এমন কিছুর প্রয়োজন নেই।

গ) অবস্থান ও কালভেদে পার্থক্য: একই বিষয়ে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম আইন হতে পারে। যেমন, মদ্যপান বাংলাদেশে আইনত দন্ডনীয়। এখানে মদ্যপানকে নৈতিকতা পরিপন্থী হিসাবেও বিচেনা করা হয়। পক্ষান্তরে, পশ্চিমা বিশ্বে মদ্যপান সাধারণ সামাজিকতার অংশ এবং এই অভ্যাসের সাথে নৈতিকতা লঙ্ঘনের প্রশ্ন যে সমাজে অবান্তর।

ঘ) প্রকৃতিগত পার্থক্য: প্রকৃতিগত দিক থেকেও আইন ও নৈতিকতার মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। নীতিশাস্ত্র সকল কাজকে ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিত, শালীন-অশালীন ইত্যাদি মানদন্ডে বিভক্ত করে থাকে। কিন্তু আইন পরিবেশ পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রণীত ও প্রযোজ্য হয়।

ঙ) সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টতার মানদন্ড: আইন সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট। বেশিরভাগ আইনই লিপিবদ্ধ থাকে। কোন বিষয়ের জন্য কোন আইন প্রযোজ্য হবে তা নির্দিষ্ট থাকে। অন্যদিকে, নৈতিকতার নির্দিষ্ট কোন মানদন্ড নেই। একই বিষয় একজনের নিকট গ্রহণযোগ্য হলেও অন্য জনের নিকট তা গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। দুইটি ভিন্ন সমাজে নৈতিকতার ভিন্ন মানদন্ড থাকতে পারে।

চ) নৈতিকতা ব্যক্তিকেন্দ্রিক: নৈতিকতা ব্যক্তিকেন্দ্রিক কিন্তু আইন ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়। সকল ব্যক্তির জন্য একই আইন সমভাবে প্রযোজ্য। অর্থাৎ আইন সর্বজনীন।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	কোন মানদন্ডে মানুষ অন্যান্য প্রাণী হতে শ্রেষ্ঠ?

সার-সংক্ষেপ

মানব সমাজে এমন অনেক বিষয় আছে যেগুলোর ভালো-মন্দ বিচার করার শ্বাশত কোন মানদন্ড নেই। কোনটি ভালো, কোনটি মন্দ হিসেবে বিবেচিত হবে, তা ব্যক্তির মানসিক গঠনের উপর নির্ভর করে। এটি বিচার করতে পারাটাই নৈতিকতা। নৈতিকতা আপেক্ষিক ও পরিবর্তনশীল। স্থান-কালভেদে নৈতিকতার মানদন্ডে পার্থক্য দেখা যায়। অনেকে নৈতিকতার সাথে আইনের একটি সম্পর্ক স্থাপন করেন। আবার এ দুটির মাঝে বৈপরীত্যও আছে। কেননা আইন মেনে চলার বাধ্যবাধকতা যেমন রয়েছে, তেমনি তা লিপিবদ্ধ হওয়াও বাধ্যতামূলক। কিন্তু নৈতিকতার ক্ষেত্রে এরূপ কোন বিষয় নেই।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৯

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। রহিম খুব অভাব-অনটনের মাঝে আছে। সে কাজের অনেক খোঁজ করলো কিন্তু কোন কাজ পেল না। এই মূহূর্তে খাবার কেনার মতো তার হাতে কোন টাকা নেই। তাই ভাবলো বাজারের দোকান থেকে চাল চুরি করবে। রহিমের এই চিন্তাটিকে কি বলা যায়

i) অপরাধমূলক ii) আইনসিদ্ধ iii) নীতিবিরুদ্ধ

নিচের কোনটি সঠিক

(ক) i (খ) ii

(গ) ii ও iii (ঘ) i ও iii

২। "আইন ও নৈতিকতার মাঝে নিবিড় সম্পর্ক বিরাজমান।" একথা কে বলেছেন?

ক) ফুঁকো খ) রাসেল

গ) গেটেল ঘ) নিটশে

পাঠ-৩.১০ সাম্যের ধারণা ও শ্রেণিবিভাগ (Concept and Classification of Equality)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- সাম্য কি জানতে পারবেন।
- সাম্য কত প্রকার হতে পারে তা জানতে পারবেন।
- সাম্যের বিভিন্ন প্রকারভেদ সম্পর্কে জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	সাম্য, সাম্যবাদ, ব্যক্তিত্বের বিকাশ, অধিকার, সুযোগ-সুবিধা।

সাম্যের ধারণা

সাম্য শব্দটি প্রাচীনকাল থেকেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। প্রাচীন গ্রীসের নগররাষ্ট্র প্রসঙ্গে প্লেটোর লেখনীতেও সাম্যবাদের কথা পাওয়া যায়। প্লেটোর সাম্যের ধারণা অবশ্য আধুনিক ধারণা থেকে ভিন্ন। আধুনিকযুগে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিলোপ করে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন কার্ল মার্কস। অষ্টাদশ শতাব্দীতে জন লক, রুশোর মতো চিন্তাবিদদের লেখালেখি এবং আমেরিকার স্বাধীনতা ও ফরাসি বিপ্লব এর মতো ঘটনার মধ্য দিয়ে সমাজে বৈষম্যের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে উঠতে থাকে। ফরাসি বিপ্লবের মূল কথাই ছিল সাম্য। সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্ব এই তিনটি বিষয় প্রতিষ্ঠা করা ছিল ফরাসি বিপ্লবের মূল্য লক্ষ্য। বর্তমান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাতে সাম্য বলতে মানুষের ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনের উপযোগী সুযোগ-সুবিধা সমানভাবে পাওয়াকে বুঝায়।

উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জাতি-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ নির্বিশেষে একই ধরনের সুযোগ-সুবিধা লাভ করাকে বুঝায়। অধ্যাপক হ্যারল্ড লাস্কির মতে, সকলের সম্মুখে যথার্থ সুযোগ-সুবিধার দ্বার উন্মুক্ত রাখার অর্থ হল সাম্য। অর্থাৎ, সাম্য বলতে এমন একটি অবস্থা বা পরিবেশ বুঝায় যেখানে সকল নাগরিক সমান সুযোগ-সুবিধা লাভ করে যথার্থভাবে নিজেদের বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হয়।

সাম্যের প্রকারভেদ

সাম্য বিভিন্ন রকমের হতে পারে। যথাঃ
(ক) সামাজিক সাম্য (খ) রাজনৈতিক সাম্য (গ) অর্থনৈতিক সাম্য (ঘ) আইনগত সাম্য

ক. সামাজিক সাম্য

সামাজিক সাম্য হচ্ছে এমন একটি পরিস্থিতি যখন কোন একটি সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তি বিশেষ কতগুলো ক্ষেত্রে সমান সুযোগ ভোগ করে। বাক-স্বাধীনতা, সম্পত্তির অধিকার, সামাজিক নিরাপত্তা ভোগ কিংবা নাগরিক অধিকার চর্চার ক্ষেত্রে সমান সুযোগ লাভ করতে পারাটা সামাজিক সাম্যের নির্দেশক।

খ. রাজনৈতিক সাম্য

প্রত্যেক নাগরিক রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত কিছু সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এইসব সুযোগ-সুবিধা লাভ করাই রাজনৈতিক সাম্য। সংগঠন করার স্বাধীনতা, নির্বাচনে অংশগ্রহণ এর সুবিধা, ভোটাধিকার ইত্যাদি রাজনৈতিক সাম্যের পর্যায়ে পড়ে। রাজনৈতিক সাম্য না থাকলে রাষ্ট্রে নেতৃত্বের সংকট তৈরি হবার সম্ভাবনা থাকে।

গ. অর্থনৈতিক সাম্য

অর্থনৈতিক সাম্য বলতে সাধারণভাবে রাষ্ট্রীয় সম্পদে প্রত্যেকের সমান সুযোগ থাকা বোঝায়। পছন্দমত পেশা নির্বাচন, পেশা পরিবর্তন, যোগ্যতা অনুযায়ী পেশা গ্রহণের মত বিষয়গুলি অর্থনৈতিক সাম্যের নির্দেশক। অর্থনৈতিক সাম্যের মাত্রার উপরেই একটি রাষ্ট্রের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অনেকাংশে নির্ভর করে।

ঘ. আইনগত সাম্য

ইতোপূর্বে আলোচিত সাম্যের কিছু কিছু আবার আইনের দ্বারা স্বীকৃত। যেমন, চাকুরিতে সমান সুযোগ লাভের অধিকার, সংগঠন ও সমাবেশ করার অধিকার। বাংলাদেশের মত দেশে আইনগত সাম্য সংবিধান দ্বারা সুরক্ষিত। সংবিধান ছাড়াও দেশের বিদ্যমান অন্যান্য আইন দ্বারাও সাম্য স্বীকৃত হতে পারে। আইনের শাসন নিশ্চিত করার জন্য আইনের সাম্য থাকা উচিত।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	সাম্যের শ্রেণিবিভাগের একটি তালিকা করুন।

সার-সংক্ষেপ

সাম্য বলতে এমন একটি অবস্থা বা পরিবেশ বুঝায় যখন রাষ্ট্রের সকল নাগরিক সমান সুযোগ-সুবিধা লাভ করার মাধ্যমে নিজেদের বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হয়। সাম্য রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আইনগত হতে পারে। সাম্য নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.১০

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিলোপমূলক সাম্যের কথা কে বলেছেন?

ক) হবস খ) লক

গ) রুশো ঘ) মার্কস

২। প্রাপ্ত বয়স্ক সকল নাগরিকের নির্বাচনে ভোট দেবার ক্ষমতা কি ধরনের সাম্য?

ক) অর্থনৈতিক খ) আইনগত

গ) নৈতিক ঘ) রাজনৈতিক

পাঠ-৩.১১ সাম্য ও স্বাধীনতার সম্পর্ক (Relations between Equality and Liberty)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- সাম্য ও স্বাধীনতার সম্পর্ক কত রকমের তা জানতে পারবেন।
- সাম্য ও স্বাধীনতার সম্পর্ক বিষয়ে জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	বিরোধী, পরিপূরক, ভিত্তি, জাতি-ধর্ম-বর্ণ।

সাম্য ও স্বাধীনতার সম্পর্ক

পৌরনীতি ও সুশাসন আলোচনায় সাম্য ও স্বাধীনতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সমাজে বসবাস করতে হলে সাম্য ও স্বাধীনতা দুটিই প্রয়োজন। বৈষম্যযুক্ত সমাজে অস্থিতিশীলতা বিরাজ করে। পক্ষান্তরে, স্বাধীনতাহীন ব্যক্তি বা জাতির বিকাশের সম্ভাবনা নস্যাৎ হয়। সাম্য ও স্বাধীনতার মাঝে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ দু'ধরনের সম্পর্ক চিহ্নিত করেন। একটি ধারা সাম্য ও স্বাধীনতার মধ্যে সমধর্মীতার কথা বলে অন্য ধারাটি এই দুইয়ের মাঝে কিছু বৈপরীত্য দেখতে পায়।

সমধর্মীতামূলক সম্পর্ক: সাম্য ও স্বাধীনতা নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। স্বাধীনতা ভোগের ক্ষেত্রে অন্যের স্বাধীনতার কথা চিন্তা করাই হল সাম্যচিন্তা। রুশো, লাস্কি, বার্কার প্রমূখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ মনে করেন সাম্য ও স্বাধীনতা পরস্পর পরিপূরক। উভয়ের সম্পর্ক অতি নিবিড়। সাম্য ছাড়া স্বাধীনতার অস্তিত্ব নাই। সমাজে সাম্য না থাকলে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি ভেদে বৈষম্য ঘটে। এ অবস্থায় স্বাধীনতা অর্থহীন হতে থাকে। আইনের দৃষ্টিতে সমান অধিকার নিশ্চিত হলেই কেবল একজন নাগরিক তার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতা ভোগ করতে পারবে।

সাম্য ও স্বাধীনতার ধারণা অভিন্ন। স্বাধীনতা এমন একটি পরিবেশকে বোঝায় যেখানে মানুষ নিজের সর্বোচ্চ বিকাশ ঘটাতে পারে। সাম্যর এমন একটি পরিবেশ বা পরিস্থিতি বোঝায় যা ব্যক্তির পূর্ণ বিকাশে সহায়তা করে। অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানী অর্থনৈতিক সাম্যকে স্বাধীনতার পূর্বশর্ত হিসেবে বিবেচনা করেন। অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণে মানুষের স্বাভাবিক বিকাশও চরমভাবে বাধাগ্রস্ত হয়। এমন পরিস্থিতিতে ব্যক্তির স্বাধীনতা অর্থহীন হয়ে যায়।। এভাবে দেখলে সাম্য ও স্বাধীনতা ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

বৈপরীত্যমূলক সম্পর্ক: মানুষ প্রকৃতিগতভাবে সমান নয় এবং প্রত্যেকেই নিজগুণে স্বতন্ত্র। ফলে একেক জনের স্বাধীনতার মাত্রাও ধারণা একেক রকম। এই স্বাতন্ত্র্যগুলো বিবেচনায় না নিয়ে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ নির্বিশেষে সাম্য বাস্তবায়িত হলে, ব্যক্তির স্বাধীনতার ক্ষেত্রে নানাবিধ বাধা তৈরি হয়। লর্ড অ্যাকটন, হার্বার্ট স্পেনসার, বেজহট প্রমূখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ সাম্য ও স্বাধীনতার মধ্যে পরস্পর বিরোধী সম্পর্ক রয়েছে মনে করেন। লর্ড অ্যাকটন এর মতে "সাম্য অর্জনের আগ্রহ স্বাধীনতার আশাকে ব্যর্থ করে"। মার্কসবাদীগণ সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থনৈতিক মুক্তির কথা বলেন।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	সাম্য ও স্বাধীনতার সম্পর্ক নিরুপণ করুন।

সার-সংক্ষেপ

সাম্য ও স্বাধীনতা নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। কোন সমাজে সাম্য না থাকলে স্বাধীনতাও থাকার কথা না। তবে এ দুটি প্রত্যয়ের মাঝে কেউ কেউ আবার বিপরীতধর্মী সম্পর্কও নির্ধারণ করেন এই অর্থে যে, ব্যক্তিদের মধ্যকার নানাবিধ ভিন্নতা বিবেচনায় না নিয়ে সাম্য বাস্তবায়নের চেষ্টা করা হলে, তা প্রকৃত পক্ষে স্বাধীনতা খর্ব করে দেয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.১১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বৈষম্যযুক্ত সমাজে কি বিরাজ করে?

ক) স্থিতিশীলতা খ) অস্থিতিশীলতা
গ) শান্তি ঘ) সমৃদ্ধি

২। রহিমা খাতুন ও জয়নাল মিয়া একত্রে রাজমিস্ত্রীর কাজ করে। জয়নাল কিছুক্ষণ পরপর কাজ ছেড়ে বসে থাকে। রহিমা একা কাজ করতে থাকে। জয়নালের সাথে জিদ করে রহিমাও যা ইচ্ছে তা করত, তাই পুরো কাজটি নষ্ট হয়ে যেত। রহিমা ও জয়নালের মাঝে কিসের সম্পর্কটি নষ্ট হয়েছে?

i) সাম্য ii) স্বাধীনতা iii) অধিকার
নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) i ও ii
(গ) ii ও iii (ঘ) i ও iii

৩। "সাম্য অর্জনের আগ্রহ স্বাধীনতার আশাকে ব্যর্থ করে"। এটি কার বক্তব্য?

ক) চমস্কি খ) ফুঁকো
গ) হেবারমাস ঘ) অ্যাকটন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। পৌরনীতি ও সুশাসন ক্লাসে শিক্ষক ছাত্রদেরকে আইন প্রণয়নের কারণ ও উৎস সম্পর্কে পড়াচ্ছিলেন। সে প্রেক্ষিতে তিনি বলেন বিগত বছরগুলোতে স্কুল কলেজ, শপিং সেন্টারে ইভটিজিং খুব বেড়ে গিয়েছিল। প্রতিনিয়তই ইভটিজিং এর বিভিন্ন ঘটনা পত্র-পত্রিকা ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে স্থান করে নিয়েছিল, সে সময় ইভটিজিংয়ের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়নের জোরালো দাবি উঠে। জনদাবীর মুখে এক পর্যায়ে ইভটিজিং বিরোধী আইন তৈরি হয়। পরবর্তীতে মোবাইল কোর্ট ও অন্যান্যভাবে এ আইন কার্যকর করায় ইভটিজিং প্রতিরোধ করা অনেকাংশে সম্ভব হয়েছে। শুধু ইভটিজিং নয়, অতীতে সামাজিক দাবির প্রেক্ষিতে অনেক সময়ই আইন প্রণীত হয়েছে। অর্থাৎ সামাজিক দাবি, প্রথা, কোন ঘটনায় বিচারের নজির থেকে আইন প্রণীত হতে দেখা যায়।

ক) আইনের ইংরেজি প্রতিশব্দ কি?
খ) আইন কত প্রকার ও কি কি?
গ) উদ্দীপকের আলোকে আইনের উৎসগুলো কি কি? আইন প্রণয়নে প্রথার গুরুত্ব লিখুন।
ঘ) অপরাধ দমনে আইন প্রণয়ন জরুরি কেন? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করুন।

২। সোহেল রানা একজন জনপ্রতিনিধির পুত্র। সে তার পিতার ক্ষমতার দোহাই দিয়ে এলাকায় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। সম্প্রতি সে এলাকায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের নামে যাত্রাপালার আয়োজন করে। সেখানে বাংলার ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠানের আড়ালে অপসংস্কৃতির আয়োজন করে এবং অনেক রাতে মাইক বাজিয়ে এলাকার জনগণের শান্তিপূর্ণ জীবন-যাপনে বিঘ্ন ঘটায়। এ বিষয়ে প্রতিবাদ করতে গেলে সোহেল এক যুবককে পিটিয়ে আহত করে। এ ঘটনা নিয়ে সোহেলের পিতার কাছে যেয়ে যুবকটি কোন সন্তোষজনক প্রতিকার পাননি। কোন উপায় না দেখে অবশেষে সেই যুবক আদালতের দ্বারস্থ হয় এবং দীর্ঘ এক বছর পর আদালতের রায়ে জনপ্রতিনিধির পুত্র দোষী সাব্যস্ত হয়।

ক) নৈতিকতা কি?
খ) সাম্য কত প্রকার ও কি কি?
গ) "যা ইচ্ছে তাই করা স্বাধীনতা নয়"-উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করুন।
ঘ) 'আইনের শাসন বাস্তবায়নের মাধ্যমে রাষ্ট্রের উপস্থিতি বুঝা যায়' -উদ্দীপক অনুযায়ী আলোচনা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.১ ঃ ১। গ ২। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.২ ঃ ১। গ ২। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৩ ঃ ১। খ ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৪ ঃ ১। খ ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৫ ঃ ১। ক ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৬ ঃ ১। ঘ ২। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৭ ঃ ১। ঘ ২। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৮ ঃ ১। ঘ ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৯ ঃ ১। ঘ ২। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.১০ ঃ ১। ঘ ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.১১ ঃ ১। খ ২। গ ৩। ঘ

ই-গর্ভনেন্স ও সুশাসন
(E-governance and Good Governance)

ইউনিট ৪

সুশাসন প্রতিষ্ঠার আধুনিকতম একটি উদ্যোগ হল ই-গর্ভনেন্স। ই-গর্ভনেন্স হল তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে সরকারি সেবা সমাজের সকল মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া। ই-গর্ভনেন্স ব্যবস্থায় একজন নাগরিক স্বল্প ব্যয়ে, ঝামেলাবিহীনভাবে সপ্তাহে সাত দিন; দিনে চব্বিশ ঘন্টা সরকারি সেবা পেতে পারে। এর ফলে শাসন ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা আসে, দুর্নীতি হ্রাস পায়। এভাবে মূলত সুশাসনই নিশ্চিত হয়। তবে পুরোপুরি ই-গর্ভনেন্স চালু করার জন্য বিপুল অর্থ, দক্ষ জনশক্তি, সার্বক্ষনিক বিদ্যুৎ এবং দ্রুতগতির ইন্টারনেট সেবা অপরিহার্য। বাংলাদেশের মত রাষ্ট্রে এসব ক্ষেত্রে এখন অবধি অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। অবশ্য এসব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ডিজিটাল বাংলাদেশের স্লোগানের আলোকে ই-গর্ভনেন্স প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম বর্তমানে এগিয়ে চলছে। এ ইউনিটে ই-গর্ভনেন্স কি, এর উদ্দেশ্য, সুফল, প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিবন্ধকতা দূর করার নানা উপায় বর্ণনা করা হয়েছে।

এই ইউনিটের পাঠসমূহ-

পাঠ-৪.১: ই-গভর্নেন্স	পাঠ-৪.৪: ই-গর্ভনেন্সের গুরুত্ব
পাঠ-৪.২: ই-গভর্নেন্সের উদ্দেশ্য	পাঠ-৪.৫: ই-গর্ভনেন্সের প্রতিবন্ধকতা
পাঠ-৪.৩: ই-গভর্নেন্সের বৈশিষ্ট্য	পাঠ-৪.৬: ই-গর্ভনেন্সের প্রতিবন্ধকতা দূর করার উপায়

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ**

পাঠ-৪.১ ই-গভর্নেন্স (E-Governance)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- ই-গর্ভনেন্স কী তার ধারণা পাবেন।
- ই-গর্ভনেন্স এর সংজ্ঞা জানতে পারবেন।
- ই-গর্ভনেন্স কিভাবে কার্যকরী হয় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, ডিজিটাল, ইলেকট্রনিক, সরকারি সেবা।

ই-গভর্নেন্স

বর্তমানে বহুল ব্যবহৃত একটি প্রত্যয় হচ্ছে ই-গর্ভনেন্স। বর্তমান পৃথিবীর উন্নত-অনুন্নতসহ বেশিরভাগ রাষ্ট্রেই ই-গর্ভনেন্স এর বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রসারের ফলে সমাজ জীবনের সকল ক্ষেত্রেই এর প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এখন ইচ্ছে করলে এক মুহূর্তে পৃথিবীর যেকোন প্রান্তে যোগাযোগ ও তথ্য প্রেরণ করা যায়। ই-গর্ভনেন্স এর শাব্দিক অর্থ হল ইলেকট্রনিক গর্ভনেন্স বা ইন্টারনেট ভিত্তিক শাসনব্যবস্থা; অর্থাৎ সরকারি সেবা ও সুযোগ-সুবিধা ইন্টারনেটের মাধ্যমে পাওয়া। এর ফলে জনগণের সময়, অর্থ ও শ্রমের সাশ্রয় হয়। ই-গর্ভনেন্স সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণ কী বলেছেন দেখা যাক-

জে সাফরিজ এবং ই-রাসেল (J Shafriz এবং E Russel) এর ভাষায় যে সরকার ইন্টারনেটের মাধ্যমে জনগণকে সরকারি তথ্য সরবরাহ করে এবং জনগণ ইন্টারনেটের মাধ্যমে সরকারকে যাবতীয় সরকারি বিল বা অন্যান্য পাওনা পরিশোধ করে সে সরকারই ই-সরকার।

বিশ্বব্যাংকের সংজ্ঞায় ই-সরকার হচ্ছে সরকারের বিভিন্ন এজেন্সি কর্তৃক তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে নাগরিক, ব্যবসা খাত এবং অন্য সকল প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক পুন:নির্ধারণ করা।

সাধারনত তিনটি স্তরে বা পর্যায়ে এই ই-গর্ভনেন্স সেবা পাওয়া যায়-(১) সরকার ও সেবা গ্রহীতা (ব্যক্তি) (২) সরকার ও ব্যবসা-বাণিজ্য (৩) সরকার থেকে সরকার। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ২০০৯ সালে ঘোষিত ভিশন-২০২১ এর প্রধান লক্ষ্যই হল সরকারি সেবা ও শাসনব্যবস্থাকে ডিজিটাল করা। সরকারি সেবা জনগণের দ্বারে পৌঁছে দেবার জন্য স্থানীয় সরকারের সর্বনিম্ন স্তর ইউনিয়ন পরিষদে একটি ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্র বা ডিজিটাল সেন্টার চালু করেছে। তাছাড়া সরকারি সকল কার্যালয় থেকে দ্রুত তথ্য পাওয়ার জন্য একজন করে তথ্য কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। দ্রুত তথ্য পাওয়ার জন্য প্রত্যেকটি সরকারি কার্যালয়ের মৌলিক কিছু তথ্য ওয়েবসাইটে অন্তর্ভূক্তকরণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ই-গর্ভনেন্স প্রতিষ্ঠিত হলে সর্বাগ্রে প্রাধান্য পাবে সাধারণ নাগরিক। এটি চার ধরনের কাজ করে যার কেন্দ্রে থাকে নাগরিক সেবা। একাজগুলো হচ্ছে ব্যক্তিকে অবগতকরণ, ব্যক্তিকে প্রতিনিধিত্বকরণ, ব্যক্তিকে পরামর্শ প্রদান এবং ব্যক্তিকে অন্তর্ভূক্তকরণ।

ই-গভর্নেন্সের মূল লক্ষ্য হচ্ছে প্রযুক্তিকে সমাজের বৃহত্তর কল্যাণে ব্যবহার করা। কিন্তু, মনে রাখা দরকার যে, প্রযুক্তিকে ইতিবাচকভাবে ব্যবহার না করলে এটি সমাজের কল্যাণের চেয়ে অমঙ্গলই ডেকে আনে। এর অপব্যবহার প্রতিরোধ করার জন্য সব দেশের সরকারই বিভিন্ন ধরনের আইন প্রণয়ন করে থাকে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	ই-গর্ভনেন্স বলতে কি বোঝেন?

সার-সংক্ষেপ

পৃথিবীর প্রায় সব রাষ্ট্রেই বর্তমানে কম বেশি ই-গর্ভনেন্স এর ছোঁয়া লক্ষ্য করা যায়। ই-গর্ভনেন্স এর মাধ্যমে তথ্য প্রবাহ থেকে শুরু করে, সেবা প্রদানের মত কাজগুলি পূর্বের তুলনায় অনেক কার্যকরভাবে সম্পন্ন করা যায়। এ বাস্তবতা বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশে সরকারি সেবা ও শাসন ব্যবস্থার ডিজিটালকরণ শুরু হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ই-গভর্নেন্সের মূল কাজ হচ্ছে-
(ক) তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করা (খ) তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করা
(গ) তথ্য প্রবাহকে বাঁধা দেয়া (ঘ) উপরের সবই

২। ই-গভর্নেন্স যে প্রযুক্তি ব্যবহারের উপর নির্ভরশীল তা হল-
(ক) লাগসই প্রযুক্তি (খ) প্রিন্ট মিডিয়া
(গ) তথ্য প্রযুক্তি (ঘ) উপরের সবই

পাঠ-৪.২ ই-গভর্নেন্সের উদ্দেশ্য (Aims of E-Governance)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- ই-গর্ভনেন্স এর মাধ্যমে কোন কোন সেবা পাওয়া যায় তা জানতে পারবেন।
- ই-গর্ভনেন্স এর মূল উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ই-গর্ভনেন্স কিভাবে জনগণের জীবন যাত্রাকে পরিবর্তন করতে পারে তা জানা যাবে।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার, অনলাইন, স্ক্যানিং, ভিডিও কনফারেন্সিং, তথ্য সেবা।

ই-গভর্নেন্সের উদ্দেশ্য

দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করাই হচ্ছে ই-গভর্নেন্সের লক্ষ্য। ই-গভর্নেন্স সর্বস্তরের মানুষের কাছে সরকারি সেবা পাবার একটি জানালা উন্মোচন করে দেয়। ই-গভর্নেন্স সরকার ও জনগণের মধ্যে একটি বন্ধুত্বপূর্ণ, গ্রহণযোগ্য এবং দক্ষ আন্তঃসম্পর্ক সৃষ্টি করে। ই-গর্ভনেন্স অধিক স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করে এবং ব্যয় সাশ্রয়ী ও উচ্চমানের জনকল্যাণের প্রতিফলন ঘটায়। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশের ৪,৫৪৭টি ইউনিয়ন পরিষদে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। ২০০৯ সালে ৩০টি ইউনিয়ন পরিষদ থেকে এর যাত্রা শুরু হয়। এই সেন্টারগুলোর মাধ্যমে স্থানীয় জনগণকে যে সকল সেবা দেওয়া হয় সেগুলো হচ্ছে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ, সরকারি ফর্ম ডাউনলোডের সুবিধা, জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধীকরণ, অনলাইনে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি সংক্রান্ত কাজ, ভিজিডি, ডিজিএফ কার্ড সংক্রান্ত তথ্য, জীবনধারণ সংক্রান্ত তথ্য, চাকুরী সংক্রান্ত তথ্য, ভিসা প্রক্রিয়াকরণ ও ফর্ম সংগ্রহ, ই-মেইল ও ইন্টারনেট ব্রাউজিং, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, ভিডিও কনফারেন্সিং, মোবাইল ব্যাংকিং, ব্রিটিশ কাউন্সিল কর্তৃক ইংরেজি শিক্ষণ, ফটোকপি, স্ক্যানিং, ফটো তোলা এবং মোবাইল ফোন সেবা। নিম্নে ই-গভর্নেন্সের উদ্দেশ্যসমূহ বিশদভাবে আলোচনা করা হল-

১। জনস্বার্থে সরকারের প্রত্যেকটি তথ্য সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়া ই-গভর্নেন্সের মৌলিক উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে একটি।

২। সরকার ও জনগণের মধ্যে সহযোগিতাময় কাঠামো তৈরি করা ই-গভর্নেন্সের লক্ষ্য। জনগণের কাছ থেকে সাহায্য বা পরামর্শ গ্রহণ এবং তাদের সমস্যা সম্পর্কে সরকারকে ওয়াকিবহাল করাই এর অন্যতম উদ্দেশ্য।

৩। শাসন প্রক্রিয়ায় সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণে জনগণকে সরাসরি অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহ সৃষ্টি করাও ই-গভর্নেন্সের উদ্দেশ্য।

৪। ই-গভর্নেন্স দেশের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং ইলেকট্রনিক মাধ্যমগুলোর উন্নতি সাধন করে যার উদ্দেশ্য হচ্ছে সরকার, জনগণ এবং ব্যবসা খাতকে আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বুদ্ধিভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে তুলতে সহায়তা প্রদান করা।

৫। জনগণের কাছে সরকারি সকল তথ্য ও উপাত্ত সহজলভ্য করার মাধ্যমে শাসন প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছতা প্রদান করার একটি উদ্দেশ্য ই-গভর্নেন্স বহন করে। এভাবে জনগণ সরকারের সিদ্ধান্ত ও নীতি সম্পর্কে সহজে জানতে পারে।

৬। সরকার তার গৃহীত প্রতিটি পদক্ষেপ সম্পর্কে জনগণের কাছে জবাবদিহি করায় দায়বদ্ধ। স্বচ্ছতার নিশ্চয়তা ও জনগণকে অধিক জ্ঞাত করার মাধ্যমে সরকারকে পূর্বের চেয়ে আরও বেশি জবাবদিহিমূলক পরিণত করা ই-গভর্নেন্সের উদ্দেশ্য।

৭। তথ্য ও সেবা প্রদানের খরচ কমিয়ে শাসন পরিচালনায় ব্যয় হ্রাস করা ই-গভর্নেন্সের উদ্দেশ্য। এ লক্ষ্যে স্টেশনারি উপাদানের খরচ কমানো যায়, যা সরকারি ব্যয়ের একটি বড় অংশ। এছাড়া ই-গভর্নেন্স যোগাযোগ ক্ষেত্রে ব্যয় অনেক হ্রাস করে। কারণ সরাসরি কোন স্থানে পৌঁছে যোগাযোগের চেয়ে ইলেক্ট্রনিক যোগাযোগ সময় ও খরচ অনেকাংশে কমিয়ে দেয়।

৮। যেহেতু জনগণের জন্য সরকার তাই জনগণের তদন্ত ও সমস্যাবলীর জবাবে সরকারকে দ্রুত পদক্ষেপ ও সমাধান সরবরাহ একান্ত জরুরি। ই-গভর্নেন্স জনগণের প্রতি সরকারের প্রত্যুত্তর ও প্রতিক্রিয়ার সময় অনেকাংশে কমিয়ে নিয়ে আসে।

মোটের উপর, আধুনিককালে ই-গভর্নেন্স সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম মাধ্যম বা প্রক্রিয়া হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	ই-গর্ভনেন্স এর উদ্দেশ্য কি?

সার-সংক্ষেপ

ই-গভর্নেন্সের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে সরকারের সাথে জনগণের দ্রুত সংযোগ সাধন, দ্রুত গতিতে সরকারি সেবাদান এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা। বর্তমান সময়ে যেকোন রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা নিশ্চিতকরণে ই-গভর্নেন্স অনিবার্য একটি বাস্তবতা হিসেবে দেখা দিয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ই-গভর্নেন্স সুশাসন প্রতিষ্ঠার
(ক) একমাত্র উপাদান (খ) একটি সহায়ক উপাদান
(গ) মূল লক্ষ্য (ঘ) উপরের সবই

২। ই-গভর্নেন্স জনগণের সরকারি সেবা পেতে
(ক) সময় বাঁচায় (খ) খরচ বাঁচায়
(গ) জনগণের কষ্ট বাড়িয়ে দেয় (ঘ) ক ও খ

পাঠ-৪.৩ ই-গভর্নেন্সের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of E-governance)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- ই-গর্ভনেন্সের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো জানতে পারবেন।
- ই-গর্ভনেন্সের মাধ্যমে কি কি সেবা পাওয়া যায় তা জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	ই-সেবা, বিশ্বায়ন, ওয়েবসাইট, দীর্ঘসূত্রিতা।

ই-গভর্নেন্সের বৈশিষ্ট্য

ই-গর্ভনেন্সের ধারণা থেকে এটি পরিষ্কার হয়েছে যে বর্তমান যুগে সরকারি সেবাদানের এটি একটি শক্তিশালী মাধ্যম। এই প্রক্রিয়ার সময়, অর্থ ও শ্রম সবই সাশ্রয় হয়। ই-গর্ভনেন্সের কার্যপ্রক্রিয়া লক্ষ্য করলে নিম্নলিখিত কিছু বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়-

সরকার ও জনগণের মধ্যকার দূরত্ব হ্রাস

১। আমলাতন্ত্র হ্রাস: ই-গভর্নেন্সের মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে সরকারের সাথে জনগণের দূরত্ব কমিয়ে আনা। সরকারের সকল সেবামূলক কর্মকাণ্ডকে জনগণের হাতের কাছে পৌঁছে দেয়া। এতে করে আমলাতন্ত্রের ওপর জনগণের নির্ভরতা কমে আসে।

২। ই-সেবা: ই-গর্ভনেন্সের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হল ইন্টারনেটের মাধ্যমে সেবা প্রদান। পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ, সরকারি ফর্ম ডাউনলোডের সুবিধা, জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধীকরণ, অনলাইনে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি সংক্রান্ত কাজ, ভিজিডি-ডিজিএফ কার্ড সংক্রান্ত তথ্য, চাকুরি সংক্রান্ত তথ্য, ভিসা প্রক্রিয়াকরণ ও ফর্ম সংগ্রহসহ নানা ধরনের সেবা ই-গর্ভনেন্সের বরাতে ইন্টারনেটের মাধ্যমে পাওয়া যায়।

৩। আন্তর্জাতিক সেবা: বিশ্বায়নের এই যুগে কেবলমাত্র দেশের ভেতরে নয় বরং দেশের বাইরে অবস্থানকারী নাগরিকদের ই-গর্ভনেন্সের সুফল দেয়া সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশের প্রায় ৮০ লক্ষ মানুষ বিদেশে কর্মরত রয়েছে। এই বিপুল সংখ্যক মানুষ নানাবিধ দাপ্তরিক প্রয়োজন পূরণে ই-গর্ভনেন্স সুবিধা নিতে পারছে।

৪। মতামত প্রদানের সুযোগ: ই-গর্ভনেন্স চালু হলে জনগণ খুব সহজে মতামত প্রদান করতে পারে। বর্তমানে অধিকাংশ সরকারই কোন নীতি প্রণয়নের পূর্বে তার একটি খসড়া সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের ওয়েবসাইটে যুক্ত করে জনগণের মতামত কামনা করে। পরবর্তীতে তা থেকে গুরুত্বপূর্ণ মতগুলোকে যুক্ত করে একটি নীতি চূড়ান্ত করা হয়। তাছাড়াও ই-গর্ভনেন্সের অধীনে বিভিন্ন অফিসের সেবার মান সম্পর্কেও মতামত প্রদানের সুযোগ রয়েছে।

৫। অর্থনৈতিক সচলতা: ই-গর্ভনেন্স চালু হলে আমদানি-রপ্তানি, কোম্পানির নিবন্ধন, বিনিয়োগ পরিস্থিতি, কাস্টমস প্রদানসহ নানাবিধ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যাদি ইন্টারনেটের মাধ্যমে পাওয়া যায়। এর ফলে সময় বাঁচে, দীর্ঘসূত্রিতা কমে এবং অর্থনৈতিক গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়।

৬। বৈষম্য হ্রাস: ই-গর্ভনেন্স প্রক্রিয়ার সরকারে সেবা লাভের ক্ষেত্রে বৈষম্য কমে আসে। ধনী-দরিদ্র, নারী-পুরুষ, কাছে-দূরের সকল নাগরিক কম-বেশি সমানভাবে সেবা নিতে পারে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	আপনার সহপাঠীর সাথে আলোচনা করে ই-গর্ভনেন্স এর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লিখুন।

সার-সংক্ষেপ

ই-গর্ভনেন্সের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল সরকারি সেবায় প্রযুক্তির অধিকতর প্রয়োগ। এর ফলে দেশের এমনকি দেশের বাইরে অবস্থানকারী নাগরিকেরাও দ্রুত সরকারি সেবা লাভ করতে পারে। ই-গর্ভনেন্স প্রশাসন ব্যবস্থায় গতিশীলতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিতিহতা নিশ্চিত করে। এক্ষেত্রে ব্যক্তির উপস্থিতি নয়, সেবাই মুখ্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ই-গভর্নেন্সের মূল ভিত্তি হচ্ছে এটি-

(ক) ব্যক্তিকেন্দ্রিক শাসন (খ) প্রযুক্তিবান্ধব শাসন

(গ) স্থানীয় শাসন (ঘ) উপরের সবই

২। ই-গভর্নেন্সের পরিধি-

(ক) দেশের অভ্যন্তরে সীমাবদ্ধ (খ) শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ

(গ) দেশের ভেতর এবং বাহিরেও বিস্তৃত (ঘ) উপরের কোনটিই না

পাঠ-৪.৪ ই-গভর্নেন্সের গুরুত্ব (Importance of E-governance)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- ই-গর্ভনেন্সের গুরুত্ব কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ই-গর্ভনেন্স কীভাবে জীবনমান উন্নতি করে তা জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, ন্যায়বিচার।

ই-গভর্নেন্সের গুরুত্ব

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ই-গভর্নেন্সের গুরুত্ব অপরিসীম। নিম্নে ই-গভর্নেন্স এর গুরুত্ব উল্লেখ করা হল–

১। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর জন্য ই-গর্ভনেন্স অপরিহার্য। এর মাধ্যমে সরকারি সেবা যেমন জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া সম্ভব, তেমনি সম্ভব সরকারের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা ও সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন। সরকার পরিচালনায় ব্যয় হ্রাসকরণসহ দুর্নীতি অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব ই-গর্ভনেন্স প্রবর্তনের মাধ্যমে।

২। উন্নত বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকার এখন তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে অর্থ আদান-প্রদান, প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ, কর সংগ্রহ, লাইসেন্স প্রদানসহ নানা সুবিধা নাগরিকদের সরবরাহ করে চলেছে। স্বল্পোন্নত একটি দেশ হিসাবে বাংলাদেশেও এর প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

৩। সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয় করে শাসনকার্য পরিচালনার জন্য ই-গভর্নেন্সের কোন জুড়ি নেই। এর ফলে সরকারের কাজকর্মে স্বচ্ছতা ও দক্ষতা দুই-ই বৃদ্ধি পায়।

৪। উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত অনেক দেশের সরকার খরচ করে বেশি, কাজ করে কম এবং তারা জবাবদিহিমূলকও নয়। ই-গভর্নেন্স এসব সীমাবদ্ধতাগুলোকে দূর করতে সহায়তা করে। সুশাসনে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার করে অনেক দেশই লক্ষণীয় সফলতা অর্জন করেছে। উদাহরনস্বরূপ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে দক্ষিণ আফ্রিকার মত দেশ তাদের শাসনব্যবস্থাকে পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করায় সক্ষম হয়েছে।

৫। নাগরিক ও সুশীল সমাজের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা প্রতিষ্ঠায় ই-গভর্নেন্স গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অনেক সময় সাধারণ জনগণও সরকারি তথ্য আদান-প্রদান ও মতামত দিয়ে সরকারকে অধিকতর সহযোগিতা করতে পারে। অর্থাৎ ই-গর্ভনেন্সের মাধ্যমে জনগণের অংশগ্রহণমূলক সরকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

৬। ই-গভর্নেন্সের ফলে সরকারি কাজে দুর্নীতির প্রকোপ কমে যায়। সরকারি কাজে দুর্নীতি হ্রাসে ফিলিপাইন ই-গর্ভনেন্সের সফল প্রয়োগে অনেকটাই সক্ষম হয়েছে।

৭। টেকসই উন্নয়নের জন্য ই-গর্ভনেন্স সময়ের দাবি; কেননা ই-গর্ভনেন্স উন্নয়নের অধিকাংশ শর্তকে সমর্থন করে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে ই-গর্ভনেন্স গুরুত্বপূর্ণ কেন?

সার-সংক্ষেপ

ই-গর্ভনেন্স এর গুরুত্ব অপরিসীম। বর্তমানে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ এর মাধ্যমে প্রশাসনকে গতিশীল, জনবান্ধব, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করেছে। বাংলাদেশে ই-গর্ভনেন্স চালু হওয়ায় এখন ঘরে বসেই কিংবা ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার বা অন্যান্য তথ্যসেবা কেন্দ্র হতে প্রশাসনিক বিভিন্ন তথ্য, চাকুরি, পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য, স্বাস্থ্য ও কৃষি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেবা পাওয়া যাচ্ছে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে সুবিধার কথা হল কম সময়ে, কম পরিশ্রমে ও সাশ্রয়ী মূল্যে সেবাগুলো পাওয়া যায়। এক কথায় ই-গর্ভনেন্সের ফলে প্রশাসনে জনগণের অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ই-গভর্নেন্সের প্রধান মাধ্যম হচ্ছে-

(ক) ইন্টারনেট (খ) আমলাতন্ত্র

(গ) ইংরেজি (ঘ) উপরের সবই

২। ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে সরকারি কর্মকাণ্ডে সমন্বয় সাধন সহজ হয়। বক্তব্যটি-

(ক) মিথ্যা (খ) সত্য

(গ) আংশিক সত্য (ঘ) পুরোপুরি মিথ্যা

পাঠ-৪.৫ ই-গভর্নেন্সের প্রতিবন্ধকতা (Challenges of E-governance)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- ই-গভর্নেন্সের প্রধান প্রধান প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	সার্ভার, ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ, অবকাঠামো, নীতিমালা, বাজেট।

ই-গর্ভনেন্সের সুবিধা অনেক, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে এটি প্রচলন করা ব্যয়বহুল ও সময় সাপেক্ষ। উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশগুলো ই-গর্ভনেন্স চালু করতে গিয়ে নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। নীচে এ বাঁধাগুলো আলোচনা করা হল।

১। দিম্পি শ্রীবাস্তব এবং কে শর্মা (২০১০), ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠার পথে সবচেয়ে বড় অন্তরায় হিসেবে ভৌগোলিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাকে চিহ্নিত করেছেন। নিরক্ষরতা ও অবকাঠামোগত সংকটের কারণেও ই-গর্ভনেন্সের সফলতার সম্ভাবনা কমে যায়।

২। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে নাগরিক বিপুল অংশের মধ্যে সচেতনতার অভাব থাকায়, তারা ই-গর্ভনেন্সের সুবিধা গ্রহণে এখনো অক্ষম। অনেক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বাংলাদেশের সরকারি পোর্টালে এখন প্রায় ৬৫টি সেবার ফরম পাওয়া যায়। কিন্তু সাধারণ জনগোষ্ঠীর অনেকেই এ সম্পর্কে অবগত নয়।

৩। জোসেফ বাউলিয়া (২০০৯) এর মতে, ই-গভর্নেন্সের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রতিবন্ধক হচ্ছে বাজেট এবং প্রশিক্ষণের অভাব। বাংলাদেশেও এ সমস্যাগুলো প্রকট। উল্লেখ্য ২০১৫-১৬ অর্থবছরে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ দুই হাজার কোটি টাকার অধিক অর্থ প্রস্তাব করলেও, অর্থ মন্ত্রণালয় তার অর্ধেক বরাদ্দ করতে পেরেছে।

৪। বাংলাদেশের মত অনেক দেশে ই-গভর্নেন্স যথাযথভাবে কার্যকর করার পথে একটি প্রধান অন্তরায় বিদ্যুৎ সংযোগ ও বিদ্যুৎ ঘাটতি। বর্তমানে তিন-চতুর্থাংশ জনগোষ্ঠী বিদ্যুৎ সুবিধা ভোগ করলেও এখন অবধি বিপুল জনগোষ্ঠী এই আওতার বাহিরে। তাছাড়া পল্লী অঞ্চলে ঘনঘন লোডশেডিং ও বিদ্যুৎ সরবরাহের ভোল্টেজ কম হবার কারণে কম্পিউটার ও ইন্টারনেট ব্যবহার বাধাগ্রস্ত হয়।

৫। বাংলাদেশের মত দেশে ই-গভর্নেন্সের জন্য গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি বাঁধা হচ্ছে ইন্টারনেটের ধীর গতি ও উচ্চমূল্য। বাংলাদেশে ১০ ভাগের বেশি সংখ্যক মানুষের ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা রয়েছে।

৬। ব্যক্তি পর্যায়ে ই-গভর্নেন্সের সুবিধা পেতে হলে নিজস্ব কম্পিউটার থাকা জরুরী, যা দরিদ্র জনগণের পক্ষে সম্ভবপর হয় না।

৭। কম্পিউটারের সার্ভার তথ্য ভাণ্ডার হিসেবে কাজ করে বিধায়, প্রযুক্তিগত কারণে এ সার্ভারের কার্যক্রমে ত্রুটি দেখা দিলে রাষ্ট্রীয়, সরকারি ও ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস হবার আশঙ্কা থাকে, যা ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষার অধিকারের পরিপন্থী।

৮। প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনী কাঠামোর অভাবে অনেক সময় ই-গর্ভনেন্স চালুকরণের উদ্যোগ বাধাগ্রস্ত হয়।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে ই-গর্ভনেন্স এর প্রতিবন্ধকতাগুলো কি কি?

সার-সংক্ষেপ

ই-গর্ভনেন্স যথাযথভাবে প্রচলনের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও নীতি-নির্ধারণ এবং অবকাঠামোর উন্নয়ন জরুরি। বাংলাদেশের মতো দেশে দক্ষ জনবলের অভাব, সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থা না থাকা, সর্বোপরি ডিজিটাল উপকরণের সহজলভ্যতা না থাকা এবং বিনিয়োগের অভাব ই-গর্ভনেন্স প্রতিষ্ঠায় বিঘ্ন ঘটায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলাদেশে ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠার একটি অন্যতম প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে-

(ক) জনসচেতনতার অভাব (খ) অর্থনৈতিক বৈষম্য

(গ) উপরের কোনটিই না (ঘ) ক ও খ

২। বিদ্যুতের অভাব ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠার জন্য-

(ক) সহায়ক (খ) অন্তরায়

(গ) বিবেচ্য নয় (ঘ) কোনটি নয়

পাঠ-৪.৬ ই-গভর্নেন্সের প্রতিবন্ধকতা দূর করার উপায় (Measures to Overcome Challenges of E-governance)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- ই-গভর্নেন্সের প্রতিবন্ধকতা দূর করার উপায় সম্পর্কে জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	জনসচেতনতা, দক্ষতা, সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ, নেটওয়ার্কিং, গোপনীয়তা।

ই-গভর্নেন্স হচ্ছে সরকার কর্তৃক আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির (যেমন, ইন্টারনেট, স্থানীয় এলাকা নেটওয়ার্ক, বিস্তৃত এলাকা নেটওয়ার্ক এবং মোবাইল ফোন) মাধ্যমে নাগরিকদেরকে উন্নত এবং দক্ষতার সাথে সরকারি সেবা প্রদান করা। কিন্তু এ সেবা প্রদানে অনেক প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়। সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ই-শাসন প্রচলনের অন্তরায় দূর করার জন্য নিম্নলিখিত উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

১। ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠার জন্য একটি কেন্দ্রীয় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সৃষ্টি করা দরকার। এই কাঠামোটি সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় প্রশাসনের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে জনগণকেন্দ্রিক ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠা করবে। এছাড়াও এরকম একটি কাঠামোর মাধ্যমে ই-গভর্নেন্সের সার্বিক কর্মকাণ্ডের ওপর তত্ত্বাবধান করা সম্ভবপর হবে।

২। বাংলাদেশের মত দেশে ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা রক্ষার বিধান যুক্ত করে, ২০০৯ এর ICT Act সংশোধন করতে হবে। ২০০৯ সালের RTI Act এর যথাযথ বাস্তবায়ন করতে হবে। এই Act এর বাস্তবায়নের ভিত্তিতে জনগণের তথ্য অধিকার প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত হবে।

৩। ই-গভর্নেন্স সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। এক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক এবং প্রিন্ট মিডিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বিশেষ করে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর ওয়েবসাইটে কি ধরনের সেবা প্রদানের তথ্য রয়েছে তা সম্পর্কে জনগনকে সচেতন করা উচিত।

৪। ই-গভর্নেন্স এর সুবিধা দেশের সকল মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হলে, এর জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো শহর থেকে গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত করতে হবে। এক্ষেত্রে সরকারি বিনিয়োগের পাশাপাশি বেসরকারি বিনিয়োগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

৫। ই-গভর্নেন্সের সুফল পেতে হলে নাগরিকদের তথ্যের গোপনীয়তা এবং নিরাপত্তা রক্ষা করতে হবে।

৬। ই-গর্ভনেন্সের জন্য অত্যাবশ্যক হচ্ছে প্রতিবন্ধকতাহীন বিদ্যুৎ সরবরাহ। এটি দেশের সার্বিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত।

৭। ই-গভর্নেন্সের সফলতার জন্য প্রয়োজন ইন্টারনেট যোগাযোগের গতি বৃদ্ধি করা।

৮। ই-গভর্নেন্স এর মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে, এই প্রযুক্তিতে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা একান্ত অপরিহার্য।

৯। ই-গর্ভনেন্স প্রচলনের জন্য লাগসই প্রযুক্তি আমদানি, ক্ষেত্র বিশেষে লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন করার জন্য বিভিন্ন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সম্পাদন করা যেতে পারে।

১০। বাংলাদেশের মতো দেশে কেবল ই-গর্ভনেন্স এর প্ল্যাটফর্ম ও সুবিধা তৈরি করলেই হবে না, বরং তা ব্যবহারের মতো ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিও সৃষ্টি করতে হবে।

সর্বোপরি জনগনকে ই-গর্ভনেন্স ব্যবহারে প্রস্তুত করা (e-readiness), এবং জনগনের মধ্যে ডিজিটাল বৈষম্য (digital divide) হ্রাসকরণে কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	ই-গর্ভনেন্সের প্রতিবন্ধকতা কিভাবে দূর করা যায়?

সার-সংক্ষেপ

ই-গর্ভনেন্স হল সরকারি সেবা দ্রুত ও সঠিকভাবে প্রদানের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এ সেবা প্রদানের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন খুব জরুরি। ই-গর্ভনেন্স সফল করার জন্য জনগণের মধ্যে সচেতনা বৃদ্ধি, সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থা, দক্ষ জনবল তৈরি, ইন্টারনেটের গতি বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজন। সর্বোপরি এ সেবা প্রদান ও প্রাপ্তিতে প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তা যেন বিঘ্নিত না হয় সে দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ই-গভর্নেন্সের প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য প্রয়োজন হচ্ছে-

(ক) এ সংক্রান্ত অবকাঠামো গড়ে তোলা (খ) এ সংক্রান্ত আইনী সংস্কার করা

(গ) এ সংক্রান্ত দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা (ঘ) উপরের সবই

২। ই-গভর্নেন্সের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে-

(ক) তথ্যের গোপনীয়তা (খ) তথ্য ফাঁস

(গ) তথ্য পাচার (ঘ) তথ্য বিকৃতি

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

(১) আমুয়াকান্দি গ্রামের রহিমা বেগমের ছেলে আবুল হোসেন মালয়েশিয়াতে একটি প্রত্যন্ত অঞ্চলে কর্মরত। বহুদিন তিনি ছেলের কোন খোঁজ-খবর পাচ্ছেন না। ছেলে যাবার আগে অষ্টম শ্রেণি পড়ুয়া ছোট বোন আকলিমা খাতুনকে একটি ই-মেইল নম্বর দিয়ে গেছে। কিন্তু আকলিমাও খুব ভাল করে জানে না ই-মেইল কি? ভাই বলে গিয়েছে যে, এটি নিয়ে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে গেলেই তার সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হবে।

ক) ই-গর্ভনেন্স কি?

খ) ই-গর্ভনেন্স এর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লিখুন।

গ) উদ্দীপক অনুযায়ী ই-গর্ভনেন্স বাস্তবায়নের জন্য মাধ্যমগুলো সম্পর্কে লিখুন।

ঘ) উদ্দীপকে বর্ণিত ডিজিটাল সেন্টার এর কার্যক্রম বর্ণনা করুন।

(২) আবু তাহের চিকিৎসার জন্য ভারত যেতে চান। তাঁর বাড়ী জামালপুরে। ঢাকায় তাঁর কোন আত্মীয়-স্বজনের বাড়ী নেই। অথচ তাঁকে ভারতের ভিসা যোগাড় করতে হবে। একদিন তিনি ঢাকায় আসেন ভিসা ফর্ম সংগ্রহ করার জন্য। বন্ধু জালাল উদ্দিন তাঁকে বলে, তুমি শুধু ভিসা ফর্মের জন্য ঢাকায় কেন আসলে? জামালপুরে বসেই এই অনলাইনে ফর্ম সংগ্রহ করা সম্ভব। অনলাইনের কথা শুনে আবু তাহের অবাক হন।

ক) শাসন ব্যবস্থার ডিজিটাল রূপ কি?

খ) ই-গর্ভনেন্স এর কয়েকটি গুরুত্ব লিখুন।

গ) ই-গর্ভনেন্স কেন প্রয়োজন? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করুন।

ঘ) ই-গর্ভনেন্স বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতাগুলো বর্ণনা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.১ ঃ ১। ক ২। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.২ ঃ ১। খ ২। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৩ ঃ ১। খ ২। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৪ ঃ ১। ক ২। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৫ ঃ ১। ঘ ২। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৬ ঃ ১। ঘ ২। ক

নাগরিক অধিকার, কর্তব্য ও মানবাধিকার

(Citizen Rights, Duties and Human Rights)

ইউনিট ৫

পৌরনীতি ও সুশাসনের প্রধান আলোচ্য বিষয় নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য। অধিকার ও কর্তব্যের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক বিশ্বের সদস্য হিসেবে আমরা সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, মৌলিক ও মানবাধিকার ভোগ করি। এসব অধিকার ভোগের মাধ্যমে প্রতিটি মানুষ ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ পায়। অন্যদিকে এসব অধিকার কর্তব্য পালনের ইঙ্গিত প্রদান করে। অর্থাৎ অধিকার ভোগের সাথে সাথে সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক বিশ্বের প্রতি কর্তব্য পালন করতে হয় অধিকার ও কর্তব্যের সম্পর্ক এতটাই ঘনিষ্ঠ যে একটি ছাড়া অন্যটির কথা অকল্পনীয়। এ ইউনিটে অধিকার ও কর্তব্যের ধারনা, পারস্পরিক সম্পর্ক, শ্রেণিবিভাগ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৫.১ ঃ অধিকারের ধারণা	পাঠ-৫.৫ ঃ জাতিসংঘে বর্ণিত মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র
পাঠ-৫.২ ঃ অধিকারের শ্রেণিবিভাগ	পাঠ-৫.৬ ঃ মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকার
পাঠ-৫.৩ ঃ মৌলিক অধিকার	পাঠ-৫.৭ ঃ নাগরিক কর্তব্য
পাঠ-৫.৪ ঃ মানবাধিকার	পাঠ-৫.৮ ঃ অধিকার ও কর্তব্যের সম্পর্ক

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ**

পাঠ-৫.১ অধিকারের ধারণা (Concept of Rights)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- অধিকারের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	অধিকার , সুযোগ-সুবিধা, অপরিহার্য, অনুমোদিত।

অধিকারের ধারণা

সাধারণত অধিকার বলতে নিজের ইচ্ছানুযায়ী কোন কিছু করার বা পাওয়ার ক্ষমতাকে বোঝায়। এদিক থেকে বিচার করলে আইন বিরোধী কাজ করাকেও অধিকার বলা যায়। কিন্তু পৌরনীতি ও সুশাসনে এ ধরনের কাজকে স্বেচ্ছাচার বলা হয়। অধ্যাপক আনেস্ট বার্কার যথার্থই বলেন, "অধিকার তখনই প্রকৃত অধিকার হতে পারে যখন রাষ্ট্র সেগুলোকে অধিকার বলে স্বীকার করে এবং সেগুলো রক্ষার জন্য সচেষ্ট হয়।" অর্থাৎ রাষ্ট্র ও সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত ও অনুমোদিত সুযোগ বা সুবিধাকে অধিকার বলা যায়। যেমন– পরিবার গঠন, শিক্ষা লাভ, নির্বাচনে ভোটদান, নির্বাচিত হওয়ার মত অধিকারের প্রতি সমাজ ও রাষ্ট্রের স্বীকৃতি ও অনুমোদন রয়েছে।

অধিকার ভোগের মাধ্যমে ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে। সেই সাথে সমাজ ও রাষ্ট্রে কল্যাণকর পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক হ্যারল্ড লাস্কি বলেন 'অধিকার বলতে আমরা সামাজিক জীবনের সেসব শর্তকে বুঝি, যা ব্যতীত সাধারণভাবে

ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন উন্নয়ন অসম্ভব।" এ থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ব্যক্তির কল্যাণের জন্য অধিকার অপরিহার্য। বস্তুত প্রকৃত অধিকার বলতে সমাজ কল্যাণের জন্য কতগুলো শর্তকে বোঝায়।

অধিকার সম্পর্কে উপরিউক্ত আলোচনা বিশ্লেষণ করলে কতগুলো বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়–

১. **সুযোগ-সুবিধার সমষ্টি:** অধিকার হল ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ও জীবনকে বিকশিত করার জন্য কতগুলো সুযোগ-সুবিধার সমষ্টি। যেমন, জীবন রক্ষার অধিকার, কর্মের অধিকার, ধর্ম সংক্রান্ত অধিকার প্রভৃতি।

২. **সমাজ কর্তৃক সৃষ্ট:** মানুষ সামাজিক জীব। সমাজে সুন্দরভাবে বসবাস করার জন্য প্রয়োজন হয় নানা অধিকার। আর এসব অধিকার সমাজ কর্তৃক সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ অধিকার সমাজ কর্তৃক অবশ্যই স্বীকৃত।

৩. **রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত:** অধিকার রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। আর এজন্য রাষ্ট্র অধিকার হরণকারীকে শাস্তি দিয়ে থাকে।

৪. **কল্যাণের সহায়ক:** অধিকারের মূল লক্ষ্য সকল মানুষের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধন করা। এর ফলশ্রুতিতে সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়ন হয়।

৫. **পরিবর্তনশীল:** সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে অধিকারের প্রকৃতি পরিবর্তন হতে পারে। যেমন, এক সময় না থাকলেও, বর্তমানে নারীদের ভোটাধিকার আছে।

উপরিউক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়, অধিকার হচ্ছে এমন কতগুলো সুযোগ-সুবিধা, যা সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও অনুমোদিত এবং যা ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের সহায়ক।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	অধিকার সম্পর্কে আপনার ধারণা ব্যাখ্যা করুন।

সার-সংক্ষেপ

অধিকার হল এমন কতগুলো সুযোগ সুবিধা, যা সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও অনুমোদিত এবং যা ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের সহায়ক। অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আইনের আশ্রয় নেয়া যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। অধিকার বলতে বোঝায়–
i) নিজের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করা
ii) সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত সুবিধা
iii) রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত সুযোগ
কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii
গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

২। "অধিকার তখনই প্রকৃত অধিকার হতে পারে যখন রাষ্ট্র সেগুলোকে অধিকার বলে স্বীকার করে এবং সেগুলো রক্ষার জন্য সচেষ্ট হয়।" এটি কার উক্তি?
ক) অধ্যাপক গেটেল খ) অধ্যাপক গার্নার
গ) অধ্যাপক বার্কার ঘ) অধ্যাপক ডাইসি

৩। অধিকারের প্রধান বৈশিষ্ট্য–
i) সকল সুযোগ-সুবিধার সমষ্টি
ii) সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও অনুমোদিত
iii) কল্যাণকর ও পরিবর্তনশীল
কোনটি সঠিক?
ক) i খ) ii
গ) iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৫.২ অধিকারের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Rights)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- নাগরিক অধিকারের শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক।

অধিকারের শ্রেণিবিভাগ

অধিকারের প্রকৃতি অনুসারে নাগরিক অধিকার সমূহকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

(১) নৈতিক অধিকার ও

(২) আইনগত অধিকার

আবার আইনগত অধিকারকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

ক) সামাজিক অধিকার

খ) রাজনৈতিক অধিকার

গ) অর্থনৈতিক অধিকার

অধিকারের শ্রেণিবিভাগকে একটি ছকের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়–

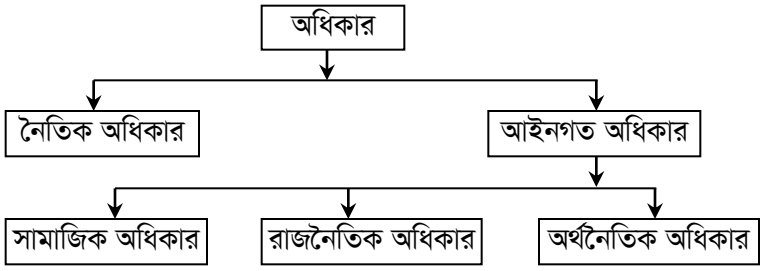

১। **নৈতিক অধিকারঃ** যেসব অধিকার নাগরিকের বিবেক বা ন্যায়বোধ থেকে সৃষ্টি হয়, সেগুলোকে নৈতিক অধিকার বলা হয়। যেমন, সন্তানের কাছে মা-বাবার শ্রদ্ধা প্রাপ্তির অধিকার কিংবা প্রতিবেশীর কাছ থেকে সদাচারণ পাবার অধিকার। এসব অধিকার নাগরিকের বিবেক ও ন্যায়বোধ থেকে উদ্ভব হয়। নৈতিক অধিকার ভঙ্গের জন্য রাষ্ট্র শাস্তি দেয় না, তবে এই অধিকার খর্বকারীকে সমাজ স্বাভাবিকভাবে নেয় না।

২। **আইনগত অধিকারঃ** যেসব অধিকার রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও অনুমোদিত, সেগুলোকে আইনগত অধিকার বলে। যেমন– জীবন ধারণের অধিকার, ভোটদানের অধিকার, শিক্ষার অধিকার। এসব অধিকার ভঙ্গ করলে বা হরণ করলে রাষ্ট্র শাস্তি প্রদান করে। আইনগত অধিকারকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

(ক) সামাজিক অধিকার : সমাজে সুন্দরভাবে সুখ-শান্তিতে বসবাসের জন্য নাগরিকগণ যেসব অধিকার ভোগ করে, সেগুলোকে সামাজিক অধিকার ভোগ বলে। যেমন– জীবন রক্ষা, মত প্রকাশ, চলাফেরা, বিনা বিচারে আটক না হওয়া, সংঘবদ্ধ হওয়া, সভা-সমিতি, চুক্তি স্থাপন, সম্পত্তি ভোগ, আইনের চোখে সমতা লাভ, শিক্ষা লাভ, সংবাদপত্রের

স্বাধীনতা, পরিবার গঠন, নিজ-নিজ সংস্কৃতি ও ভাষা চর্চার অধিকার। সভ্য জীবন-যাপনের জন্য এসব অধিকার নাগরিকের জন্য অপরিহার্য।

(খ) রাজনৈতিক অধিকার: রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণের জন্য নাগরিকরা যেসব অধিকার ভোগ করে, সেগুলোকে রাজনৈতিক অধিকার বলে। যেমন– ভোটদান, নির্বাচনে অংশগ্রহণ, সরকারি চাকরি লাভ, সরকারি কাজের সমালোচনা, আবেদন করা রাজনৈতিক অধিকার। এসব অধিকারের মাধ্যমে আমরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহন করতে পারি।

(গ) অর্থনৈতিক অধিকার: ক্ষুধা, দারিদ্র ও বেকারত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য নাগরিকগণ যেসব অধিকার ভোগ করেন, সেগুলোকে অর্থনৈতিক অধিকার বলে। যেমন– কর্মের অধিকার, উপযুক্ত পারিশ্রমিক, অবকাশ যাপন প্রভৃতি অর্থনৈতিক অধিকার। নাগরিকগণ এসব অধিকার ভোগ করার সুযোগ পেলে ক্ষুধা, দারিদ্র ও বেকারত্ব দূর হবে এবং অন্যান্য অধিকার ভোগের চাহিদা সৃষ্টি হবে। এজন্য বলা হয় অর্থনৈতিক অধিকার ব্যতীত রাজনৈতিক অধিকার অর্থহীন। অর্থাৎ অর্থনৈতিক অধিকার পূরণ হলেই রাজনৈতিক ও অন্যান্য অধিকার ভোগের আকাঙ্খা তৈরি হয়।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকারের সম্পর্ক লিখুন।

সার-সংক্ষেপ

অধিকার প্রধানত দু'প্রকার। যথা– (১) নৈতিক ও (২) আইনগত অধিকার। নাগরিকের বিবেকবোধ থেকে সৃষ্ট অধিকার হল নৈতিক অধিকার। অধিকারকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা– (ক) সামাজিক, (খ) রাজনৈতিক ও (গ) অর্থনৈতিক অধিকার। পক্ষান্তরে যেসব অধিকার রাষ্ট্রের আইন কর্তৃক স্বীকৃত ও অনুমোদিত, সেগুলো আইনগত অধিকার। সমাজে সুসভ্যভাবে বেঁচে থাকার জন্য মানুষ যে অধিকার ভোগ করে তা হল সামাজিক অধিকার, রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণ জন্য নাগরিকের রাজনৈতিক অধিকার এবং ক্ষুধা, দারিদ্র ও বেকারত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য মানুষ যে অধিকার ভোগ করে তা অর্থনৈতিক অধিকার হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। অধিকার প্রধানত কত প্রকার?
ক) ১ খ) ২
গ) ৩ ঘ) ৪

২। রাষ্ট্রের আইন কর্তৃক স্বীকৃত অধিকার–
ক) নৈতিক খ) চলাফেরা করার
গ)ভিক্ষুকের ভিক্ষা পাওয়ার

৩। নাগরিকের সামাজিক অধিকার–
ক) দায়মুক্তি খ) বিদেশে নিরাপত্তা লাভ
গ) সরকারি চাকুরি ঘ) সম্পত্তি ভোগ

৪। নাগরিকের রাজনৈতিক অধিকার–
ক) কর ফাঁকি খ) সভা-সমিতি
গ) স্থায়ীভাবে বসবাস ঘ) বিদেশে চাকুরি

পাঠ-৫.৩ মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- মৌলিক অধিকারের ধারণা বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশের নাগরিকের মৌলিক অধিকার ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	মৌলিক, অপরিহার্য, সংবিধান, অনুমোদিত, স্বীকৃত।

মৌলিক অধিকারের ধারণা

যে সব অধিকার সংবিধানে উল্লেখ থাকে এবং সরকার কর্তৃক অলঙ্ঘনীয় সেগুলোকে মৌলিক অধিকার বলে। এসব সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার রাষ্ট্রের সংবিধানে উল্লেখ থাকে। মৌলিক অধিকারের মাধ্যমে নাগরিকরা সুসভ্যভাবে জীবন-যাপন করতে পারে। এ অধিকার সরকারের স্বৈরাচার রোধ করে। যে কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সংবিধানে মৌলিক অধিকার সন্নিবেশিত থাকে। যেমন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের তৃতীয় ভাগে মৌলিক অধিকার বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে সেগুলো উল্লেখ করা হল–

১. **আইনের দৃষ্টিতে সমতা:** সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের আশ্রয় লাভের অধিকারী।

২. **সমানাধিকার:** ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী পুরুষভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করবে না। রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী-পুরুষ সমানাধিকার লাভ করবে। নারী, শিশু ও অনগ্রসর সম্প্রদায়ের জন্য রাষ্ট্র বিশেষ বিধান প্রণয়ন করতে পারবে।

৩. **সরকারী নিয়োগলাভের সুযোগে সমতা:** বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিক সরকারী নিয়োগ বা পদ-লাভের ক্ষেত্রে সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবে। অর্থাৎ ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদে বা জন্মস্থানের কারণে নিয়োগের ক্ষেত্রে কোন বৈষম্য থাকবে না।

৪. **আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার:** বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিক আইনের আশ্রয় লাভ করতে পারবে। আইনের বিধান ব্যতীত কোন নাগরিকের জীবন, স্বাধীনতা, সম্মান ও সম্পত্তির হানি করা যাবে না।

৫. **জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকার:** বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিকের জীবনধারণ ও ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকার রয়েছে। কোন ব্যক্তিকে এ অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

৬. **গ্রেপ্তার ও আটক সম্পর্কে রক্ষাকবচ:** গ্রেপ্তার ও আটক সম্পর্কে নাগরিকের কতগুলো রক্ষাকবচ রয়েছে। যেমন– (i) গ্রেপ্তারের কারণ না জানিয়ে কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা যাবে না। (ii) গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তি তার পছন্দ অনুযায়ী আইনজীবীর সাথে পরামর্শ ও তার দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পারবে। (iii) গ্রেপ্তারকৃত ও প্রহরায় আটক প্রত্যেক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে হাজির করতে হবে। (iv) ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতীত গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিকে চব্বিশ ঘন্টার বেশি প্রহরায় আটক রাখা যাবে না। (v) বিদেশী শত্রু কিংবা নিবর্তনমূলক আটকের আইনে গ্রেপ্তার ব্যক্তির ক্ষেত্রে রক্ষাকবচগুলো প্রযোজ্য হবে না

৭. **জোরপূর্বক শ্রম নিষিদ্ধ:** কোন নাগরিককে জোরপূর্বক শ্রমে লিপ্ত করা যাবে না। অর্থাৎ সকল প্রকার জবরদস্তি-শ্রম নিষিদ্ধ। এ বিধান কোনভাবে লঙ্ঘিত হলে তা আইনত: দন্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হবে। তবে ফৌজদারী মামলায় সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে এবং জনকল্যাণার্থে উক্ত বিধান কার্যকর হবে না।

৮. **বিচার ও দন্ড:** প্রচলিত আইন ভঙ্গ করার অপরাধ ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না। এমনকি, আইনে নির্ধারিত দন্ড ব্যতীত অধিক দন্ড দেয়া যাবে না।

৯. **চলাফেরার স্বাধীনতা:** জনস্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বিধি নিষেধ সাপেক্ষে প্রতিটি নাগরিক দেশের সর্বত্র অবাধে চলাফেরা, বসবাস ও বসতিস্থাপন করতে পারবে। এ ছাড়াও, দেশ ত্যাগ ও দেশে পুনঃপ্রবেশ করার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকবে।

১০. **সমাবেশের স্বাধীনতা:** জনশৃঙ্খলা বা জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বিধি নিষেধ সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিক শান্তিপূর্ণভাবে ও নিরস্ত্রাবস্থায় সমবেত হবার এবং জনসভা ও শোভাযাত্রায় যোগদান করার অধিকার রয়েছে।

১১. **সংগঠনের স্বাধীনতা:** আইন সঙ্গত উপায়ে প্রত্যেক নাগরিক সমিতি বা সংঘ গঠন করতে পারবে। তবে এরূপ সমিতি বা সংঘ গঠন করা কিংবা এর সদস্য হওয়ার অধিকার থাকবে না, যদি–

ক) তা নাগরিকদের মধ্যে ধর্মীয়, সামাজিক এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়।

খ) তা ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ, জন্মস্থান বা ভাষার ক্ষেত্রে বৈষম্য সৃষ্টি করে।

গ) তা রাষ্ট্র বা নাগরিকদের বিরুদ্ধে কিংবা অন্য কোন দেশের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী বা জঙ্গী কার্য পরিচালনার উদ্দেশ্যে ঘটিত হয়। কিংবা ঐ সংগঠনের গঠন ও উদ্দেশ্য সংবিধান পরিপন্থী হয়।

১২. **চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা:** প্রত্যেক নাগরিকের চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা রয়েছে। তাছাড়া আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বিধি নিষেধ সাপেক্ষে (ক) প্রত্যেক নাগরিকের বাক্ ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার রয়েছে। (খ) সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা রয়েছে।

১৩. **পেশা বা বৃত্তির স্বাধীনতা:** প্রত্যেক নাগরিক যোগ্যতা অনুযায়ী আইন সঙ্গত পেশা বা বৃত্তি গ্রহণ এবং কারবার বা ব্যবসা পরিচালনা করতে পারবে। অর্থাৎ প্রত্যেক নাগরিক তার পছন্দ অনুযায়ী যেকোন বৈধ পেশা গ্রহণ করতে পারবে।

১৪. **ধর্মীয় স্বাধীনতা:** আইন, জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতা সাপেক্ষ

ক) প্রত্যেক নাগরিকের যেকোন ধর্ম অবলম্বন, পালন বা প্রচারের অধিকার রয়েছে।

খ) প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নিজস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন, রক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার অধিকার রয়েছে।

১৫.সম্পত্তির অধিকার: আইন অনুযায়ী প্রত্যেক নাগরিক সম্পত্তি অর্জন, ধারণ ও হস্তান্তর করতে পারবে। আইনের কর্তৃত্ব ব্যতীত কোন সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্ত বা দখল করা যাবে না।

১৬. **গৃহ ও যোগাযোগের রক্ষণ:** রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, জনশৃঙ্খলা, জনসাধারণের নৈতিকতা বা জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বিধি-নিষেধ সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের–

ক) প্রবেশ, তল্লাশী ও আটক থেকে স্বীয় গৃহে নিরাপত্তা লাভের অধিকার থাকবে;

খ) চিঠিপত্রের ও যোগাযোগের অন্যান্য উপায়ের গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার থাকবে।

উল্লেখিত মৌলিক অধিকার ভোগের মাধ্যমে একদিকে নাগরিক জীবনের বিকাশ ঘটে। অন্যদিকে স্ব-স্ব কর্তব্য সম্পর্কে নাগরিকগণ সচেতন হয়। এর ফলশ্রুতিতে সরকার তার দায়িত্ব পালনে আরও সচেষ্ট হয়।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি**) /শিক্ষার্থীর কাজ**	আপনি যেসব মৌলিক অধিকার ভোগ করেন তার একটি তালিকা তৈরি করুন।

সার-সংক্ষেপ

যেসব অধিকার সংবিধানে উল্লেখ থাকে এবং সরকার কর্তৃক অলঙ্ঘনীয় সেগুলোকে মৌলিক অধিকার বলে। বাংলাদেশের নাগরিকদের কয়েকটি মৌলিক অধিকার হল আইনের দৃষ্টিতে সমতা লাভ, সরকারি নিয়োগলাভের অধিকার, আইনের আশ্রয়লাভের অধিকার, জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকার, গ্রেপ্তার ও আটক সম্পর্কে রক্ষাকবচ, চলাফেরার স্বাধীনতা প্রভৃতি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। মৌলিক অধিকারের প্রধান বৈশিষ্ট্য–

i) নীতিবোধ থেকে আগত
ii) সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারের সমষ্টি
iii) সংবিধানে উল্লেখ থাকে

কোনটি সঠিক?

ক) i খ) ii
গ) iii ঘ) i, ii ও iii

২। বাংলাদেশের সংবিধানের কোন ভাগে মৌলিক অধিকার বর্ণিত হয়েছে?

ক) প্রথম খ) দ্বিতীয়
গ) তৃতীয় ঘ) চতুর্থ

৩। কোনটি বাংলাদেশের নাগরিকের মৌলিক অধিকার?

i) আইনের দৃষ্টিতে সমতা
ii) জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতার এবং চলাফেরা করার
iii) ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সম্পত্তির অধিকার

কোনটি সঠিক?

ক) i খ) ii
গ) i ও ii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৫.৪ মানবাধিকার (Human Rights)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- মানবাধিকারের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	মানবাধিকার, সার্বজনীন, মানবিক বিকাশ, মর্যাদা।

মানবাধিকারের ধারণা

অধিকারবোধ থেকে মানবাধিকারের উৎপত্তি হয়েছে। মানবাধিকার বলতে সেসব আইনগত ও নৈতিক অধিকারকে বোঝায়, যা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এবং সমগ্র বিশ্বের মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অর্থাৎ মানবাধিকার আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত অধিকার। প্রতিটি মানুষ এ অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র গৃহীত হয়। এই ঐতিহাসিক দলিল গ্রহণের মধ্য দিয়ে বিশ্বে এক নতুন দিগন্তের সূচনা ঘটে।

জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত ঘোষণাপত্রে মানবাধিকার সংক্রান্ত কতগুলো সাধারণ নীতি রয়েছে। যেমন–

১. সকল মানুষ সমান মর্যাদা ও অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে।

২. সকল মানুষ যেকোন প্রকার পার্থক্য, যথা– জাতি, গোত্র, বর্ণ, লিঙ্গ, ভাষা, ধর্ম, মতাদর্শ, জাতীয় ও সামাজিক পরিচিতি, সম্পত্তি, জন্ম বা অন্য কোন মর্যাদা নির্বিশেষে ঘোষণায় উল্লেখিত সকল অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগের অধিকারী।

৩. মানবাধিকার সমগ্র বিশ্বের সর্বস্থানে সর্বকালের সকল মানুষের প্রাপ্য।

৪. বিশ্বের যেকোন রাষ্ট্রের নাগরিককে তাঁর দেশের বা আন্তর্জাতিক মর্যাদার ভিত্তিতে কোন পার্থক্য করা হবে না।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, মানবাধিকারের পরিধি ব্যাপক ও বিস্তৃত। মানবাধিকারের ধারণা, নীতি ও পরিধি পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে– প্রথমত, মানবাধিকার এমন কিছু অধিকার যা সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য। দ্বিতীয়ত, মানবাধিকার সকলের অধিকার, কোন শ্রেণি বা দলের নয়। তৃতীয়ত, মানবাধিকার সকল মানুষের জন্য সমভাবে প্রাপ্য; কারো জন্য কম বা বেশি নয়। চতুর্থত, মানবাধিকার কোন বিশেষ মর্যাদা বা সম্পদের উপর নির্ভরশীল নয়। পঞ্চমত, মানবাধিকার হল এমন অধিকার যা আদায়যোগ্য। ষষ্ঠত, মানবাধিকার সমগ্র বিশ্বের সর্বস্থানে, সর্বকালের সকল মানুষের প্রাপ্য। সপ্তমত, মানবাধিকার কেউ কাউকে দেয় না এবং এটি প্রাপ্তি কারো কৃপার উপর নির্ভরশীল নয়।

সংক্ষেপে মানবাধিকার হল জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত বা স্বীকৃত এমন কতগুলো অধিকার যা জাতি-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ নির্বিশেষে সমভাবে ভোগ করা যায়।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	মানুষ হিসেবে কোন কোন অধিকার প্রাপ্য লিখুন।

সার-সংক্ষেপ

মানবাধিকার বলতে সে সব আইনগত ও নৈতিক অধিকারকে বোঝায়, যা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এবং সমগ্র বিশ্বের মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্র আন্তর্জাতিকভাবেও দায়বদ্ধ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। মানবাধিকার গৃহীত হয়–

ক) ১০ ডিসেম্বর ১৯৪৮ খ) ১১ ডিসেম্বর ১৯৪৮

গ) ১৪ আগস্ট ১৯৪৯ ঘ) ১৫ আগস্ট ১৯৫০

২। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত–

i) নাগরিক অধিকার ii) মৌলিক অধিকার iii) মানবাধিকার

কোনটি সঠিক?

ক) i খ) ii

গ) iii ঘ) i, ii ও iii

৩। মানবাধিকারের বৈশিষ্ট্য হল, এটি এমন অধিকার যা–

i) বিশ্বের সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য

ii) কোন বিশেষ বা দলের জন্য নয়

iii) আন্তর্জাতিক মর্যাদার ভিত্তিতে অভিন্ন

কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৫.৫ জাতিসংঘের মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র (The Universal Declaration of Human Rights of United Nations)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- জাতিসংঘ বর্ণিত মানবাধিকারসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	সার্বজনীন, শাসনতন্ত্র, স্বীকৃতি, জাতিসংঘ।

জাতিসংঘের মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র

১৯৪৮জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ঘোষিত মানবাধিকারসমূহ নিম্নে বর্ণনা করা হল:

১। **ভ্রাতৃসুলভ আচরণ:** সকল মানুষই স্বাধীন অবস্থায় এবং সমমর্যাদা ও অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। তারা সকলেই বুদ্ধি ও বিবেকের অধিকারী। অতএব তাদের একে অন্যের প্রতি ভ্রাতৃসুলভ আচরণ করা উচিত।

২। **সার্বজনীন অধিকার:** জাতি, গোত্র, বর্ণ, লিঙ্গ, ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক বা অন্য মতবাদ, জাতীয় বা সামাজিক উৎপত্তি, সম্পত্তি, জন্ম বা অন্য মর্যাদা নির্বিশেষে সকলেই ঘোষণাপত্রে উল্লিখিত সকল অধিকার সমভাবে ভোগ করবে। কোন মানুষকে রাজনৈতিক, সীমানাগত বা আন্তর্জাতিক মর্যাদার ভিত্তিতে পার্থক্য করা যাবে না।

৩। **নিরাপত্তা লাভ:** প্রত্যেকেরই জীবনধারণ, স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অধিকার রয়েছে।

৪। **দাস প্রথা ও ব্যবস্থা নিষিদ্ধ:** কাউকে দাস হিসেবে কিংবা দাসত্বের বন্ধনে রাখা চলবে না। সকল প্রকার দাস-প্রথা ও দাস-ব্যবস্থা নিষিদ্ধ থাকবে।

৫। **শাস্তি সংক্রান্ত:** কাউকে নির্যাতন করা যাবে না, কারো প্রতি নিষ্ঠুর, অমানুষিক বা অবমাননাকর আচরণ করা যাবে না কিংবা কাউকে এ ধরনের বা শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করা চলবে না।

৬। **মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি:** আইনের কাছে প্রত্যেকেরই মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি লাভের অধিকার রয়েছে।

৭। **আইনের দৃষ্টিতে সমান:** আইনের কাছ সকলেই সমান এবং কোনো রকম বৈষম্য ছাড়া সকলেরই আইনের আশ্রয়ে সমানভাবে রক্ষা পাওয়ার অধিকার রয়েছে।

৮। **মৌলিক অধিকার বলবৎকরণ সংক্রান্ত:** যেসব কাজের ফলে শাসনতন্ত্র বা আইনকর্তৃক প্রদত্ত মৌলিক অধিকারগুলো লঙ্ঘন করা হয় তার জন্য উপযুক্ত বিচার লাভ বা আদালতের মারফত কার্যকর প্রতিকার লাভের অধিকার প্রত্যেকেরই আছে।

৯। **গ্রেফতার ও নির্বাসন সংক্রান্ত:** কাউকে খেয়াল-খুশিমতো গ্রেফতার বা আটক করা অথবা নির্বাসন দেয়া যাবে না।

১০। **সুবিচার লাভের অধিকার:** প্রত্যেকেরই তার নিজের বিরুদ্ধে আনা যে কোনো ফৌজদারি অভিযোগের সত্যতা প্রমাণের জন্য সমান অধিকার নিয়ে একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার-আদালতে ন্যায্যভাবে ও প্রকাশ্যে শুনানি লাভের অধিকার রয়েছে।

১১। **আত্মপক্ষ সমর্থন ও শাস্তি প্রদান সংক্রান্ত:** কেউ কোনো দণ্ডযোগ্য অপরাধে অভিযুক্ত হলে, তিনি এমন কোনো গণ-আদালতের আশ্রয় নিতে পারেন, যেখানে তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনের নিশ্চয়তা পাবেন। এ আদালত যতক্ষণ তাকে আইন অনুযায়ী দোষী সাব্যস্ত না করে ততক্ষণ পর্যন্ত তার নির্দোষ বলে বিবেচিত হওয়ার অধিকার রয়েছে। আবার দন্ডযোগ্য অপরাধ করার সময় আইন অনুযায়ী যতটুকু শাস্তি দেয়া যেত তার চেয়ে অধিক শাস্তি প্রয়োগ করা চলবে না।

১২। **গোপনীয়তা, সম্মান ও সুনাম সংক্রান্তঃ** কারো ব্যক্তিগত গোপনীয়তা, পরিবার, বসতবাড়ি বা চিঠিপত্রের ব্যাপারে খেয়াল-খুশিমতো হস্তক্ষেপ করা চলবে না। কারো সম্মান ও সুনামের উপরও ইচ্ছামতো আক্রমণ করা চলবে না।

১৩। **চলাফেরার অধিকারঃ**

ক) রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে চলাচল করা ও বসতি স্থাপন করার অধিকার প্রত্যেকেরই আছে।

খ) প্রত্যেকেরই নিজের দেশ বা যে কোনো দেশ ছেড়ে যাবার এবং স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করার অধিকার রয়েছে।

১৪। **আশ্রয় প্রার্থনা ও লাভের অধিকারঃ** নির্যাতন এড়ানোর জন্য প্রত্যেকেরই অপর দেশসমূহে আশ্রয় প্রার্থনা করার এবং আশ্রয়লাভ করার অধিকার রয়েছে।

১৫। **জাতীয় অধিকার সংক্রান্তঃ**

ক) প্রত্যেকেরই একটি জাতীয়তার অধিকার আছে।

খ) কাউকেই যথেচ্ছভাবে তার জাতীয়তা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। আবার কেউ তার জাতীয়তা পরিবর্তন করতে চাইলে তার সে অধিকার অস্বীকার করা চলবে না।

১৬। **পরিবার গঠন সংক্রান্তঃ** পূর্ণ-বয়স্ক নারী ও পুরুষের বিবাহ করার ও পরিবার গঠন করার অধিকার রয়েছে। বিবাহের ব্যাপারে বিবাহিত অবস্থায় এবং বিবাহ-বিচ্ছেদকালে নারী ও পুরুষের সম-অধিকার রয়েছে।

১৭। **সম্পত্তির অধিকারঃ** প্রত্যেকের সম্পত্তির মালিক হওয়ার অধিকার রয়েছে। কাউকেই তার সম্পত্তি থেকে খেয়াল-খুশিমতো বঞ্চিত করা চলবে না।

১৮। **চিন্তা, বিবেক ও ধর্মের স্বাধীনতাঃ** প্রত্যেকেরই চিন্তা, বিবেক ও ধর্ম সংক্রান্ত স্বাধীনতা রয়েছে।

১৯। **মতামত প্রকাশের অধিকারঃ** প্রত্যেকেরই মতামত পোষণ করা ও প্রকাশ করার অধিকার রয়েছে।

২০। **সম্মিলিত ও সংঘবদ্ধ সংক্রান্তঃ**

ক) প্রত্যেকেরই শান্তিপূর্ণভাবে সম্মিলিত হওয়ার অধিকার আছে।

খ) কাউকেই কোনো সংঘভূক্ত হতে বাধ্য করা যাবে না।

২১। **সরকার গঠন, চাকরি লাভ ও ভোটদান সংক্রান্তঃ**

ক) প্রত্যক্ষভাবে অথবা অবাধে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে নিজ দেশের সরকারে অংশগ্রহণের অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে।

খ) প্রত্যেকেরই নিজ দেশের সরকারি চাকরিতে সমান সুযোগ লাভের অধিকার রয়েছে।

২২। **সামাজিক নিরাপত্তার অধিকারঃ** সমাজের সদস্য হিসেবে প্রত্যেকেরই সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার আছে।

২৩। **কর্মের অধিকারঃ**

ক) প্রত্যেকেরই কাজ করার ও অবাধে চাকুরি নির্বাচনের অধিকার রয়েছে। কাজের জন্য ন্যায্য ও অনুকূল পারিশ্রমিক লাভ করার এবং বেকারত্ব থেকে রক্ষা পাওয়ার অধিকারও আছে প্রত্যেকের।

খ) প্রত্যেকেরই কোনো বৈষম্য ছাড়া সমান কাজের জন্য সমান বেতন পাওয়ার অধিকার আছে।

গ) প্রত্যেকেরই নিজ স্বার্থ রক্ষার জন্য শ্রমিক ইউনিয়ন গঠন ও এতে যোগদানের অধিকার রয়েছে।

২৪। **বিশ্রাম ও অবসর বিনোদন সংক্রান্তঃ** প্রত্যেকেরই বিশ্রাম ও অবসর বিনোদনের অধিকার আছে। কার্য-সময়ের যুক্তিসঙ্গত সীমা ও বেতনসহ নৈমিত্তিক ছুটি এ অধিকারের অন্তর্ভূক্ত।

২৫। **মৌলিক চাহিদা পূরণের অধিকারঃ**

ক) নিজের ও নিজ পরিবারের স্বাস্থ্য ও কল্যাণের জন্য উপযুক্ত জীবনযাত্রার মানের অধিকার প্রত্যেকেরই আছে। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় সামাজিক সেবামূলক কাজের সুবিধালাভের অধিকারও একই সঙ্গেই প্রত্যেকের

প্রাপ্য। বেকারত্ব, পীড়া, অক্ষমতা, বৈধব্য, বার্ধক্য অথবা অনিবার্য কারণে জীবন-যাপনে অপরাগতার ক্ষেত্রে নিরাপত্তালাভ এ অধিকার অন্তর্ভুক্ত।

খ) মাতৃত্বকালীন ও শৈশব অবস্থায় প্রত্যেকে বিশেষ যত্ন ও সহায়তা লাভের অধিকারী।

২৬। **শিক্ষার অধিকার:**

ক) প্রত্যেকেরই শিক্ষালাভের অধিকার রয়েছে। অন্তত:পক্ষে প্রাথমিক ও মৌলিক পর্যায়ের শিক্ষা হবে অবৈতনিক। প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হবে। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা যাতে সর্বসাধারণ লাভ করতে পারে সে ব্যবস্থা করতে হবে। উচ্চতর শিক্ষা মেধার ভিত্তিতে সকলের জন্য সমানভাবে উন্মুক্ত থাকবে।

খ) প্রত্যেকের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের উদ্দেশ্যে শিক্ষা পরিচালিত হবে। মানবিক অধিকার ও মৌলিক অধিকারগুলোর প্রতি যাতে শিক্ষার্থীদের শ্রদ্ধাবোধ দৃঢ় হয় সেদিকে জোর দেওয়াও শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য। শিক্ষাদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সমঝোতা ও সহিষ্ণুতায় আস্থাশীল করে তুলতে হবে। এ শিক্ষা সকল জাতি, বর্ণ ও ধর্মীয় গোষ্ঠীর বন্ধুত্ব উন্নয়নে এবং শান্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে জাতিসংঘের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করবে।

গ) সন্তানের জন্য শিক্ষার ধরণ নির্ধারণের অধিকার সকল পিতা-মাতার রয়েছে।

২৭। **সাংস্কৃতির অধিকার:**

ক) প্রত্যেকেরই গোষ্ঠীগত সাংস্কৃতিক জীবনে অবাধে অংশগ্রহণ করা ও শিল্পকলা চর্চা করার অধিকার রয়েছে। বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ও তার সুফলগুলোর অংশীদার হওয়ার অধিকারও রয়েছে।

খ) বিজ্ঞান, সাহিত্য অথবা শিল্পকলা-ভিত্তিক সৃজনশীল কাজ থেকে যে নৈতিক ও বৈষয়িক স্বার্থের উদ্ভব হতে পারে তা রক্ষা করার অধিকার রয়েছে প্রত্যেকের।

২৮। **সামাজিক ও আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা সংক্রান্ত:** প্রত্যেকেই এমন একটি সমাজিক ও আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার অধিকারী ও যেখানে মানবাধিকার ঘোষণাপত্রে উল্লেখিত সকল অধিকার ও স্বাধীনতা পূর্ণভাবে আদায় করা যেতে পারে।

২৯। **কর্তব্য পালন সংক্রান্ত:** গণতান্ত্রিক সমাজে নৈতিকতা, গণশৃঙ্খলা ও সর্বসাধারণের কল্যাণের দিকে লক্ষ রেখে এবং আইন মান্য করেই প্রত্যেকে তার অধিকার ও স্বাধীনতা প্রয়োগ করতে পারবে। কোনোভাবেই জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ও মূলনীতি লঙ্ঘন করা চলবে না।

৩০। **মানবাধিকারের ভুল ব্যাখ্যা সংক্রান্ত:** মানবাধিকার ঘোষণায় উল্লেখিত কোনো বিষয়ের ভুল ব্যাখ্যা দেয়া চলবে না। এ ঘোষণার অন্তর্ভূক্ত কোনো অধিকার বা স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করার উদ্দেশ্যে কোনো রাষ্ট্র, দল বা ব্যক্তি বিশেষের আত্মনিয়োগের অধিকার আছে– এ রকম ধারণা করার মতো কোনো ব্যাখ্যা দেয়া চলবে না।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	জাতিসংঘ বর্ণিত অধিকার আর বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণিত অধিকারের মাঝে কোন পার্থক্য থাকলে তা লিপিবদ্ধ করুন।

সার-সংক্ষেপ

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ১৯৪৮ সালে প্রদত্ত ঘোষণায় মানবাধিকারের অনেকগুলো অঙ্গীকার ও বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে ভ্রাতৃত্ববোধ, সার্বজনীন অধিকার, নিরাপত্তা লাভ, দাস প্রথা নিষিদ্ধকরণ, শাস্তি প্রদানে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি, মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি, আইনের দৃষ্টিতে সমতা ভোগ, মৌলিক অধিকার বলবৎকরণ, গ্রেপ্তার ও নির্বাসন সংক্রান্ত যথার্থতা, সুবিচারলাভের অধিকার, আত্মপক্ষ সমর্থন ও শাস্তি প্রদানে যথার্থতা, গোপনীয়তা, সম্মান ও সুনাম রক্ষার অধিকার। এছাড়াও মানবাধিকার সনদে শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অধিকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। মানবাধিকার–

i) সার্বজনীন অধিকার
ii) আইনের দৃষ্টিতে সমানাধিকার
iii) শিক্ষা ও সংস্কৃতির অধিকার

কোনটি সঠিক?

ক) i খ) ii
গ) iii ঘ) i, ii ও iii

২। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত অধিকার–

ক) নাগরিক অধিকার খ) মৌলিক অধিকার
গ) মানবাধিকার

৩। আবদুল করিম বাংলাদেশের নাগরিক। এদেশে তার জীবনের নিরাপত্তা না থাকার কথা বলে, কানাডায় রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। করিম সেখানে কোন অধিকার ভোগ করছেন?

ক) নাগরিক খ) মৌলিক
গ) রাজনৈতিক ঘ) মানবাধিকার

পাঠ-৫.৬ মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকার (Fundamental Rights and Human Rights)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকারের পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	মৌলিক, মানবিক, জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক।

মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকারের পার্থক্য

মৌলিক অধিকার হল নাগরিকের ব্যক্তিত্ব ও জীবন বিকাশের জন্য এমন কতগুলো সুযোগ-সুবিধা যা সংবিধানে উল্লেখ থাকে এবং সরকার কর্তৃক অলঙ্ঘনীয়। পক্ষান্তরে, মানবাধিকার হল আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ব্যক্তির অধিকার। আপাতদৃষ্টিতে মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকার একই মনে হলেও এদের মধ্যে কতগুলো বিষয়ে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

১। **মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকারের উৎস:** মৌলিক অধিকারের উৎস সংবিধান বা শাসনতন্ত্র। সাধারণত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সংবিধানে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সন্নিবেশিত থাকে। অন্যদিকে সমগ্র বিশ্বের মানুষের জন্য জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক মানবাধিকার ঘোষিত ও স্বীকৃত।

২। **পরিধি সংক্রান্ত:** মৌলিক অধিকারের চেয়ে মানবাধিকারের পরিধি ব্যাপক ও বিস্তৃত। মৌলিক অধিকারের সীমানা রাষ্ট্রীয় পরিমণ্ডলে আবদ্ধ; কিন্তু মানবাধিকার বৈশ্বিক।

৩। **রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক অধিকার:** মৌলিক অধিকার খর্ব হলে নাগরিকগণ আদালতের আশ্রয় লাভ করতে পারেন। অন্যদিকে মানবাধিকার আন্তর্জাতিক অধিকার। মানবাধিকার রক্ষার্থে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা কাজ করে থাকে।

৪। **বিকাশ সংক্রান্ত:** রাষ্ট্রীয় চেতনাবোধ থেকে মৌলিক অধিকার বিকাশলাভ করে। অর্থাৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র নাগরিকের পূর্ণাঙ্গভাবে বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় আইনগত ও নৈতিক অধিকার সংবিধানে উল্লেখ করে। অন্যদিকে, কোন গুণ বা বৈশিষ্ট্য নিরপেক্ষভাবে একজন ব্যক্তির প্রাপ্য অধিকারের চেতনাবোধ থেকে মানবাধিকারের বিকাশ হয়েছে। বস্তুত: একজন মানুষ হিসেবে ব্যক্তির যে অধিকার ভোগ করা প্রয়োজন তাই মানবাধিকার হিসেবে গৃহীত হয়েছে।

৫। **বাস্তবায়ন সংক্রান্ত:** মৌলিক অধিকার চাইলে সহজে কার্যকর করা যায়। মৌলিক অধিকার বাস্তবায়ন বিষয়টি রাষ্ট্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সরকার চাইলে সহজে মৌলিক অধিকার বলবৎ করা সম্ভব। অন্যদিকে, মানবাধিকার বাস্তবায়ন (যেমন, অন্য দেশে আশ্রয়লাভ) সবসময় কেবল একটি দেশের উপর নির্ভর করে না।

৬। **মৌলিক অধিকার মানবাধিকারের অংশ:** সকল মৌলিক অধিকার শেষ বিচারে মানবাধিকারের মধ্যেই পড়ে। কিন্তু সকল মানবাধিকার মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভূক্ত নয়।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি**) /শিক্ষার্থীর কাজ**	মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকারের মূল পার্থক্য কি?

সার-সংক্ষেপ

মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকার উভয়ের লক্ষ্যই হচ্ছে ব্যক্তির অধিকার সংরক্ষণ। তবে প্রকারগতভাবে এক রকমের হলেও বাস্তবায়ন ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। তবে সব মৌলিক অধিকারই মানবাধিকার।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। মৌলিক ও মানবাধিকারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য–

i) উভয়ই সুস্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট ও বোধগম্য
ii) উভয়ের উৎস এক ও অভিন্ন
iii) সব মৌলিক অধিকারই মানবাধিকার

কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii
খ) i ও iii
গ) ii ও iii
ঘ) i, ii ও iii

২। কোনটির পরিধি অপেক্ষাকৃত ব্যাপক?

ক) মানবাধিকার
খ) মৌলিক অধিকার
গ) সামাজিক অধিকার
ঘ) রাজনৈতিক অধিকার

পাঠ-৫.৭ নাগরিক কর্তব্য (Duties of Citizen)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- নাগরিকের কর্তব্যের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- কর্তব্যের শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	দায়িত্ব, আইনগত, সামাজিক, সর্বাঙ্গীন, স্বীকৃত।

কর্তব্যের ধারণা

রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবে প্রত্যেক নাগরিক তার জীবনকে পরিপূর্ণভাবে বিকাশের জন্য কতগুলো সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও নৈতিক অধিকার ভোগ করে। এসব অধিকার ভোগের বিনিময়ে নাগরিকদের আবার রাষ্ট্রের প্রতি কিছু কর্তব্য পালন করতে হয়। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক হ্যারল্ড লাস্কি বলেন, "কর্তব্য বলতে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বাঙ্গীন কল্যাণের জন্য কোন কিছু করা বা না করার অধিকারকে বোঝায়।" বস্তুত: কর্তব্য পালন ব্যতীত অধিকার ভোগের প্রত্যাশা করা যায় না। যেমন, আইন মেনে চলা নাগরিকের কর্তব্য। এ কর্তব্য পালনের মাধ্যমে একজন নাগরিক তার নিজের স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার অধিকার প্রত্যাশা করতে পারে।

কর্তব্যের শ্রেণিবিভাগ: বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্নভাবে কর্তব্যের শ্রেণিবিভাগ করেছেন। যেমন- (১) নৈতিক কর্তব্য, (২) আইনগত কর্তব্য, (৩) সামাজিক কর্তব্য, (৪) রাজনৈতিক কর্তব্য, (৫) অর্থনৈতিক কর্তব্য

১। **নৈতিক কর্তব্য:** যে কর্তব্য মানুষের নীতিবোধ থেকে সৃষ্টি হয়, তাকে নৈতিক কর্তব্য বলে। যেমন– গরীবদের সাহায্য করা, মা-বাবা ও গুরুজনদের শ্রদ্ধা করা, যেকোন দুর্যোগ মোকাবেলায় সাহায্য করা প্রভৃতি নাগরিকের নৈতিক কর্তব্য। এসব কর্তব্য নাগরিকের বিবেকবোধ বা ন্যায়বোধ থেকে সৃষ্টি হয়। এসব কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কোন রূপ বাধ্যবাধকতা থাকে না। তবে এসব কর্তব্য পালনে যারা বিরত থাকে, তাদেরকে সমাজ প্রশংসার চোখে দেখে না।

২। **আইনগত কর্তব্য:** যেসব কর্তব্য রাষ্ট্রের আইন কর্তৃক নির্দেশিত, সেগুলোকে আইনগত কর্তব্য বলে। অন্যভাবে বলা যায় আইনের দ্বারা নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করাকে আইনগত কর্তব্য বলে। আইনগত কর্তব্য লঙ্ঘনের জন্য শাস্তি পেতে হয়। আইনগত কর্তব্যকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা যায়, যা নিম্নে বর্ণনা করা হল–

৩। **সামাজিক কর্তব্য:** সমাজে সুখে শান্তিতে বসবাস করার জন্য মানুষ যে দায়িত্ব পালন করে তাকে সামাজিক কর্তব্য বলে। যেমন–

(i) সামাজিক রীতি-নীতি ও আচরণ মেনে চলা;

(ii) সামাজিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন;

(iii) সমাজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানগুলোর উন্নয়নে কাজ করা।

৪। **রাজনৈতিক কর্তব্য:** রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংরক্ষণে নাগরিকগণ যেসব কর্তব্য পালন করে, সেগুলোকে রাজনৈতিক কর্তব্য বলে। যেমন, রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন, আইন মান্য করা, ভোটদান, যোগ্য প্রার্থীকে নির্বাচিত করা, সংবিধান, জাতীয় সঙ্গীত ও জাতীয় পতাকার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, জাতীয় দিবস যথাযথভাবে পালন নাগরিকের রাজনৈতিক কর্তব্য।

৫। **অর্থনৈতিক কর্তব্য:** রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক বিষয়াদির সাথে নাগরিকদের যেসব কর্তব্য জড়িত থাকে সেগুলো নিম্নরূপ:

(i) নিয়মিত কর প্রদান: রাষ্ট্র পরিচালনা ও নাগরিকের অধিকার সংরক্ষণে প্রচুর অর্থ প্রয়োজন হয়। একটি সময় রাষ্ট্র তার নাগরিকের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহের মাধ্যমেই মূলত ব্যয় নির্বাহ করে। কর সীমার মধ্যে থাকা সকল নাগরিক নিয়মিত কর প্রদান করলে রাষ্ট্রের পক্ষে সঠিকভাবে সকল অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হয়।

(ii) রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠানগুলোকে যথাযথভাবে সহায়তা দেয়া।

(iii) রাষ্ট্রীয় সম্পদ যেমন, রেলওয়ে, সড়কপথ, যানবাহন, কল-কারখানা, অফিস-আদালত ও স্কুল-কলেজ ভবন, সরকারি ও বেসরকারি ক্ষতি সাধন থেকে বিরত থাকা এবং এসবের রক্ষণাবেক্ষণে সর্বাত্মক সাহায্য করাও নাগরিকের অর্থনৈতিক কর্তব্যের অন্তর্গত।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	আদর্শ নাগরিক হিসেবে কি কি কর্তব্য পালন করেন তার একটি তালিকা তৈরি করুন।

সার-সংক্ষেপ

একজন ব্যক্তি রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে কেবলমাত্র কতগুলো অধিকারই ভোগ করে না বরং এই অধিকারগুলো সর্বজনের জন্য নিশ্চিত করার জন্য প্রত্যেক নাগরিককে রাষ্ট্রের প্রতি কতগুলো কর্তব্যও পালন করতে হয়। কর্তব্য কয়েক ধরনের হতে পারে। যথা– (১) নৈতিক (২) আইনগত। (৩) সামাজিক কর্তব্য (৪) রাজনৈতিক কর্তব্য (৫) অর্থনৈতিক কর্তব্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। "কর্তব্য বলতে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বাঙ্গীন কল্যানের জন্য কোন কিছু করা বা না করার অধিকার বোঝায়।" –কে বলেছেন?

ক) অধ্যাপক হ্যারল্ড লাস্কি
খ) অধ্যাপক আর. জি. গেটেল
গ) অধ্যাপক এ. ভি. ডাইসি
ঘ) অধ্যাপক জেমস গার্নার

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন ২ ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

স্বপন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীপ্রাপ্ত যুবক। সরকারি চাকরির কথা চিন্তা না করে সে আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজে নিজেকে নিয়োজিত করল। ব্যাংক ঋণ নিয়ে সে নিজ গ্রামে একটি হাঁস-মুরগির খামার স্থাপন করে। কিছু দিনের মধ্যে সে খামার ব্যবসায় উন্নতি লাভ করল। সচেতন নাগরিক হিসেবে স্বপন নিয়মিত আয়কর প্রদান করে।

২। স্বপন কোন ধরনের কর্তব্য পালন করে?

ক) সামাজিক
খ) অর্থনৈতিক
গ) নৈতিক
ঘ) রাজনৈতিক

৩। স্বপনের এ ধরনের কর্তব্য পালনের ফলে–

i) রাষ্ট্রের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হবে
ii) রাষ্ট্রের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে
iii) সামাজিক পরিবর্তন ঘটবে

কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii
খ) i ও iii
গ) ii ও iii
ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৫.৮ অধিকার ও কর্তব্যের সম্পর্ক (Relations between Rights and Duties)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- অধিকার ও কর্তব্যের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	অধিকার, কর্তব্য, পরিপূরক, নিবিড়, নির্ভরশীল।

অধিকার ও কর্তব্যের সম্পর্ক

নাগরিক যেমন অধিকার ভোগ করে, তেমনি কর্তব্যও পালন করে। অধিকার ও কর্তব্যের সম্পর্ক নিম্নরূপ:

১। **অভিন্ন উৎস:** অধিকার ও কর্তব্যের উৎস রাষ্ট্র। অধিকার ও কর্তব্যের সংরক্ষক রাষ্ট্র। রাষ্ট্র থেকে আমরা অধিকার পাই এবং বিনিময়ে রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য পালন করি। কাজেই রাষ্ট্রের মধ্যেই অধিকার ও কর্তব্য নিহিত।

২। **একই বস্তুর দুটো দিক:** অধিকার ও কর্তব্য হচ্ছে একই বস্তুর দুটো দিকের মত। অধিকার ভোগের সাথে সাথে নাগরিককে কর্তব্য পালন করতে হয়। কারণ অধিকার ভোগের মাধ্যমে নাগরিকগণ রাষ্ট্রের প্রতি যে দায়িত্ব পালন করে, তাকে কর্তব্য বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ : শিক্ষালাভ করা নাগরিকের অধিকার, আবার সন্তানদের শিক্ষিত করা কর্তব্য।

৩। **একজনের অধিকার অন্যের কর্তব্য:** অধিকার সংরক্ষণের জন্য কর্তব্য পালন আবশ্যক। উদাহরণস্বরূপ, রাস্তায় স্বাধীনভাবে চলাফেরা করা একজন নাগরিকের অধিকার; এক্ষেত্রে অন্য সবার কর্তব্য হচ্ছে স্বাধীনভাবে চলতে দেয়া। অধ্যাপক হব্‌হাউস (Hobhouse) তাই বলেছেন, ধাক্কা না খেয়ে পথ চলার অধিকার যদি আমার থাকে, তাহলে তোমার কর্তব্য হল আমাকে প্রয়োজন মতো পথ ছেড়ে দেয়া।

৪। **অধিকারের পরিধি কর্তব্যবোধ দ্বারা সীমাবদ্ধ:** অধিকার অবাধ ও সীমাহীন হলে স্বেচ্ছাচারিতার জন্ম হবে। ফলে সবল অধিকার ভোগ করবে, আর দুর্বল বঞ্চিত হবে। কাজেই একজনের অধিকার, অন্যান্য সকলের কর্তব্যবোধ দ্বারা সীমাবদ্ধ।

৫। **নৈতিক অধিকার ও কর্তব্যের সম্পর্ক:** নৈতিক অধিকার ভোগ করলে, নৈতিক কর্তব্য পালন করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, পিতা-মাতা সন্তানদের লালন-পালন ও শিক্ষা দেয়। আবার পিতা-মাতা যখন বৃদ্ধ হন সন্তানরা তাঁদের সেবা-যত্ন করে। এক্ষেত্রে নৈতিক অধিকার হচ্ছে পিতা-মাতার অধিকার ভোগ, আবার নৈতিক কর্তব্য হচ্ছে সন্তানদের লালন-পালন ও শিক্ষা দেয়া। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, নৈতিক অধিকার নৈতিক কর্তব্যের উপর নির্ভরশীল।

৬। **কর্তব্য পালনের জন্য অধিকার প্রয়োজন:** রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকগণ কতগুলো কর্তব্য পালন করে। যেমন, রাষ্ট্রের আইন মান্য করা, কর প্রদান করা, রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা ইত্যাদি। এসব কর্তব্য পালনের জন্য নাগরিকের ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রয়োজন। দরকার আইনের চোখে সমানাধিকার, কর্মের অধিকার ইত্যাদি। এভাবে দেখলে, অধিকার ভোগের মাধ্যমেই নাগরিকদের কর্তব্য সম্পর্কে জ্ঞান জাগ্রত হয়।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, অধিকার ও কর্তব্য পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। এদের একটি বাদ দিয়ে অপরটি চিন্তা করা সম্ভব নয়। তাই বলা যায়, অধিকার ভোগের সাথে কর্তব্য পালন বিষয়টি অবধারিতভাবে যুক্ত।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	অধিকার ভোগ করার জন্য কর্তব্য পালন জরুরি কেন?

সার-সংক্ষেপ

অধিকার ও কর্তব্যের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। অধিকার ও কর্তব্যের উৎস অভিন্ন। অধিকার ও কর্তব্য একই বস্তুর দুটো দিকের মত। একজনের অধিকার অনেক সময় অন্যজনের কর্তব্য পালনের মধ্য দিয়ে সংরক্ষিত হয়। রাষ্ট্রের কাছ থেকে অধিকার ভোগের পাশাপাশি রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের কর্তব্য পালন একান্ত আবশ্যক।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। অধিকার ও কর্তব্যের সম্পর্ক–

i) একজনের অধিকার অন্যের কর্তব্য
ii) অধিকারের পরিধি কর্তব্যবোধ দ্বারা সীমাবদ্ধ
iii) পরস্পর একে অপরের পরিপূরক

কোনটি সঠিক?

ক) i খ) ii
গ) iii ঘ) i, ii ও iii

২। "ধাক্কা না খেয়ে চলার অধিকার যদি আমার থাকে, তাহলে তোমার কর্তব্য হল আমাকে প্রয়োজন মতো পথ ছেড়ে দেয়া।" –কে বলেছেন?

ক) অধ্যাপক গার্নার খ) অধ্যাপক হব্‌হাউস
গ) অধ্যাপক গেটেল ঘ) অধ্যাপক ডাইসি

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। আমিনুল ইসলাম একজন সরকারি কর্মকর্তা। তিনি অত্যন্ত দক্ষতা ও আন্তরিকতার সাথে চাকরি করেন। তাছাড়াও তিনি সর্বদা সরকারি নিয়ম-কানুনের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। পারিবারিক জীবনেও তিনি সফল। তাঁর এক ছেলে ও এক মেয়ে। তাদেরকেও তিনি উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করেছেন।

ক. অধিকার কি?
খ. মানবাধিকার বলতে কি বোঝায়?
গ. উদ্দীপকে আপনার পাঠ্য পুস্তকের কোন বিষয় প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করুন।
ঘ. উক্ত বিষয়ের সাথে নাগরিক অধিকারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। এর স্বপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করুন।

২। আব্দুর রহমান বাংলাদেশের নাগরিক। তিনি এক সময় একটি রাজনৈতিক দলের একজন নেতা ছিলেন। সে সময় রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে তিনি নিজের জীবনের নিরাপত্তাহীনতার কথা বলে কানাডাতে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করেন। এক পর্যায়ে তাঁর আবেদন মঞ্জুর হয়। আব্দুর রহমান এখন কানাডাতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার ভোগ করেন।

ক. মৌলিক অধিকার কি?
খ. কর্তব্য বলতে কি বোঝায়?
গ. উদ্দীপকে কোন্ ধরনের অধিকার বর্ণিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করুন।
ঘ. উক্ত অধিকারের সাথে মৌলিক অধিকারের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.১ ঃ ১। খ ২। গ ৩। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.২ ঃ ১। খ ২। খ ৩। ঘ ৪। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৩ ঃ ১। গ ২। গ ৩। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৪ ঃ ১। ক ২। গ ৩। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৫ ঃ ১। ঘ ২। গ ৩। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৬ ঃ ১। খ ২। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৭ ঃ ১। ক ২। খ ৩। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৮ ঃ ১। ঘ ২। খ

ইউনিট
৬

রাষ্ট্রঃ উৎপত্তি ও কার্যাবলি

(Origin and Functions of State)

সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হল রাষ্ট্র। সামাজিক ও রাজনৈতিক শৃঙ্খলা স্থাপন এবং সকল নাগরিকের স্বার্থ রক্ষার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন কাঙ্খিত। প্রাচীনকালে- ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগর নিয়ে নগর রাষ্ট্র গঠিত হত। এসব নগর রাষ্ট্রের শাসনকার্যে নাগরিকগণ সরাসরিভাবে অংশগ্রহণ করত। আধুনিক রাষ্ট্র বিশাল আকৃতির এবং এর জনসংখ্যা অনেক বেশি। যার ফলে আধুনিককালে জনগণ নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় কাজে পরোক্ষভাবে অংশ নেয়। আধুনিক রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে নাগরিক জীবনের চরম অভিব্যক্তির প্রকাশ ঘটে। রাষ্ট্রের সাথে নাগরিকের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। এ প্রসঙ্গে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক এরিস্টটল বলেন, "রাষ্ট্রের বাইরে যে বসবাস করে, সে হয় পশু না হয় দেবতা।" এ ইউনিটে রাষ্ট্রের ধারণা, রাষ্ট্র ও সরকারের সম্পর্কের ধরণ, রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ, আধুনিক রাষ্ট্রের কার্যাবলি, কল্যাণ রাষ্ট্রের ধারণা আলোচনা করা হয়েছে।

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৬.১ ঃ রাষ্ট্রের ধারণা	পাঠ-৬.৭ ঃ আধুনিক রাষ্ট্রের কার্যাবলি
পাঠ-৬.২ ঃ রাষ্ট্র ও সরকার	পাঠ-৬.৮ ঃ পুঁজিবাদ
পাঠ-৬.৩ ঃ রাষ্ট্র ও অন্যান্য সংঘ	পাঠ-৬.৯ ঃ সমাজতন্ত্র
পাঠ-৬.৪ ঃ রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত মতবাদ	পাঠ-৬.১০ ঃ সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের পার্থক্য
পাঠ-৬.৫ ঃ বল প্রয়োগ মতবাদ ও বিবর্তনমূলক মতবাদ	পাঠ-৬.১১ ঃ মিশ্র অর্থনীতি
পাঠ-৬.৬ ঃ সামাজিক চুক্তি মতবাদ	পাঠ-৬.১২ ঃ কল্যাণ রাষ্ট্র: ধারণা ও কার্যাবলি

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ**

পাঠ-৬.১ রাষ্ট্রের ধারণা (Concept of State)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- রাষ্ট্রের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	জনসমষ্টি, ভূ-খন্ড, সরকার, সার্বভৌমত্ব, উপাদান।

রাষ্ট্রে ধারণা

প্রাচীনকালে গ্রীক দার্শনিকগণ 'রাষ্ট্র' অর্থে পোলিস (Polis) কথাটি ব্যবহার করতেন। রোমান দার্শনিকগণ 'রাষ্ট্র' বোঝাতে 'সিভিটাস' (Civitas) কথাটি ব্যবহার করতেন। প্রাচীন গ্রীক পন্ডিত থেকে শুরু করে আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের

মধ্যে রাষ্ট্রের ধারণা বা সংজ্ঞা নিয়ে যথেষ্ট মত পার্থক্য রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসন বলেন, "রাষ্ট্র হচ্ছে আইনের প্রয়োজনে নির্দিষ্ট ভূ-খন্ডে সংগঠিত একটি জনসমাজ।" অধ্যাপক জেমস গার্নার রাষ্ট্রের একটি সুন্দর ও গ্রহনযোগ্য সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। তিনি বলেন, "সুনির্দিষ্ট ভূখন্ডে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী, সুসংগঠিত সরকারের প্রতি স্বভাবজাতভাবে আনুগত্যশীল, বহি:শক্তির নিয়ন্ত্রনমুক্ত স্বাধীন জনসমষ্টিকে রাষ্ট্র বলে।"

রাষ্ট্র সম্পর্কে বিভিন্ন মনীষীর ধারণা বিশ্লেষণ করে আমরা বলতে পারি, যে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট ভূ-খন্ড, সুসংগঠিত সরকার, জনসমষ্টি ও সার্বভৌম ক্ষমতা রয়েছে তাকে রাষ্ট্র বলে।

রাষ্ট্রের উপাদান

রাষ্ট্রের চারটি উপাদান থাকে। যথা– (১) জনসমষ্টি, (২) ভূ-খন্ড, (৩) সরকার ও (৪) সার্বভৌমত্ব।

১। **জনসমষ্টি:** রাষ্ট্র গঠনের প্রথম উপাদান জনসমষ্টি। জনসমষ্টি ব্যতীত রাষ্ট্র হতে পারে না। তবে একটি রাষ্ট্র গঠনের জন্য জনসংখ্যা কত হতে হবে তার কোন ধরা বাঁধা নিয়ম নেই। জনসংখ্যা কম হতে পারে; আবার বেশিও হতে পারে। যেমন, বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রায় ১৬ কোটি, চীনের জনসংখ্যা প্রায় ১৩৫ কোটি, আবার ব্রুনাই প্রায় ৪ লক্ষ। তবে অ্যারিস্টটল এর মতে রাষ্ট্রে জনসংখ্যা সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উত্তম।

২। **ভূখন্ড:** রাষ্ট্র গঠনের দ্বিতীয় উপাদান হল ভূখন্ড। জনসমষ্টিকে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ভূখন্ড আবশ্যক। ভূখন্ড বলতে রাষ্ট্রের ভূমি, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, সামুদ্রিক জলসীমা বোঝায়। রাষ্ট্র গঠনের জন্য কি পরিমান ভূখন্ড প্রয়োজন, তার নির্দিষ্টতা নেই। অর্থাৎ রাষ্ট্রের আয়তন ছোটও হতে পারে, আবার বড়ও হতে পারে। যেমন বাংলাদেশের আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিঃ মিঃ, অন্যদিকে ভারতের আয়তন ৩,২৮৭,২৬৩ বর্গ কিঃমিঃ।

৩। **সরকার:** রাষ্ট্রের তৃতীয় উপাদান সরকার। সরকারের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালিত হয়। রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকার তিন ধরনের কাজ করে। যথা– আইন সংক্রান্ত, শাসন সংক্রান্ত ও বিচার সংক্রান্ত। এ তিন ধরনের কাজের জন্য সরকারের তিনটি বিভাগ রয়েছে। যথা– আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ। অর্থাৎ সরকার গঠিত হয় এ তিন বিভাগ নিয়ে। তবে বিশ্বের প্রায় সব সরকার ৩টি বিভাগ নিয়ে গঠিত হলেও সরকারের রূপ ও প্রকৃতি এক নয়। যেমন– বাংলাদেশে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা, আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান।

৪। **সার্বভৌমত্ব:** রাষ্ট্র গঠনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল সার্বভৌমত্ব। এটি রাষ্ট্রের চরম, পরম ও সর্বোচ্চ ক্ষমতা। সার্বভৌমত্ব ব্যতীত কোন দেশ রাষ্ট্র বলে পরিগণিত হতে পারে না। যেমন– ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরের পূর্বে বাংলাদেশের অন্যান্য উপাদান থাকা সত্ত্বেও সার্বভৌম ক্ষমতা না থাকায় বাংলাদেশ রাষ্ট্র বলে পরিগণিত হতে পারে নি। সার্বভৌমত্বের দু'টো দিক রয়েছে। যথা– (ক) অভ্যন্তরীণ সার্বভৌমত্ব, যার দ্বারা রাষ্ট্র তার সীমানার মধ্যে যেকোন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উপর অবাধ ও সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী। এ ক্ষমতার মাধ্যমে রাষ্ট্র অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখে। (খ) বাহ্যিক সার্বভৌমত্ব - এ ক্ষমতা বলে রাষ্ট্র বহি:শত্রুর আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি**) /শিক্ষার্থীর কাজ**	রাষ্ট্র বলতে কি বোঝায়? এটি কি দেখা যায়? দেখা না গেলে এর অস্তিত্ব কিভাবে অনুভূত হয়?

সার-সংক্ষেপ

যে সামাজিক সংগঠনের জনসমষ্টি, ভূখন্ড, সরকার ও সার্বভৌমত্ব রয়েছে তাকে রাষ্ট্র বলে। রাষ্ট্রের উপাদান ৪টি। যথা– (১) জনসমষ্টি, (২) ভূখন্ড, (৩) সরকার ও (৪) সার্বভৌমত্ব। এ চারটি উপাদানের মধ্যে সার্বভৌমত্ব অন্যতম। সার্বভৌমত্বকে রাষ্ট্রের প্রাণ বলা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। "রাষ্ট্র হচ্ছে আইনের প্রয়োজনে নির্দিষ্ট ভূ-খন্ডে সংগঠিত একটি জনসম্পদ"-কে বলেছেন।

ক) সক্রেটিস খ) অ্যারিস্টটল

গ) উড্রো উইলসন ঘ) অধ্যাপক গার্নার

২। রাষ্ট্র গঠনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ন উপাদান–

ক) জনসমষ্টি খ) ভূখন্ড

গ) সরকার ঘ) সার্বভৌমত্ব

৩। ঢাকা রাষ্ট্র নয়, কারণ–

ক) ক্ষুদ্র আয়তন খ) অত্যধিক জনসংখ্যা

গ) সার্বভৌমত্ব নেই ঘ) রাজধানী

পাঠ-৬.২ রাষ্ট্র ও সরকার (State and Government)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- রাষ্ট্র ও সরকারের সম্পর্কের ধরণ বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	স্থায়িত্ব, অধিকারের উৎস, ক্ষমতা।

রাষ্ট্র ও সরকারের সম্পর্কের ধরণ

রাষ্ট্র ও সরকারের সম্পর্কের ধরণগুলো নিম্নরূপ:

১। **গঠন সংক্রান্ত:** জনসমষ্টি, ভূ-খন্ড, সরকার ও সার্বভৌমত্ব নিয়ে রাষ্ট্র গঠিত হয়। অন্যদিকে, সরকার হল রাষ্ট্রের চারটি উপাদানের মধ্যে একটি, যার মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালিত হয়।

২। **জনসংখ্যা:** রাষ্ট্রের জনসংখ্যা সরকারের সদস্য সংখ্যার তুলনায় অনেক বেশি। রাষ্ট্র গঠিত হয় সকল জনসমষ্টি নিয়ে। অপরদিকে, সরকার গঠিত হয় জনসংখ্যার এক ক্ষুদ্র অংশ নিয়ে, যারা আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের সাথে জড়িত।

৩। **জীবদেহ ও মস্তিষ্ক:** রাষ্ট্র ও সরকারের সম্পর্ক অনেকটা জীবদেহ ও মস্তিষ্কের অনুরূপ। মস্তিষ্ক যেমন সমগ্র জীবদেহকে নিয়ন্ত্রণ করে, ঠিক তেমনি সরকার রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করে।

৪। **স্থায়িত্ব:** রাষ্ট্র স্থায়ী, আর সরকার অস্থায়ী। যেকোন সময় সরকারের পরিবর্তন হতে পারে। কিন্তু, এর ফলে রাষ্ট্রের স্থায়িত্বের কোন পরিবর্তন হয় না। যেমন: ১৯৯১ সালে বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা পরিবর্তিত হয়ে, সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা পুনরায় চালু হয়। এতে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের কোন পরিবর্তন ঘটেনি।

৫। **ভৌগোলিক সীমানা:** রাষ্ট্র গঠনের জন্য ভৌগোলিক সীমানা প্রয়োজন। কিন্তু সরকারের সাথে ভৌগোলিক সীমানার সম্পর্ক নেই।

৬। **বৈশিষ্ট্য:** বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট এক ও অভিন্ন। সকল রাষ্ট্র ৪টি উপাদান নিয়ে গঠিত। অন্যদিকে সরকারের রূপ, প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য রাষ্ট্রভেদে ভিন্ন হতে পারে। যেমন– বাংলাদেশে সংসদীয় সরকার, আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা চালু আছে।

৭। **বিমূর্ত ও বাস্তব ধারণা:** রাষ্ট্র বিমুর্ত। কারণ রাষ্ট্রকে দেখা বা ছোঁয়া যায় না, শুধু অনুধাবন করা যায়। অন্যদিকে সরকার বাস্তব ধারণা।

৮। **আইন ও অধিকারের উৎস:** রাষ্ট্র সকল প্রকার আইন ও অধিকারের উৎস। আর সরকার হল সকল আইন ও অধিকারের রক্ষক। তাই নাগরিক অধিকারে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ ঘটলে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনা যায় না। সরকার নাগরিক অধিকার খর্ব করলে সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা যায়।

৯। **ক্ষমতার দিক থেকে:** রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। এ ক্ষমতাকে রাষ্ট্রের প্রাণ বলা হয়। সরকারের সার্বভৌম ক্ষমতা নেই, সরকার রাষ্ট্রের হয়ে সার্বভৌম ক্ষমতা চর্চা করতে পারে।

পরিশেষে বলা যায় যে, রাষ্ট্র সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন হলেও এটি স্বয়ংক্রিয় নয়। বরং সরকারের মাধ্যমেই রাষ্ট্রযন্ত্রটি পরিচালিত হয়।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	রাষ্ট্র ও সরকারের সম্পর্কের মধ্যে যেগুলো আপনার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় সেগুলো উল্লেখ করুন।

সার-সংক্ষেপ

রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান উপাদান হচ্ছে সরকার। বস্তুত: সরকার ছাড়া কোন রাষ্ট্রই পরিচালিত হতে পারবে না। রাষ্ট্র বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে অনড় প্রকৃতির হলেও, সময় ও স্থানভেদে সরকার ব্যবস্থার রূপ পরিবর্তিত হতে পারে। সরকারের মাধ্যমেই রাষ্ট্র পরিচালিত হয়। অনেকে সেজন্য সরকারকে রাষ্ট্রের মস্তিষ্ক হিসেবে মনে করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। রাষ্ট্র ও সরকার সম্পর্কে প্রযোজ্য হল–

i) সরকার রাষ্ট্রের উপাদান
ii) রাষ্ট্রের সকল জনসমষ্টি হল সরকার
iii) রাষ্ট্র জীবদেহ আর সরকার মস্তিষ্ক

কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) ii ও iii
গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

২। রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য–

i) রাষ্ট্র স্থায়ী প্রতিষ্ঠান
ii) বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য অভিন্ন
iii) রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী

কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৬.৩ রাষ্ট্র ও অন্যান্য সংঘ (State and Other Organisations)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- রাষ্ট্র ও অন্যান্য সংঘের পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	সংঘ, স্থায়িত্ব, বাধ্যতামূলক, উদ্দেশ্য, অস্তিত্ব।

রাষ্ট্র ও অন্যান্য সংঘের পার্থক্য

পাঠ-১ এ রাষ্ট্রের ধারণা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে যখন কোন জনসমষ্টি ঐক্যবদ্ধ বা সংঘবদ্ধ হয়, তখন তাকে সংঘ বলে। যেমন– শ্রমিক সংঘ, ছাত্র সংঘ, কর্মজীবী সংঘ, এসব সংঘ বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধ হয়েছে। যেমন– শ্রমিকরা নিজের স্বার্থ রক্ষার জন্য শ্রমিক সংঘ, ছাত্রদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ছাত্র সংগঠন, আবার কর্মজীবীরা নিজ-নিজ অধিকার প্রাপ্তির জন্য কর্মজীবী সংঘ গড়ে তোলে। রাষ্ট্র ও অন্যান্য সংঘের ধারণা বিশ্লেষণ করলে এদের মধ্যকার নিম্নলিখিত পার্থক্য পাওয়া যায়–

১। **উৎপত্তিগত:** আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে, ঐতিহাসিক বিবর্তনের মাধ্যমে রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ রাষ্ট্র ক্রমবিবর্তনের ফলস্বরূপ। রাষ্ট্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে রক্তের বন্ধন, ধর্মের বন্ধন, যুদ্ধ-বিগ্রহ, অর্থনৈতিক কার্যকলাপ ও রাজনৈতিক চেতনার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অপরদিকে, সংঘ সৃষ্টি হয় মানুষের স্বেচ্ছামূলক পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে। যেমন: ফুটবল সংঘ প্রতিষ্ঠা লাভের ক্ষেত্রে সদস্যদের প্রচেষ্টা ও পরিকল্পনাই যথেষ্ঠ। এক্ষেত্রে ঐতিহাসিক বিবর্তন কোন কাজ করেনি, যা রাষ্ট্রের সৃষ্টির ক্ষেত্রে আবশ্যক।

২। **সদস্য লাভ:** একটি রাষ্ট্রে যতজন লোক স্থায়ীভাবে বসবাস করে, তারা রাষ্ট্রের সদস্য। কিন্তু রাষ্ট্রের সকল সদস্য সব ধরনের সংঘের সদস্য হয় না। যেমন– শ্রমিক সংঘের সদস্য তারাই, যারা শ্রমিক হিসেবে কাজ করছে; এরা আবার রাষ্ট্রের সদস্য। কিন্তু তাই বলে, রাষ্ট্রের সকল নাগরিক শ্রমিক সংঘের সদস্য নয়।

৩। **বাধ্যবাধকতা:** যারা রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাস, অধিকার ভোগ এবং কর্তব্য পালন করে, তারা রাষ্ট্রের সদস্য। রাষ্ট্রের সদস্য হওয়া বাধ্যতামূলক। কিন্তু সংঘের সদস্য হওয়া ইচ্ছাধীন, বাধ্যতামূলক নয়। একজন ব্যক্তি আবার একাধিক সংঘের সদস্য হতে পারেন। যেমন– ফুটবল সংঘ, কর্মজীবী সংঘ, সাহিত্য সংঘ প্রভৃতি। কিন্তু একজন ব্যক্তি সাধারণত একটি রাষ্ট্রের নাগরিক হয়ে থাকেন।

৪। **ভৌগোলিক সীমারেখা:** রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট একটি ভূ-খন্ড থাকে, যেখানে জনসমষ্টি স্থায়ীভাবে বসবাস করে এবং রাষ্ট্রের যাবতীয় কার্য সম্পাদিত হয়। অন্যদিকে, সংঘের সাথে ভৌগোলিক সীমারেখার বাধ্যতাধকতা নেই। সংঘ স্থানীয়, জাতীয় কিংবা আন্তর্জাতিক হতে পারে। সংঘের কার্যসীমাও সেভাবে নিরূপিত হয়।

৫। **উদ্দেশ্য:** রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ব্যাপক ও বহুমুখী। আধুনিক রাষ্ট্রগুলো নিজের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার্থে এবং মানুষের সার্বিক কল্যাণের জন্য বহুবিধ কাজ করে। যেমন– প্রশাসন পরিচালনা, জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা, পররাষ্ট্র সংক্রান্ত, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রভৃতি। কিন্তু সংঘের উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট। যেমন– খেলাধূলা, জনকল্যাণ, ধর্মপ্রচার প্রভৃতি উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সংঘ সৃষ্টি হয়েছে।

৬। **সার্বভৌম ক্ষমতা:** রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা রয়েছে। সার্বভৌমত্ব ছাড়া রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, জনগণ, সরকার, ভূ-খন্ড থাকা সত্ত্বেও সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি না থাকায় ফিলিস্তিন রাষ্ট্র হিসেবে এখনো আইনগতভাবে স্বীকৃতি পাচ্ছে না। সংঘের ক্ষেত্রে সার্বভৌমত্বের অনুরূপ কোন উপাদানের অস্তিত্ব নেই।

৭। **স্থায়িত্ব:** রাষ্ট্র একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান। স্থায়িত্ব রাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অন্যদিকে, সংঘ হচ্ছে অস্থায়ী প্রতিষ্ঠান। উদ্দেশ্য সাধনের পর সংঘের বিলুপ্তি হতে পারে।

৮। **নিয়ন্ত্রণ:** রাষ্ট্র প্রয়োজনবোধ করলে সংঘকে নিয়ন্ত্রণ বা বিলুপ্ত করতে পারে। তবে অন্যান্য সংঘ রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করতে বা বিলুপ্ত করতে পারে না। যদিও এসব সংঘ নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনে সরকারকে প্রভাবিত করতে পারে।

৯। **আইন প্রণয়ন:** আধুনিক যুগে আইনের প্রধান উৎস আইনসভা। অর্থাৎ আইন সভার মাধ্যমে রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন, সংশোধন ও পুরাতন আইন বাতিল করতে পারে। কিন্তু অন্যান্য সংঘ আইন প্রণয়ন করতে পারে না, বরং রাষ্ট্রের প্রচলিত আইন মেনে চলে।

১০। **অস্তিত্ব:** একটি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বিভিন্ন সংঘের অস্তিত্ব বা উপস্থিতি থাকতে পারে; কিন্তু একটি রাষ্ট্রসীমায় একটির বেশি রাষ্ট্র থাকতে পারে না।

বস্তুত, রাষ্ট্র ও অন্যান্য সংঘের মধ্যে এ রকমের বহুবিধ গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	রাষ্ট্রে বিদ্যমান কয়েকটি সামাজিক ও রাজনৈতিক সংঘের তালিকা তৈরি করুন।

সার-সংক্ষেপ

যেকোন রাষ্ট্রে সংঘ গড়ে ওঠে। যেমন– শ্রমিক সংঘ, ছাত্র সংঘ, কর্মজীবী সংঘ প্রভৃতি। এসব সংঘ বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে গড়ে ওঠে। কতগুলো বিষয়ে এসব সংঘসমূহ রাষ্ট্রের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কার্যাবলি থেকে ভিন্ন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কোনটি বিশেষ উদ্দেশ্যে গঠিত হয়?

ক) সংঘ খ) সমাজ
গ) সরকার ঘ) রাষ্ট্র

২। কোনটির সদস্য হওয়া বাধ্যতামূলক?

ক) রাষ্ট্র খ) সমাজ
গ) সংঘ ঘ) সরকার

৩। নিচের কোনটি গ্রহণযোগ্য–

i) রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ব্যাপক ও বহুমুখী
ii) সংঘের ভৌগোলিক সীমারেখার বাধ্যবাধকতা নেই
iii) রাষ্ট্র কর্তৃক সংঘ নিয়ন্ত্রিত হয়

কোনটি সঠিক?

ক) i খ) ii
গ) i ও ii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৬.৪ রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত মতবাদ (Theories Related to Origin of State)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে বিধাতার সৃষ্টিমূলক মতবাদ বর্ণনা করতে পারবেন।
- রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে পিতৃতান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	বিধাতা, শাসক, রাজা, স্বৈরাচার, আদেশ-নির্দেশ, পিতৃতান্ত্রিক, মাতৃতান্ত্রিক।

বিধাতার সৃষ্টিমূলক মতবাদ

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে যেসব মতবাদ প্রচলিত রয়েছে, তন্মধ্যে বিধাতার সৃষ্টিমূলক মতবাদ একটি। এ মতবাদটি প্রাচীন হলেও মধ্যযুগে এর প্রচার লক্ষ্য করা গেছে।

মূল বক্তব্য: বিধাতা স্বয়ং রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছেন। রাষ্ট্রের কর্ম সম্পাদনের জন্য তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে একজন 'শাসক' প্রেরন করেছেন। শাসক বিধাতার ইচ্ছা অনুযায়ী শাসন করবেন এবং তাঁর কাজের জন্য বিধাতার নিকট দায়ী থাকবেন। তাঁর আদেশ-নির্দেশ জনগণ মেনে চলবে। শাসকের আদেশ অমান্য করলে জনগণের পাপ হবে। কারণ এ মতবাদে বলা হয়, শাসক বিধাতার নির্দেশে সকল কার্য সম্পাদন করেন। সুতরাং শাসকের নির্দেশ অমান্য করা বিধাতার নির্দেশ অমান্য করার নামান্তর। এ মতবাদটি বিশ্লেষণ করলে প্রতীয়মান হয় যে,

১. বিধাতা স্বয়ং রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছেন।

২. বিধাতা তার মনোনীত ব্যক্তিকে শাসক রূপে প্রেরণ করছেন।

৩. শাসক তার কাজের জন্য বিধাতার নিকট দায়ী, জনগণের নিকট নয়।

৪. জনগণ শাসকের নির্দেশ মেনে চলবে। রাজার নির্দেশ অমান্য করার অর্থ বিধাতার নির্দেশ অমান্য করা।

সমালোচনা: রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে বিধাতার সৃষ্টিমূলক মতবাদটি বিভিন্ন চিন্তাবিদ বিভিন্নভাবে সমালোচনা করেছেন। কয়েকটি সমালোচনা নিচে উল্লেখ করা হল–

১। **অচল:** বর্তমান যুগ গণতন্ত্রের যুগ। গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় শাসক তার কাজের জন্য জনগণের নিকট দায়ী থাকেন। গণতন্ত্রে জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস। কিন্তু এ মতবাদে বলা হয়েছে, শাসক তার কাজের জন্য বিধাতার নিকট দায়ী এবং শাসক সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। রাষ্ট্র সম্পর্কে এ ধরনের মত আজকের যুগে গ্রহণযোগ্য হচ্ছে না।

২। **অযৌক্তিক:** রাষ্ট্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। মানুষ তার প্রয়োজনে 'রাষ্ট্র' সৃষ্টি করেছেন। এ মতবাদে বলা হয়, বিধাতা স্বয়ং রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছেন। এর কোন যৌক্তিক ভিত্তি নেই বিধায়, এ মতবাদকে আধুনিক যুগে অচল একটি মতবাদ হিসেবে গণ্য করা হয়।

৩। **স্বৈরতন্ত্রের সমর্থক:** এ মতবাদের প্রেক্ষিত বলা হয়, বিধাতার নির্দেশে শাসক যা ইচ্ছা তাই করতে পারবেন এবং তিনি সকল ক্ষমতার উৎস। তিনি বিধাতার দোহাই দিয়ে জনগণের অধিকার খর্ব করতে পারবেন। কাজেই বলা যায়, এ মতবাদ স্বৈরতন্ত্রের সমর্থক। এ মতবাদে বিশ্বাসী হয়ে ফ্রান্সের সম্রাট চতুর্দশ লুই বলেছিলেন, "আমিই রাষ্ট্র।"

পিতৃতান্ত্রিক মতবাদ

স্যার হেনরী মেইন পিতৃতান্ত্রিক মতবাদের অন্যতম প্রবক্তা। তিনি বলেন, প্রাচীনকালে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। পিতৃতান্ত্রিক পরিবার সম্প্রসারিত হয়ে রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে।

পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের সন্তানরা পিতার বংশ পরিচয়ে পরিচিত হত এবং পরিবারে পিতার কর্তৃত্ব থাকত। এ ধরনের পরিবার সম্প্রসারিত হয়ে গোষ্ঠী, গোষ্ঠী থেকে উপজাতি এবং উপজাতি থেকে জাতি রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়। স্যার হেনরী মেইন বলেন, 'পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষের প্রতি সদস্যদের আনুগত্যই পরিবারের বন্ধন সূত্র। কতগুলো পরিবার নিয়ে বংশ গঠিত হয়, কতগুলো বংশ থেকে উপজাতি গঠিত হয় এবং কতগুলো উপজাতির সমন্বয়ে রাষ্ট্র গঠিত হয়। এ মতবাদের মূল বক্তব্য হল– পিতৃতান্ত্রিক পরিবার সম্প্রসারণের ফলে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়।

মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ

এ মতবাদের মূল বক্তব্য হল মাতৃতান্ত্রিক পরিবার সম্প্রসারিত হয়ে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে। এ ধরনের পরিবারে সন্তানরা মায়ের পরিচয়ে পরিচিত হত এবং পরিবারে মায়ের একক কর্তৃত্ব থাকত। সমাজ বিকাশের একেবারে গোড়ার দিকে মানুষের জীবন ও জীবিকার প্রাথমিক পর্যায়ে নারী-পুরুষের সম্পর্ক ব্যক্তির ভিত্তিতে সীমাবদ্ধ ছিল না। তখন যৌথ বিবাহ প্রচলিত ছিল। যৌথ বিবাহের ফলে সন্তান এবং বংশ ধারার জন্য বর্তমানের ন্যায় পিতাকে নির্দিষ্ট করা সম্ভব হত না। মাতাই ছিল সন্তানের পরিচয় সূত্র। মাতৃপক্ষ থেকেই সন্তানের বংশধারা নির্দিষ্ট হত। এভাবে মাতৃতান্ত্রিক পরিবার সম্প্রসারিত হয়ে বহুপরিবার সৃষ্টি এবং একটি উপজাতিতে পরিণত হয়। এরপর কালক্রমে একাধিক উপজাতির সমন্বয়ে রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়।

সমালোচনা: পিতৃতান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক মতবাদে রক্তের সম্পর্কই মূলত প্রাধান্য পেয়েছে। অন্য কোন বাস্তব কারণ নির্ণয়ে সক্ষম নয় বিধায়, রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত আধুনিক যুগের আলোচনায় এই দুই মতবাদ খুব একটা গুরুত্ব পায় না।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	রাষ্ট্র উৎপত্তি সংক্রান্ত প্রাচীনতম কয়েকটি মতবাদের তালিকা তৈরি করুন।

সার-সংক্ষেপ

বিধাতার সৃষ্টিমূলক মতবাদ মতবাদের মূল বক্তব্য হল বিধাতা স্বয়ং রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছেন। রাষ্ট্রের কার্য পরিচালনার জন্য তিনি একজন শাসক প্রেরণ করছেন। এই শাসক বিধাতার ইচ্ছানুযায়ী শাসন কার্য পরিচালনা করবেন এবং তাঁর কাজের জন্য বিধাতার নিকট দায়ী থাকবেন। পিতৃতান্ত্রিক মতবাদ মতবাদের মূল বক্তব্য হল পিতৃতান্ত্রিক পরিবার সম্প্রসারিত হয়ে গোষ্ঠী, গোষ্ঠী থেকে উপজাতি এবং উপজাতি থেকে জাতি রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। পক্ষান্তরে, মাতৃতান্ত্রিক পরিবার মতবাদ অনুযায়ী মাতৃতান্ত্রিক পরিবার সম্প্রসারিত হয়ে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বিধাতার সৃষ্টিমূলক মতবাদের মূল বক্তব্য–

i) বিধাতা স্বয়ং রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছেন ii) শাসক বিধাতার নিকট দায়ী iii) শাসকের নির্দেশ অমান্য করলে পাপ হবে

কোনটি সঠিক?

ক) i খ) ii

গ) iii ঘ) i, ii ও iii

২। পরিবার সম্প্রসারিত হয়ে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে– এটি কোন মতবাদের মূল কথা?

ক) পিতৃতান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক খ) সামাজিক চুক্তি

গ) বল প্রয়োগ ঘ) বিবর্তনমূলক

পাঠ-৬.৫ বল প্রয়োগ মতবাদ ও বিবর্তনমূলক মতবাদ (Force Theory and Evolutionary Theory)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- বল প্রয়োগ মতবাদের মূল বক্তব্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- বল প্রয়োগ মতবাদের দোষ-ত্রুটি বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- বল প্রয়োগ মতবাদের প্রভাব উল্লেখ করতে পারবেন।
- বিবর্তনমূলক মতবাদের মূল বক্তব্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- বিবর্তনমূলক মতবাদের বিভিন্ন উপাদানের কার্যকারিতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	বল, জয়-পরাজয়, সবল-দুর্বল, বিবর্তন, কালক্রমে, রক্তের সম্পর্ক।

বল প্রয়োগ মতবাদের মূল বক্তব্য

এ মতবাদের মূল কথা হচ্ছে, বল বা শক্তির মাধ্যমেই রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে। এ মতবাদে ধরে নেয়া হয়েছে যে, আদিমকালে মানুষ কলহপ্রিয় ও ক্ষমতালিপ্সু ছিল। সবলরা বল প্রয়োগ করে দুর্বলদের অধীন করে আনুগত্য স্বীকার করাতে বাধ্য করত। এ প্রবণতার কারণে এক গোত্র অন্য গোত্রের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হত এবং পরাজিত গোত্র বিজয়ী গোত্রের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গড়ে উপজাতি। উপজাতিদের মধ্যে সংঘর্ষ বা যুদ্ধের ফলে পরাজিত উপজাতি বিজয়ী উপজাতির অন্তর্ভূক্ত হয়ে গড়ে উঠত এক বৃহৎ উপজাতি। একটি অঞ্চলে একজন উপজাতি প্রধান প্রভূত্ব প্রতিষ্ঠা করত। এভাবে এক একটি অঞ্চল নিয়ে রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। ডেভিড হিউমের মত চিন্তাবিদরা বলপ্রয়োগ মতবাদের সমর্থক। হিউমের মতে, দখলদারিত্ব বা বলপ্রয়োগ ছাড়া অতীতে বা বর্তমানে কখনোই কোন রাষ্ট্র গঠিত হয় নি।

সমালোচনা: বলপ্রয়োগ মতবাদকে বিভিন্নভাবে সমালোচনা করা হয়।

১। **অসম্পূর্ণ মতবাদ:** আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা মনে করেন, কেবলমাত্র বলের মাধ্যমে রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়নি। রাষ্ট্র সৃষ্টির অনেকগুলো উপাদানের মধ্যে বল একটি উপাদান মাত্র। এ মতবাদে অন্যান্য উপাদান তথা আদিম সমাজে রক্তের সম্পর্ক, ভাষা, জাতীয়তা, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চেতনার মত উপাদানগুলোকে অস্বীকার করা হয়েছে।

২। **মানবতা বিরোধী:** এ মতবাদে মানব জাতির খারাপ দিকগুলো তুলে ধরা হয়েছে। যেমন– ঝগড়া-বিবাদ, ক্ষমতালিপ্সা, অত্যাচার ইত্যাদি। পক্ষান্তরে, এ মতবাদে মানব জাতির উদারতা ও মহত্ব সম্পর্কে কিছুই বলা হয় নি। এজন্য এ মতবাদকে মানবতা বিরোধী মতবাদ হিসেবে গণ্য করা হয়।

৩। **স্বৈরতন্ত্রের সমর্থক:** এ মতবাদে বলকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। যার কারণে শাসক শক্তির সাহায্যে যে কোন সিদ্ধান্ত জনগণের উপর চাপিয়ে দিতে পারে, যা গণতন্ত্রের পরিপন্থী। তাই বলা যায়, বল প্রয়োগ মতবাদ স্বৈরতন্ত্রের সমর্থক।

৪। **শান্তি বিরোধী:** এ মতবাদ যুদ্ধকে সমর্থন করে। মানুষ যুদ্ধ চায় না, শান্তি চায়। এভাবে দেখলে এ মতবাদ শান্তি বিরোধী।

বল প্রয়োগ মতবাদের গুরুত্ব: বল প্রয়োগ মতবাদের বহুবিধ সমালোচনা থাকলেও, এই মতবাদের সর্মথনে ইতিহাস ও বর্তমানে নানা নজির পাওয়া যায়।

উদাহরণস্বরূপ, আধুনিক রাষ্ট্রগুলো অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও বহি:শত্রুর হাত থেকে রক্ষার জন্য বল বা শক্তি ব্যবহার করে। এজন্য আধুনিক রাষ্ট্রগুলো সামরিক বাহিনী গঠন করে। শক্তির দ্বারা রাষ্ট্র সৃষ্টির নজির ইতিহাসে অহরহ। টমাস হবস ও নিকোলা ম্যাকিয়াভেলীর মত তাত্ত্বিকেরা রাষ্ট্রের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য শক্তিশালী শাসকের কথা বলেছেন।

তবে বলপ্রয়োগ মতবাদের নজির থাকলেও একথা বলা যায় না যে, কেবলমাত্র বল প্রয়োগের মাধ্যমেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে। কারণ কেবলমাত্র বল বা শক্তি জনগণকে খুব বেশি দিন সংগঠিত রাখতে পারে না। মূলত, রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব নির্ভর করে জনগণের ইচ্ছার উপর। সর্বশেষে তাই বলা যায় রাষ্ট্রের ভিত্তি সম্মতি, বল নয়।

বিবর্তনমূলক মতবাদ

এ মতবাদে মূল বক্তব্য হল– রাষ্ট্র হঠাৎ করে সৃষ্টি হয় নি। ইতিহাসের ক্রমবিবর্তনের ধারায় বিভিন্ন শক্তি ও উপাদানের সাহায্যে ধীরে-ধীরে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে। অন্যভাবে বলা যায়– ব্যক্তি থেকে পরিবার, পরিবার থেকে গোষ্ঠী, গোষ্ঠী থেকে উপজাতি, উপজাতি থেকে জাতি এবং জাতি থেকে রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়েছে। অধ্যাপক জেমস গার্নার এ মতবাদের সমর্থনে বলেন, "রাষ্ট্র বিধাতা কর্তৃক সৃষ্টি হয়নি, কোন দৈহিক শক্তির দ্বারা সৃষ্টি হয় নি, অথবা পারস্পরিক চুক্তির ফলেও রাষ্ট্র সৃষ্টি হয় নি, কিংবা পরিবার সম্প্রসারিত হয়ে রাষ্ট্র সৃষ্টি হয় নি বরং ঐতিহাসিক ক্রমবিবর্তনের ফলে রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে।"

বিবর্তনমূলক মতবাদ অনুসারে যে উপাদানগুলো আদিতে রাষ্ট্র সৃষ্টিতে কাজ করেছিলো, তার কয়েকটি আলোচনা করা হলঃ

১। **রক্তের বন্ধন:** পরিবারের ভিত্তি হল রক্তের সম্পর্ক। পরিবার সম্প্রসারিত হয়ে গোষ্ঠী সৃষ্টি হয় এবং রক্তের সম্পর্ক গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি করে। রক্তের সম্পর্কের কারণে গোষ্ঠীর প্রধানের কর্তৃত্বের প্রতি আনুগত্য সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে গোষ্ঠী থেকে সম্প্রদায়, সম্প্রদায় থেকে উপজাতি এবং উপজাতি থেকে জাতির সৃষ্টি হয়। এক পর্যায়ে এসে এক একটি জাতি একটি রাষ্ট্রে পরিণত হয়। এক্ষেত্রে রক্তের বন্ধন সক্রিয় ভূমিকা রেখে ছিল। অধ্যাপক ম্যাকাইভার বলেন, "রক্তের সম্পর্ক সমাজ সৃষ্টি করল এবং সমাজ অবশেষে রাষ্ট্র সৃষ্টি করল।"

২। **ধর্মের বন্ধন:** রাষ্ট্রের বিবর্তনের ধারায় ধর্মের বন্ধন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে রক্তের সম্পর্ক শিথিল হতে থাকে, সে মুহূর্তে ধর্ম রক্তের বন্ধনের শূণ্যতা পূরণ করে। ধর্ম চর্চার প্রেক্ষিতে গড়ে ওঠে ধর্মীয় সমাজ ও ধর্মীয় নেতা। পরবর্তীতে ধর্মীয় সমাজ সুদৃঢ় হয়ে সৃষ্টি হয় রাষ্ট্র।

৩। **যুদ্ধ-বিগ্রহ:** যুদ্ধ-বিগ্রহ রাষ্ট্র সৃষ্টির এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। আদিম সমাজে যুদ্ধ-বিগ্রহ, কলহ-দ্বন্দ্ব লেগেই থাকত। যে ব্যক্তি যত শক্তিশালী ছিল, তার তত ক্ষমতা ও আধিপত্য থাকত। তাই গোত্রের সাথে গোত্রের, উপজাতির সাথে উপজাতির যুদ্ধ বা সংঘর্ষ হত। বিজিতরা বিজয়ীদের অন্তর্ভূক্ত হত। এভাবে বিভিন্ন জাতির সৃষ্টি হয়। অতপর জাতিসমূহের স্থলে এক একটি রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে।

৪। **অর্থনৈতিক কার্যকলাপ:** এক সময় মানুষ পশু শিকার ও ফলমূল সংগ্রহ করে জীবন-যাপন করত। সভ্যতার একটি পর্যায়ে মানুষ কৃষিকাজ শুরু করলে, স্থায়ীভাবে বসবাসের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। সমাজ পরিবর্তনের ধারাবাহিকতাতে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব ও সমাজে বহু শ্রেণির সৃষ্টি হয়। এর প্রেক্ষিতে মানুষ আইন, শাসক ও বিচারকের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে। এসবের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র ও সরকারের ভিত গড়ে ওঠে।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি আলোচনায় বিবর্তনমূলক মতবাদের গ্রহণযোগ্যতা অনেকখানি। বস্তুত; এ মতবাদের মধ্যে অন্যান্য সকল মতবাদের কিছু মাত্রায় প্রতিফলন ঘটেছে। যেমন, রক্তের বন্ধন আলোচনাতে পিতৃতান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক মতবাদের সন্ধান পাওয়া যায়, ধর্মের বন্ধনে বিধাতার সৃষ্টিমূলক মতবাদের আভাস মিলে। যুদ্ধ-বিগ্রহ বিষয়ক আলোচনাতে বলপ্রয়োগ মতবাদের ইঙ্গিত রয়েছে। এছাড়াও অর্থনৈতিক কার্যকলাপ ও রাজনৈতিক চেতনা সংক্রান্ত বক্তব্যে বিবর্তনমূলক মতবাদের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	বল প্রয়োগ মতবাদে বিশ্বাসী এমন কয়েকজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও রাষ্ট্রনায়কের নাম লিখুন।

সার-সংক্ষেপ

বল প্রয়োগ মতবাদের মূল বক্তব্য হল বল বা শক্তির মাধ্যমেই রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে। অন্যদিকে বিবর্তনমূলক মতবাদের মূল বক্তব্য হল রাষ্ট্র হঠাৎ করে সৃষ্টি হয় নি। ইতিহাসের ক্রমবিবর্তনের ধারায় বিভিন্ন শক্তি ও উপাদানের সাহায্যে ধীরে ধীরে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বল প্রয়োগ মতবাদের মূল বক্তব্য হল–

i) বল বা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে
ii) শক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্র টিকে আছে
iii) সবল দুর্বলকে অত্যাচার করত

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) ii ও iii
গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

২। "রাষ্ট্র বিধাতা কর্তৃক সৃষ্টি হয় নি" –কে বলেছেন?

ক) জেমস গার্নার খ) জাঁ পল সাঁত্রে
গ) কার্ল মার্কস ঘ) ফ্রেডরিক এঙ্গেলস

৩। বল প্রয়োগ মতবাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য–

i) মানবজাতির খারাপ দিকগুলো তুলে ধরা হয়েছে
ii) এ মতবাদ স্বৈরতন্ত্রের সমর্থক
iii) আধুনিককালে এ মতবাদের প্রভাব লক্ষণীয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৪। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে ব্যাপক গ্রহণযোগ্য মতবাদ–

ক) বিবর্তন মূলক মতবাদ খ) বিধাতার সৃষ্টিমূলক
গ) সামাজিক চুক্তি ঘ) বলপ্রয়োগ মতবাদ

পাঠ-৬.৬ সামাজিক চুক্তি মতবাদ (Social Contract Theory)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- সামাজিক চুক্তি মতবাদের মূল বক্তব্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- হবসের সামাজিক চুক্তি মতবাদ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- লকের সামাজিক চুক্তি মতবাদ বর্ণনা করতে পারবেন।
- রুশোর সামাজিক চুক্তি মতবাদ বলতে পারবেন।
- সামাজিক চুক্তি মতবাদের সমালোচনা, গুরুত্ব ও প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	প্রকৃতির রাজ্য, চুক্তি, প্রাকৃতিক আইন, সাধারণ ইচ্ছা, সকলের ইচ্ছা।

সামাজিক চুক্তি মতবাদ

রাষ্ট্রের উৎপত্তি বিষয়ক আলোচনাতে, সামাজিক চুক্তি মতবাদটি সম্ভবত সর্বাধিক আলোচিত । এ মতবাদের মূল বক্তব্য হল, রাষ্ট্র নামক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানটি জনগনের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে। এ মতবাদে বলা হয়, রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্বে "প্রকৃতির রাজ্যে" প্রকৃতির আইন অনুযায়ী মানুষ জীবন-যাপন করত। কেউ প্রকৃতির রাজ্যের নিয়ম ভঙ্গ করলে তাকে শাস্তি দেয়ার কোন কর্তৃপক্ষ ছিল না। এ অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য মানুষ পরস্পর স্বেচ্ছায় চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে রাষ্ট্র সৃষ্টি করে। সামাজিক চুক্তির বিষয়টি টমাস হবস, জন লক ও জাঁ জ্যাক রুশো ভিন্ন ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

টমাস হবস (Thomas Hobbes) : হবস সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরেজ দার্শনিক। ইংল্যান্ডের সপ্তদশ শতকের গৃহযুদ্ধের পটভূমিতে 'লেভিয়াথান' নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে তিনি রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কিত সামাজিক চুক্তি মতবাদ ব্যাখ্যা করে।

হবসের মতে, রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্বে মানুষ প্রকৃতির রাজ্যে বাস করত। কিন্তু প্রকৃতির রাজ্যে কোন আইন, সরকার ও বিচার ছিল না। যার কারণে প্রকৃতির রাজ্যের মানুষের জীবন ছিল ভয়াবহ ও বিশৃঙ্খলাপূর্ন। সে সময়ে মানুষ স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক, অসহায় ও কলহপ্রিয় ছিল। সবল দুর্বলকে অত্যচার করত। এ অবস্থা থেকে মুক্তির লক্ষে মানুষ নিজেদের মধ্যে চুক্তি করে রাষ্ট্রের সৃষ্টি করে। চুক্তির ফলে সৃষ্ট রাষ্ট্রে সকল ক্ষমতা সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের হাতে সমর্পণ করা হয়। হবসের মতবাদ অনুসারে, সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের জনগণের নিকট দায়বদ্ধ থাকার প্রয়োজন নেই।

জন লক (John Locke): লক ছিলেন একজন ইংরেজ দার্শনিক এবং নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের সমর্থক। তিনি 'টু ট্রিটিস অন সিভিল গভর্নমেন্ট' নামক গ্রন্থে সামাজিক চুক্তি মতবাদ ব্যাখ্যা করেন।

লকের মতে, রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্বে প্রকৃতির রাজ্য খুব সুন্দর ছিল । সেখানে সাম্য ও স্বাধীনতা ছিল। মানুষ সুখে-শান্তিতে বসবাস করত। প্রকৃতির রাজ্যের মানুষ ছিল যুক্তিবাদী, সৎ ও শান্তি প্রিয়। কিন্তু প্রকৃতির রাজ্যে সমস্যা ছিল তিনটি। যথা–
(১) প্রকৃতির আইনের কোন সুস্পষ্ট সংজ্ঞা ছিল না,
(২) প্রকৃতির আইন ব্যাখ্যা করার কোন কর্তৃপক্ষ ছিল না,
(৩) প্রকৃতির আইন ভঙ্গকারীকে শাস্তি দেয়া যেত না। এসব সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে জনগণ পরস্পরের সাথে চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে রাষ্ট্রের সৃষ্টি করে। এ চুক্তির শর্ত হল শাসক জনগণের জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তির রক্ষক হবে। লকের মতে, সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা একচ্ছত্র নয়। বরং সার্বভৌমের ক্ষমতা হচ্ছে, জনগণের সম্মতিভিত্তিক। অর্থাৎ জনগণ সম্মতি প্রত্যাহার করলে, শাসক তার শাসনের এখতিয়ার হারাবে।

জাঁ জ্যাক রুশো (Jean Jacques Rousseau): রুশো ফরাসি দার্শনিক। তিনি 'দি সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট' নামক গ্রন্থে রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে আলোচনায় সামাজিক চুক্তি মতবাদ ব্যাখ্যা করেন। রুশোর মতে, রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্বে প্রকৃতির রাজ্য ছিল অত্যন্ত সুন্দর, মনোরম, স্বাধীনতাপূর্ণ ও শান্তিময়। প্রকৃতির রাজ্যের মানুষ ছিল সৎ, বন্ধুত্বপরায়ণ, সুন্দর, সহজ, সরল ও সহানুভূতিশীল। ফলে প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ সুখ-শান্তিতে বসবাস করতে থাকে। কালক্রমে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং মানুষের মধ্যে সম্পত্তির অর্জনের চেতনা জাগ্রত হয়। সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও ভোগের ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলার সূত্রপাত হয়। মানুষ এ অবস্থা থেকে মুক্তির লক্ষ্যে নিজেদের মধ্যে চুক্তি করে রাষ্ট্রের সৃষ্টি করে এবং তাদের সকল ক্ষমতা সর্বজনের কল্যাণের লক্ষ্যে সাধারণ ইচ্ছার উপর অর্পণ করে। চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্র সৃষ্টির ফলে 'সাধারণ ইচ্ছা' সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হয়।

সমালোচনা: বিশ্লেষকরা নানা সময়ে নানা দিক থেকে সামাজিক চুক্তি মতবাদের সমালোচনা করেছেন। নিম্নে সেসব সমালোচনার সার-সংক্ষেপ বর্ণনা করা হল–

১। **অনৈতিহাসিক:** সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্র স্থাপনের নজীর মানুষের লিখিত ইতিহাসে দেখা যায় না। এজন্য অনেকে এই মতবাদকে অনৈতিহাসিক মনে করেন।

২। **অযৌক্তিক:** চুক্তি হল স্বেচ্ছাধীন বিষয়, আর রাষ্ট্র হল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, যার ভিত্তি হল আইন। আইনের ধারণার পূর্বে রাষ্ট্র সৃষ্টি হতে পারে না। সামাজিক চুক্তি মতবাদে আইনের ধারণা অস্পষ্ট। এভাবে দেখলে সামাজিক চুক্তি মতবাদ অযৌক্তিক।

৩। **অবৈজ্ঞানিক:** সাধারণত চুক্তি হয় দুই পক্ষের মধ্যে; কিন্তু সামাজিক চুক্তি মতবাদে দেখা যায় জনগণ পরস্পর মিলিত হয়ে চুক্তি সম্পাদন করে এটা বিজ্ঞান সম্মত নয়।

৪। **অবিশ্বাস্য মতবাদ:** রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্বে মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার প্রসার ঘটার তেমন প্রমাণ নেই। রাষ্ট্রপূর্ব সমাজের মানুষের পক্ষে রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করা অসম্ভব। এ অবস্থায় মানুষ চুক্তি করে রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছে– একথা বিশ্বাস করা যায় না।

৫। **বিপদজনক:** এ মতবাদকে অনেকে বিপদজনক মনে করেন। কারণ, জনগণ যদি মনে করে চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়েছে এবং চুক্তির মাধ্যমে শাসক ক্ষমতা পেয়েছে, তাহলে জনগণ সামান্য কারণে আন্দোলন করে বা চুক্তি ভঙ্গ করে শাসককে ক্ষমতাচ্যুত করার যৌক্তিকতা পেয়ে যাবে। এর ফলে রাষ্ট্রীয় জীবনে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হতে পারে।

৬। **ভ্রান্ত:** লক ও রুশোর মতে প্রকৃতির রাজ্যে সাম্য ও স্বাধীনতা ছিল কিন্তু রাষ্ট্রীয় আইন ছিল না। রাষ্ট্রীয় আইন হল সাম্য ও স্বাধীনতার ভিত্তি। রাষ্ট্রীয় আইনের মতো সুসংবদ্ধ ভিত্তি ছাড়া সাম্য ও স্বাধীনতা থাকতে পারে না। এভাবে দেখলে প্রকৃতির রাজ্যেও সাম্য ও স্বাধীনতা থাকার কথা নয়। তাই এ মতবাদকে অনেকে ভ্রান্ত মতবাদ বলে আখ্যায়িত করেন।

সামাজিক চুক্তি মতবাদের গুরুত্ব ও প্রভাব: এ মতবাদের নানা সমালোচনা থাকা সত্ত্বেও বর্তমানকালেও এর গুরুত্ব ও প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। নিম্নে সেগুলো বর্ণিত হল–

১। **গণতন্ত্রের সহায়ক:** এ মতবাদের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে গণতান্ত্রিক ধ্যান, ধারণা ও আদর্শ সৃষ্টি হয়েছে। যেমন, জন লকের সামাজিক চুক্তি মতবাদের ব্যাখ্যায় শাসককে তার কাজের জন্য জনগণের নিকট দায়ী করা হয়েছে। লকের এই বক্তব্য আধুনিক গণতান্ত্রিক আদর্শের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

২। **রাজনৈতিক প্রত্যয়ের বিকাশ:** সামাজিক চুক্তি মতবাদের বদৌলতে চিন্তার জগতে সাম্য, স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব কিংবা রাষ্ট্রের ধারণায় অনেকগুলো নতুন উপাদান যুক্ত হয়েছে।

৩। **ব্যক্তি মানুষের গুরুত্ব:** লক ও রুশোর সামাজিক চুক্তি মতবাদে, রাষ্ট্রের উৎপত্তিতে ব্যক্তি মানুষের ভূমিকার উপরে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এই দুই চিন্তাবিদ রাষ্ট্রের নিকট ব্যক্তির সকল অধিকার নিঃশর্তে দান করার বিপক্ষে মত দিয়েছেন।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি**) /শিক্ষার্থীর কাজ**	বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী কর্তৃক প্রদত্ত সামাজিক চুক্তি মতবাদের বৈসাদৃশ্য তুলে ধরুন।

সার-সংক্ষেপ

সামাজিক চুক্তি মতবাদের মূল বক্তব্য হল– জনগণ নিজেদের চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে রাষ্ট্রের সৃষ্টি করেছে। এ মতবাদে বলা হয় রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্বে প্রকৃতির রাজ্যে প্রকৃতির আইন অনুযায়ী মানুষ জীবন-যাপন করতো। কালক্রমে প্রকৃতির রাজ্যে নানা রকম সমস্যার সৃষ্টি হয়। এসব সমস্যা থেকে পরিত্রাণ প্রাপ্তির জন্য জনগণ চুক্তিতে আবদ্ধ হয় এবং রাষ্ট্রের সৃষ্টি করে। এ মতবাদের প্রবক্তা হলেন টমাস হবস, জন লক ও জ্যাঁ জ্যাক রুশো।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সামাজিক চুক্তির প্রবক্তা নয়–

ক) টমাস হবস খ) জন লক

গ) জ্যাঁ জ্যাক রুশো ঘ) অধ্যাপক গার্নার

২। টমাস হবসের রচিত গ্রন্থ–

ক) লেভিয়াথান খ) টু ট্রিটিজেস অন সিভিল গভর্নমেন্ট

গ) সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট ঘ) রিপাবলিক

৩। কার ব্যাখ্যায় সংসদীয় সরকারের রূপ লক্ষ্য করা যায়?

ক) গার্নার খ) জন লক

গ) রুশো ঘ) হবস

৪। প্রকৃতির রাজ্য ভয়াবহ ছিল– এ কথা কে বলেছেন?

ক) জন লক খ) হবস

গ) রুশো ঘ) জেংকস

পাঠ-৬.৭ আধুনিক রাষ্ট্রের কার্যাবলি (Functions of Modern State)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- রাষ্ট্রের অপরিহার্য কার্যাবলি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক কার্যাবলি বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	অপরিহার্য, ঐচ্ছিক, কার্যসম্পাদন, জনকল্যাণমূলক, ন্যায়বিচার।

আধুনিক রাষ্ট্রের কার্যাবলি

রাষ্ট্র সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। মানুষের প্রয়োজনেই রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে। তাই রাষ্ট্র মানুষের প্রয়োজনে বিভিন্ন কার্য সম্পাদন করে। আধুনিক কালে রাষ্ট্র পূর্বের তুলনায় বহুবিধ কার্য সম্পাদন করে। এসব কাজকে প্রধানত, দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা– (ক) অপরিহার্য বা মৌলিক কার্যাবলি, (খ) ঐচ্ছিক বা জনকল্যাণমূলক কার্যাবলি।

(ক) অপরিহার্য বা মৌলিক কার্যাবলি: রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ও জনগণের অধিকার রক্ষার জন্য রাষ্ট্র যেসব কাজ করে, সেগুলোকে রাষ্ট্রের অপরিহার্য বা মৌলিক কাজ বলে। নিম্নে রাষ্ট্রের অপরিহার্য কাজের বর্ণনা দেয়া হল–

১। **দেশরক্ষা:** সার্বভৌমত্ব তথা দেশরক্ষা রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান কাজ। এজন্য রাষ্ট্র সশস্ত্রবাহিনী গঠন ও পরিচালনা করে।

২। **প্রশাসন পরিচালনা:** রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল প্রশাসন পরিচালনা। এ কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য রাষ্ট্র শাসন বিভাগ গঠন করে। শাসন বিভাগের প্রচলিত আইন অনুযায়ী প্রশাসন কার্য পরিচালনা করে।

৩। **শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা:** অভ্যন্তরীন শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার মাধ্যমে রাষ্ট্র জনগনের জন্য শান্তিময় পরিবেশ সৃষ্টি করে। এ কাজ সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য রাষ্ট্র আইন-কানুন প্রণয়ন, পুলিশ ও অন্যান্য বাহিনী গঠন করে।

৪। **পররাষ্ট্র সংক্রান্ত:** আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক রাজনীতি, প্রতিবেশি দেশের সাথে সম্পর্কের ধরণ নির্ধারণ, ব্যবসা-বানিজ্যের প্রসার, পরনির্ভরশীলতা হ্রাস প্রভৃতির জন্য প্রত্যেক রাষ্ট্রকে পররাষ্ট্রনীতি গ্রহন করতে হয়। এ কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয় আনুষ্ঠানিক কাজগুলো করে।

৫। **আইন প্রণয়ন:** রাষ্ট্রের কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন ও সংশোধন করে। এ কাজের জন্য রাষ্ট্র আইন বিভাগ গঠন করে। তাছাড়া সংবিধান সংশোধন করাও আইন সভার কাজ।

৬। **বিচার সংক্রান্ত:** আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা রাষ্ট্রের অন্যতম কাজ। এ কাজে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য রাষ্ট্র বিচার বিভাগ গঠন করে। বিচার বিভাগ আইন অনুযায়ী অপরাধীকে শাস্তি দেয় এবং নিরাপরাধীকে মুক্তি ও ক্ষতিপূরণ দিয়ে ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠা করে।

(খ) ঐচ্ছিক বা জনকল্যাণমূলক কাজ: যেসব কাজ রাষ্ট্রের অবশ্য করণীয়ের মধ্যে পড়ে না কিন্তু জনগণের কল্যাণের জন্য রাষ্ট্রকে করতে হয, সেসব কাজকে রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক বা জনকল্যানমূলক কাজ বলে। নিম্নে রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক কাজের বর্ণনা দেওয়া হল:

১। **শিক্ষামূলক:** রাষ্ট্র শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে নিজের জন্য জ্ঞান ও দক্ষতা তৈরি করে। এ ছাড়াও শিক্ষার মাধ্যমে রাষ্ট্র নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে। সচেতন নাগরিক রাষ্ট্রের সফলতার জন্য অতি প্রয়োজন। শিক্ষা বিস্তারের জন্য আধুনিক রাষ্ট্র স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, পাঠাগার প্রভৃতি স্থাপন ও পরিচালনা করে।

২। **বৃদ্ধ ও দরিদ্রদের সাহায্য:** দারিদ্র্য দূর করার জন্য রাষ্ট্র বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে ও কর্মসংস্থান তৈরি করে। তাছাড়া বৃদ্ধদের বার্ধক্যজণিত নিরাপত্তা ভাতা ও পেনশন প্রদান করে।

৩। **শ্রমিক কল্যাণ:** আধুনিক রাষ্ট্র শ্রমিকদের কল্যাণে বহুবিধ কাজ করে। যেমন, শ্রমিকদের কাজের মেয়াদ ও মজুরি নির্ধারণ, বাসস্থান, চিকিৎসা, নিরাপত্তার ব্যবস্থা, শ্রম আদালত প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি।

৪। **জনহিতকর কাজ:** আধুনিক রাষ্ট্র জনকল্যাণে অনেক জনহিতকর কাজ করে। যেমন, চিত্তবিনোদনের জন্য খেলার মাঠ নির্মাণ, সিনেমা হল প্রতিষ্ঠা কিংবা রেডিও টেলিভিশনে আনন্দদায়ক অনুষ্ঠান প্রচার। এছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য প্রদান ও পুনর্বাসন, মহামারী ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের মত কাজগুলো আধুনিক রাষ্ট্রের জনহিতকর কাজের অন্তর্ভূক্ত।

সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে মানুষের চিন্তা-চেতনা ও ধ্যান-ধারণার প্রসার ঘটেছে। এর ফলশ্রুতিতে আধুনিক রাষ্ট্রের কার্যাবলি বৃদ্ধি পেয়েছে বহুগুণ।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	রাষ্ট্রের অপরিহার্য কাজের তালিকা তৈরি করুন।

সার-সংক্ষেপ

আধুনিক রাষ্ট্রের কার্যাবলিকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা– ক) অপরিহার্য বা মৌলিক কার্যাবলি, যা রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ও জনগণের অধিকার রক্ষার জন্য করা হয়। খ) ঐচ্ছিক বা জনকল্যাণমূলক কার্যাবলি, যা জনগণের কল্যাণার্থে করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। আধুনিক রাষ্ট্রের কার্যাবলিকে প্রধানত কয় ভাগে ভাগ করা যায়?

ক) ২ খ) ৩
গ) ৪ ঘ) ৫

২। সার্বভৌমত্ব ও সংহতি এবং নাগরিকদের অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য রাষ্ট্র কোন ধরনের কাজ করে?

ক) মৌলিক খ) ঐচ্ছিক
গ) জনকল্যাণমূলক ঘ) স্বাভাবিক

৩। রাষ্ট্রের অপরিহার্য কাজ–

i) প্রশাসন পরিচালনা ii) শান্তি শৃংখলা রক্ষা iii) শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন

কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) ii ও iii
গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৬.৮ পুঁজিবাদ (Capitalism)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- পুঁজিবাদের ধারণা বর্ণনা করতে পারবেন।
- পুঁজিবাদের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	পুঁজি, মুনাফা, অবাধ প্রতিযোগিতা, দক্ষতা, মালিকানা, উৎপাদন ব্যবস্থাপনা, ভোগ, শ্রেণি বৈষম্য।

পুঁজিবাদের ধারণা

পুঁজিবাদ এক বিশেষ ধরনের অর্থ ব্যবস্থা যেখানে ব্যক্তি মালিকানা দ্বারা অর্থনীতি নিয়ন্ত্রিত হয়। এ ব্যবস্থায় ব্যক্তি সম্পত্তির পূর্ণ স্বীকৃতি রয়েছে। পুঁজিবাদে নতুন নতুন বিনিয়োগ বেসরকারি উদ্যোগে গৃহীত হয় এবং তা অবাধ প্রতিযোগিতা ও সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়। পুঁজিবাদে চাহিদা-যোগান এবং উৎপাদনের প্রতিযোগিতার মাধ্যমে দ্রব্যের দাম নির্ধারিত হয়। এ ব্যবস্থায় উৎপাদন, বন্টন, ভোগ প্রভৃতি নিয়ন্ত্রনের জন্য কোন কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ থাকে না। সুতরাং বলা যায়, যে অর্থ ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপাদানসমূহ ব্যক্তিমালিকানাধীন থাকে তাকে পুঁজিবাদ বা ধনতন্ত্র বলে।

পুঁজিবাদের বৈশিষ্ট্য

পুঁজিবাদের ধারণা বিশ্লেষণ করলে এর কতগুলো বেশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়, সেগুলো নিম্নে আলোচনা করা হল:

১। **মালিকানা:** উৎপাদনের উপাদানসমূহ ব্যক্তি মালিকানাধীন থাকে। এ ব্যবস্থায় ব্যক্তি স্বাধীনভাবে ভূমি ক্রয়, শ্রমিক নিয়োগ ও পুঁজি গঠন করতে পারে। অর্থাৎ উৎপাদনে ব্যক্তি নিজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।

২। **অবাধ প্রতিযোগিতা:** পুঁজিবাদে বহু সংখ্যক উৎপাদক থাকে। তাঁদের মধ্যে অবাধ প্রতিযোগিতা থাকে। এজন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দ্রব্যসমূহ অধিক যত্নের সাথে উৎপাদন করা হয়। এর ফলে উৎপাদিত দ্রব্যসমূহের মান ক্রমাগত উন্নত হয়।

৩। **ভোগের স্বাধীনতা:** পুঁজিবাদে কোন দ্রব্য কি পরিমাণ ভোগ বা ক্রয় করবে সে সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যক্তি পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে। এ ব্যবস্থায় ভোগ বা ক্রয়ের উপরে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ থাকে না।

৪। **সর্বাধিক মুনাফা অর্জন:** পুঁজিবাদের প্রধান লক্ষ্য সর্বাধিক মুনাফা অর্জন। এ ব্যবস্থায় পুঁজিপতিরা সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের জন্য যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। অন্যভাবে বলা যায়, এ ব্যবস্থায় যেসব দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদন অধিক লাভজনক, উৎপাদনকারীরা সেসব দ্রব্যসমূহ বেশি-বেশি উৎপাদন করে।

৫। **শ্রেণি বৈষম্য:** পুঁজিবাদে সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের জন্য পুঁজিপতিরা অল্প ব্যয়ে উৎপাদন করতে চায়। তাই তাঁরা শ্রমিকদের অল্প পারিশ্রমিক প্রদান করে। এর ফলে মালিক শ্রেণি দিন-দিন ধনিক শ্রেণিতে পরিণত হয়। আর শ্রমিক শ্রেণি কালক্রমে গরীব হতে থাকে। এর ফলে সমাজে শ্রেণি বৈষম্য সৃষ্টি হয়।

৬। **দক্ষতা বৃদ্ধি:** পুঁজিবাদের অবাধ প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান নিজ-নিজ দক্ষতা বৃদ্ধির চেষ্টা করে। এর ফলে এ ব্যবস্থায় মানব সম্পদের ক্রমশ উন্নয়নের সম্ভাবনা থাকে।

৭। **অপচয় বৃদ্ধি:** পুঁজিবাদে অবাধ প্রতিযোগিতা ও যেকোন উপায়ে ভোক্তাকে আকর্ষনের জন্য বিজ্ঞাপন প্রচার ও বিক্রয় কর্মী নিয়োগ করতে হয়। এতে প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়।

পুঁজিবাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য অসাম্য সৃষ্টি। এই অসাম্য থেকে তৈরি হয় সামাজিক-রাজনৈতিক অস্থিরতা। উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলো কল্যাণমূলক ব্যবস্থা প্রচলনের মাধ্যমে অস্থিতিশীলতা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি**) /শিক্ষার্থীর কাজ**	বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কি পুঁজিবাদের অস্তিত্ব লক্ষ্য করেন? উত্তরের পক্ষে যুক্তি দেখান।

সার-সংক্ষেপ

যে অর্থ ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপাদানসমূহ ব্যক্তি মালিকানাধীন থাকে তাকে পুঁজিবাদ বলে। পুঁজিবাদের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলঃ (১) ব্যক্তি মালিকানাধীন উৎপাদনের উপাদান (২) অবাধ প্রতিযোগিতা (৩) ভোগের স্বাধীনতা (৪) সর্বাধিক মুনাফা অর্জন (৫) শ্রেণি বৈষম্য (৬) দক্ষতা বৃদ্ধি (৭) অপচয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কোন অর্থ ব্যবস্থায় মুনাফা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ?

ক) পুঁজিবাদ খ) সমাজতন্ত্র

গ) কতিপয়তন্ত্র ঘ) সাম্যবাদ

২। পুঁজিবাদের উল্লেখযোগ্য বা প্রধান বৈশিষ্ট্য–

i) সম্পদের ব্যক্তি মালিকানা ii) অবাধ প্রতিযোগিতা iii) অপচয়

কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) ii ও iii

গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৬.৯ সমাজতন্ত্র (Socialism)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- সমাজতন্ত্রের ধারণা বর্ণনা করতে পারবেন।
- সমাজতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	সামাজিক শ্রেণি, বৈষম্য, শোষণ, রাষ্ট্রীয় মালিকানা, সম্পদের সুষম বণ্টন

সমাজতন্ত্রের ধারণা

সমাজতন্ত্রের মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে রাষ্ট্রীয় মালিকানা। ব্যক্তি মালিকানা ভিত্তিক পুঁজিবাদের বিপরীতে সমাজতন্ত্রে সম্পদের রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠা হয়। মার্কসবাদী ব্যাখ্যাতে সমাজতন্ত্র হচ্ছে একটি অন্তর্বর্তীকালীন পর্যায়। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ধণিক শ্রেণির আধিপত্য ধ্বংস হয়। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য থাকে একটি শ্রেণিহীন, শোষণহীন সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠা।

সমাজতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের স্বরূপ ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে এর কতগুলো বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। নিম্নে সমাজতন্ত্রের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করা হল:

১. **রাষ্ট্রের কল্যাণে প্রাধান্য:** সমাজতন্ত্রে বলা হয়, রাষ্ট্র গঠিত হয় সকল ব্যক্তির সমন্বয়ে। সুতরাং রাষ্ট্রের কল্যাণ ও মঙ্গল করার অর্থ হল ব্যক্তির কল্যাণ সাধন। এজন্য সমাজতন্ত্রে রাষ্ট্রের কল্যাণ সাধনে বেশি গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

২. **উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থা:** সমাজতন্ত্রে উৎপাদনের উপাদানসমূহ, যেমন ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন এবং উৎপাদিত সম্পদের বন্টন ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয় মালিকাধীন থাকে। এ ব্যবস্থায় প্রত্যেকে তাঁর সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করে। এর ফলে প্রত্যেক মানুষের দক্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং রাষ্ট্রের দ্রুত উন্নয়ন সম্ভব হয়।

৩. **ব্যক্তিগত সম্পত্তির অনুপস্থিতি:** সমাজতন্ত্রে সকল সম্পত্তির উপর রাষ্ট্রীয় মালিকানা বিদ্যমান থাকে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা না থাকায়, ব্যক্তি তার আয়ের মাধ্যমে কোন সম্পদের মালিক হতে পারে না। সমাজতন্ত্র সকল সম্পদ জাতীয়করণে বিশ্বাসী।

৪. **পরিকল্পনা গ্রহণ:** অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমতা অর্জনের লক্ষ্যে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন হয়। এজন্য সমাজতন্ত্রে সাধারণত কোন প্রকার বৈষম্য দেখা যায় না।

৫. **নৈতিক উন্নতি:** সমাজতন্ত্রে মানুষের মধ্যে নৈতিক উন্নতি ঘটে। সমাজতন্ত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগে কোন ব্যক্তি পুঁজি গঠন করতে পারে না। তাই সমাজতন্ত্রে ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জনের জন্য মূল্যবৃদ্ধি, কালোবাজারী ও দুর্নীতির সম্ভাবনা সাধারণত থাকে না। এর ফলশ্রুতিতে মানুষের নৈতিক উন্নতির সম্ভাবনা থাকে।

৬. **সর্বাধিক কল্যাণ:** সমাজতন্ত্রে সর্বাধিক মুনাফা অর্জন নয়, বরং জনগণের সর্বাধিক কল্যাণ সাধন ও মৌলিক চাহিদা পূরণ করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ড পরিচালিত হয়।

৭. **ব্যক্তিস্বাধীনতার অভাব:** সমাজতন্ত্রে সকল বিষয় রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে থাকে বিধায় ব্যক্তিস্বাধীনতার অভাব দেখা যায়।

৮. **বিবিধঃ** (ক) সমাজতন্ত্রে অবাধ প্রতিযোগিতার পরিবর্তে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এর ফলে জনগণ নিজেদেরকে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করার সুযোগ পায়। আবার, কখনো-কখনো সমাজতন্ত্র ব্যক্তিস্বাধীনতার অন্তরায় হিসেবে কাজ করে। কারণ এ ব্যবস্থায় ব্যক্তির চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা প্রভৃতি রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে থাকে। এরূপ নিয়ন্ত্রণ অনেক সময় ব্যক্তিস্বাধীনতা বিনষ্ট করে।

(খ) আমলাতন্ত্রের প্রভাবঃ সমাজতন্ত্রে সবকিছু রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয় বিধায় আমলাদের প্রভাব অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এমন অবস্থা সৃষ্টি হলে সমাজতন্ত্র হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়ে।

সামন্ততান্ত্রিক কিংবা পুঁজিবাদী ব্যবস্থাতে লাঞ্ছিত-বঞ্চিত নিম্নশ্রেণির মানুষ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মানুষের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি**) /শিক্ষার্থীর কাজ**	সমাজতন্ত্রের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য তুলে ধরুন।

সার-সংক্ষেপ

যে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপাদানসমূহ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন থাকে তাকে সমাজতন্ত্র বলে। সমাজতন্ত্রের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে (১) রাষ্ট্রের কল্যাণকে প্রাধান্য দেয়া হয় (২) রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন উৎপাদন ও বন্টন (৩) ব্যক্তিগত সম্পত্তির অনুপস্থিতি (৪) রাষ্ট্র গৃহীত উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা (৫) সাধারণ জনগনের সর্বাধিক কল্যাণ (৬) ব্যক্তিস্বাধীনতার অভাব।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৯

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সমাজতন্ত্রের বিপরীত অর্থব্যবস্থা–

ক) পুঁজিবাদ খ) মিশ্রতন্ত্র

গ) কতিপয়তন্ত্র ঘ) ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ

২। সমাজতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য–

i) উৎপাদন ও বন্টন রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন

ii) ব্যক্তিগত সম্পত্তির অনুপস্থিতি

iii) ব্যক্তিস্বাধীনতার অভাব

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i খ) ii

গ) iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৬.১০ সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের পার্থক্য (Difference between Socialism and Capitalism)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	সম্পত্তির মালিকানা, উৎপাদন, বন্টন, উদ্বৃত্ত, প্রতিযোগিতা, রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ।

সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের পার্থক্য

সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের ধারণা বিশ্লেষণ করলে এদের মধ্যকার যেসব পার্থক্য দেখা যায়, সেগুলো নিম্নে বর্ণিত হল:

১। **কল্যাণের প্রাধান্য:** সমাজতন্ত্রে রাষ্ট্রের কল্যাণের প্রতি অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়। এ ব্যবস্থায় বলা হয়, রাষ্ট্রের কল্যাণ হলেই ব্যক্তির কল্যাণ হবে। অন্যদিকে, পুঁজিবাদে ব্যক্তির কল্যাণকে প্রাধান্য দেয়া হয়। এ ব্যবস্থায় ধরে নেয়া হয় ব্যক্তির কল্যাণ হলেই রাষ্ট্রের কল্যাণ হবে।

২। **উৎপাদন ও বন্টন:** সমাজতন্ত্রে উৎপাদনের উপাদানসমূহ ও উৎপাদিত দ্রব্যের বন্টন ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে হয়। অন্যদিকে, পুঁজিবাদে উৎপাদনের উপায়সমূহ ব্যক্তি মালিকানাভিত্তিক।

৩। **সম্পত্তির মালিকানা:** সমাজতন্ত্রে সকল সম্পদ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন থাকে। অন্যদিকে, পুঁজিবাদে সম্পত্তি ব্যক্তি মালিকাধীন থাকে।

৪। **প্রতিযোগিতা:** সমাজতন্ত্রে একমাত্র উৎপাদক রাষ্ট্র। যার দরুণ এ ব্যবস্থায় অবাধ প্রতিযোগিতা অনুপস্থিত। আবার, পুঁজিবাদে বহু সংখ্যক উৎপাদক থাকে। ফলে তাদের মধ্যে অবাধ প্রতিযোগিতা বিদ্যমান।

৫। **ভোগের স্বাধীনতা:** সমাজতন্ত্রে ভোক্তার স্বাধীনতা নেই বললেই চলে। কারণ এ ব্যবস্থায় রাষ্ট্র প্রদত্ত উৎপাদিত দ্রব্য ক্রয় করতে হয়। তবে পুঁজিবাদে কোন দ্রব্য কি পরিমাণ ভোগ বা ক্রয় করবে ব্যক্তি তা নিজে ঠিক করে।

৬। **সর্বাধিক মুনাফা:** সমাজতন্ত্রে সর্বাধিক মুনাফার পরিবর্তে সর্বাধিক কল্যাণ সাধন ও মৌলিক চাহিদা পূরণে গুরুত্ব দেয়া হয়। পুঁজিবাদে মুনাফাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

৭। **সমতা:** সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে মানুষে-মানুষে শ্রেণিগত ব্যবধান দুর করার চেষ্টা থাকে। পক্ষান্তরে, পুঁজিবাদে শ্রেণি বৈষম্য থাকে। কারণ এ ব্যবস্থায় অধিক মুনাফার স্বার্থে পুঁজিপতিরা অল্প ব্যয়ে উৎপাদন করতে চায়। এজন্য শ্রমিকদের মজুরি কম দেয়া হয়। পরিণামে মালিক শ্রেণি ক্রমাগত সম্পদশালীতে পরিণত হয়, আর শ্রমিক শ্রেণি দরিদ্র হতে থাকে।

৮। **ব্যয়ের দিক থেকে:** সমাজতন্ত্রে প্রতিযোগিতা না থাকায় বিজ্ঞাপন বা বিক্রয়কর্মী নিয়োগ করতে হয় না। এর ফলে অর্থের অপচয় কম। পুঁজিবাদে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়।

৯। **কাজের চাপ:** সমাজতন্ত্রে রাষ্ট্রের উপরে সীমাহীন কাজের চাপ থাকে বিধায় সরকারি কার্যক্রমে ধীর গতি পরিলক্ষিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অন্যদিকে, পুঁজিবাদে ব্যক্তি মালিকানা ব্যবস্থা চালু থাকায় রাষ্ট্র তুলনামূলকভাবে কম চাপের মধ্যে থেকে কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে।

পরিশেষে বলা যায়, সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের দোষ-গুন উভয়ই রয়েছে। তবে আধুনিক বিশ্বে সমাজতন্ত্রের তুলনায় পুঁজিবাদের প্রচলন অধিক। পুঁজিবাদের নানা ত্রুটির কারণে উত্তর-উপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলোর অনেকেই একসময় মিশ্র অর্থনীতি গ্রহণ করেছিল। উল্লেখ্য মিশ্র অর্থনীতিতে সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদ উভয়ের বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়। পরবর্তীকালে অবশ্য মিশ্র অর্থনীতির রাষ্ট্রগুলোর প্রায় সকলেই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি**) /শিক্ষার্থীর কাজ**	আপনার দৃষ্টিতে সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের মূল পার্থক্য কি?

সার-সংক্ষেপ

সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের মাঝে অনেকগুলো পার্থক্য রয়েছে। এই পার্থক্যগুলোর মধ্যে সম্পত্তির মালিকানা, মুনাফার হিস্যা, ভোগের ধরণ, সর্বোপরি উৎপাদন ব্যবস্থার পার্থক্য উল্লেখযোগ্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.১০

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কোন অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তির স্বার্থকে বেশি প্রাধান্য দেয়া হয়?

ক) সমাজতন্ত্র খ) পুঁজিবাদ

গ) মিশ্র অর্থনীতি ঘ) আমলাতন্ত্র

২। সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের প্রধান পার্থক্য–

i) সম্পত্তির মালিকানায়

ii) পরিকল্পনা প্রনয়ণে

iii) অপচয়ের প্রাধান্যে

কোনটি সঠিক?

ক) i খ) ii

গ) iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৬.১১ মিশ্র অর্থনীতি (Mixed Economy)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- মিশ্র অর্থনীতির ধারণা, সুবিধা-অসুবিধা বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	রাষ্ট্রীয় মালিকানা, ব্যক্তি মালিকানা, অবাধ প্রতিযোগিতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ।

মিশ্র অর্থনীতির ধারণা

যে অর্থ ব্যবস্থায় সম্পদের রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত মালিকানা এবং সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ পাশাপাশি বিরাজ করে তাকে মিশ্র অর্থনীতি বলা হয়। মিশ্র অর্থনীতিতে পুঁজিবাদের মত সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা, মুনাফা অর্জন ও ব্যক্তি উদ্যোগের স্বাধীনতা থাকে। আবার বেসরকারি পর্যায়ে অর্থনৈতিক কার্যাবলির উপর কিন্তু সরকারি নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকে। মিশ্র অর্থনীতি রাষ্ট্রের কিছু কিছু বৃহৎ শিল্পকারখানা ও ব্যবসা-বাণিজ্য সরকারিভাবে পরিচালিত হয়।

মিশ্র অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য

মিশ্র অর্থনীতির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ হচ্ছে: প্রথমত, মিশ্র অর্থনীতিতে সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগ পাশাপাশি অবস্থান করে। দ্বিতীয়ত, বেসরকারি মালিকানার উৎপাদন ও ব্যবসা-বাণিজ্যে সরকারের নিয়ন্ত্রণ থাকে। তৃতীয়ত, মিশ্র অর্থনীতিতে ক্রেতার পছন্দ অনুযায়ী উৎপাদন করা হয়। চতুর্থত, দ্রব্যমূল্য ও মুনাফা নিয়ন্ত্রণে সরকারি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। পঞ্চমত, মিশ্র অর্থনীতিতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি খাতের পরিকল্পনা করা হয়। সুতরাং মিশ্র অর্থনীতিতে উৎপাদন, ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যাংক, বীমা প্রভৃতি ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ পাশাপাশি বিরাজ করে।

মিশ্র অর্থনীতির পক্ষে যুক্তি

মিশ্র অর্থনীতির কতগুলো গুণ লক্ষ্য করা যায়। মিশ্র অর্থনীতির সমর্থকরা মিশ্র অর্থনীতর পক্ষে কতগুলো যুক্তি প্রদর্শন করে। প্রথমত, মিশ্র অর্থনীতিতে অবাধ প্রতিযোগিতা থাকে বিধায় উৎপাদনের ক্ষেত্রে যত্নশীলতা লক্ষ্য করা যায়। এর ফলে দ্রব্যের মান উন্নত হয়। দ্বিতীয়ত, মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় একই দ্রব্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে উৎপাদিতহয়। এর ফলে বেসরকারি উদ্যোক্তার দ্রব্যমূল্য বেশি হলে বিক্রির সম্ভাবনা কম থাকে। এ কারণে দ্রব্যমূল্যের উপর ব্যক্তি মালিকানাখাতের যথেচ্ছ নিয়ন্ত্রণের আশঙ্কা কম থাকে। তৃতীয়ত, মিশ্র অর্থনীতিতে ব্যক্তির চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা, আচার-আচরণ ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকে। ব্যক্তির জীবনকে পরিপূর্ণভাবে বিকাশ করার জন্য যেসব অধিকার প্রয়োজন, ব্যক্তি সেগুলো মিশ্র অর্থনীতিতে পেয়ে থাকে। চতুর্থত, মিশ্র অর্থনীতি রাষ্ট্রীয় পর্যবেক্ষণের মধ্যে থেকেই অবাধ প্রতিযোগিতার সুযোগ দেয়। পঞ্চমত, মিশ্র অর্থনীতিতে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের উৎপাদন হয় বিধায় ক্রেতার রুচি ও পছন্দ অনুযায়ী দ্রব্য বাজারে পাওয়া যায়। ষষ্ঠত, মিশ্র অর্থনীতিতে সরকারের কাজের চাপ কম থাকে। কারণ সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগে উৎপাদন কাজ সম্পাদিত হয়। এ ব্যবস্থায় সরকার জনকল্যাণকর কার্য সম্পাদন করতে পারে। শেষত: মিশ্র অর্থনীতিতে রাষ্ট্র দিক-নির্দেশনার ভূমিকায় থাকে বিধায় বেসরকারি খাত মুনাফার ক্ষেত্রে একচেটিয়াতন্ত্র (Monopoly) প্রতিষ্ঠা করতে পারে না।

মিশ্র অর্থনীতির বিপক্ষে যুক্তি

মিশ্র অর্থনীতির যেমন কতকগুলো গুণ রয়েছে, তেমনি কতগুলো দোষ রয়েছে। সমালোচকরা মিশ্র অর্থনীতির বিপক্ষে বিভিন্ন যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। প্রথমত, মিশ্র অর্থনীতিতে ব্যক্তিগত উদ্যোগের পূর্ণ স্বাধীনতার দরুণ মুনাফা অর্জনের লক্ষ্য কার্যকর থাকে। এ ব্যবস্থায় মালিক শ্রেণি অধিক মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে দুর্নীতি, কালোবাজারী, দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি ইত্যাদি নৈতিকতা বিরোধী কাজ করতে পারেণ। দ্বিতীয়ত, মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মতই মালিক দিন-দিন সম্পদশালীতে পরিণত হয়। অন্যদিকে, শ্রমিক ক্রমশ দরিদ্র হতে থাকে। এর ফলে সমাজে ভারসাম্য নষ্ট হয়। তৃতীয়ত, এ ব্যবস্থায় অবাধ প্রতিযোগিতা থাকে বিধায় একই দ্রব্য বিভিন্ন গুণের ও মানের হয়। এর ফলে ক্রেতারা একদিকে বিভ্রান্ত হয়। চতুর্থত, মিশ্র অর্থনীতিতে ব্যক্তিগত মালিকানার পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় মালিকানা থাকে। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা মনোযোগ দিয়ে কাজ করে না। এ কারণে অধিকাংশ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানে লোকসান হয়। পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদদের মতে, মিশ্র অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের কারণে বাজার ব্যবস্থার স্বাভাবিকতা নষ্ট হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় দিকই রয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও পরে উপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত হওয়া অনেক দেশ সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের মধ্যে এক ধরনের সমন্বয়কারী হিসাবে মিশ্র অর্থনীতি গ্রহণ করেছিল। গত শতাব্দীর শেষের দিকে, বিশেষ করে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পতনের পর থেকে, এক সময়ের মিশ্র অর্থনীতির দেশগুলোতে পুঁজিবাদের সর্বশেষ ধারাটি, অর্থাৎ নব্য উদারনীতিবাদ গ্রহণের প্রবণতা দেখা দিয়েছে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	মিশ্র অর্থনীতির পক্ষে যুক্তি দেখান।

সার-সংক্ষেপ

মিশ্র অর্থনীতি হচ্ছে ব্যক্তিমালিকানা ভিত্তিক পুঁজিবাদ ও রাষ্ট্রীয় মালিকানা ভিত্তিক সমাজতন্ত্রের এক ধরনের সমন্বয়। এতে ব্যক্তিগত উদ্যোগকে স্বাগত জানানো হয়। কিন্তু ব্যক্তিগত খাতে যাতে মুনাফাতন্ত্র কায়েম করতে না পারে সেজন্য রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.১১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় মালিকানা উভয়ই বিরাজ করে–

ক) সমাজতন্ত্রে খ) পুঁজিবাদে

গ) মিশ্র অর্থনীতিতে ঘ) অভিজাততন্ত্র

২। বর্তমানে পৃথিবীতে কোন ধরনের অর্থ ব্যবস্থা বেশি প্রচলিত?

ক) সমাজতন্ত্র খ) পুঁজিবাদ

গ) মিশ্র অর্থনীতি ঘ) আমলাতন্ত্র

পাঠ-৬.১২ কল্যাণ রাষ্ট্র : ধারণা ও কার্যাবলি (Welfare State: Concepts and Functions of Welfare State)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- কল্যাণ রাষ্ট্রের ধারণা বর্ণনা করতে পারবেন।
- কল্যাণ রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য ও কার্যাবলি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	অর্থনৈতিক উন্নতি, সামাজিক কল্যাণ, আয়ের ভারসাম্য, জনকল্যাণ, মৌলিক অধিকার, ব্যক্তিত্বের বিকাশ, ন্যায়বিচার, আইনের শাসন।

কল্যাণ রাষ্ট্রের ধারণা

এক সময় রাষ্ট্রের প্রধান কাজ ছিল অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করা। কিন্তু একটি সময়ে বিশেষত: বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিক থেকে, এই ধারণা বিকশিত হতে শুরু করে যে, কেবলমাত্র শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা বা বহি:শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করা রাষ্ট্রের প্রধান কাজ হতে পারে না। এ সময় থেকেই নাগরিকের অর্থনৈতিক উন্নতি ও সামাজিক কল্যাণ সাধন রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব হিসাবে পরিগণিত হতে থাকে। যেসব রাষ্ট্র নাগরিকদের সঠিক জীবন মানের উন্নতির জন্য এসব দায়িত্ব হাতে তুলে নেয় সেগুলোকে কল্যাণ রাষ্ট্র বলে।

উদাহরণস্বরূপ, কল্যাণ রাষ্ট্র জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা, বেকার ভাতা প্রদান, শিক্ষার উন্নয়নে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা এবং চিকিৎসার উন্নয়নে মাতৃসদন, হাসপাতাল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করে। কল্যাণ রাষ্ট্র তার সকল নাগরিকের জন্য সমান সুযোগ তৈরি করে এবং সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর দিকে বিশেষ গুরুত্ব দানের নীতিতে বিশ্বাসী। একটি আর্দশ কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিটি নাগরিকের জন্য খাদ্য, বস্ত্র, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার সুবিধা প্রদান করে। বেকারত্ব, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে একজন ব্যক্তি জীবিকা অর্জনে ব্যর্থ হলে কল্যাণ রাষ্ট্র তাঁর পাশে দাঁড়ায়।

কল্যাণ রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য : কল্যাণ রাষ্ট্রের ধারণা ব্যাখ্যা করলে এর কতগুলো বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। যেমন–

১. **কল্যাণকর:** জনগণের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ করা কল্যাণ রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

২. **জীবন-যাত্রার উন্নত মান:** কল্যাণ রাষ্ট্রের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত। কারণ কল্যাণ রাষ্ট্র জনগণের জীবন-যাত্রার মান উন্নয়নের জন্য সম্পদের বন্টনের ক্ষেত্রে নিম্নবিত্ত বান্ধব অনেক নীতি অনুসরণ করে।

৩. **ব্যক্তিত্বের বিকাশ:** কল্যাণ রাষ্ট্রেই প্রত্যেক ব্যক্তি তার ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ পায়। কারণ এ ধরনের রাষ্ট্রে বৃহত্তর স্বার্থ ব্যতীত রাষ্ট্র জনগণের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে না।

৪. **আয়ের ভারসাম্য:** কল্যাণ রাষ্ট্রে ধনী ও গরীবের মধ্যে সম্পদ ও আয়ের ক্ষেত্রে কিছুটা হলেও ভারসাম্য বজায় থাকে।

৫. **পরিকল্পনা:** জনকল্যাণার্থে কল্যাণ রাষ্ট্র বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে।

৬. **সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী:** কল্যাণ রাষ্ট্রে নাগরিকদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্র সামাজিক পর্যায়ে নানা ধরণের সুযোগ-সুবিধা চালু করে। এসব সুবিধাদি ব্যবহার করে জনগণ উপকৃত হয়। রাষ্ট্রের চালু করা সামাজিক নিরাপত্তার বেষ্টনীর মধ্যে দরিদ্র কিংবা বয়স্ক ভাতা থেকে শুরু করে বিনামূল্য চিকিৎসা সুবিধা সব কিছুই অন্তর্গত। এ ধরনের বেষ্টনী থাকলে সাধারণ জনগণ ব্যক্তি মালিকানা খাতের যথেচ্ছ মুনাফাবাজির মধ্যে পড়ে না।

উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ যে রাষ্ট্রে পরিলক্ষিত হবে, তাকে কল্যাণ রাষ্ট্র বলে।

কল্যাণ রাষ্ট্রের কার্যাবলি

জনগণের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণার্থে কল্যাণ রাষ্ট্র যেসব কাজ করে সেগুলো নিম্নে বর্ণিত হল:

১. **জনকল্যাণ সংক্রান্ত:** কল্যাণ রাষ্ট্র জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে জনকল্যাণার্থে কাজ করে। এজন্য কল্যাণ রাষ্ট্র বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহন ও বাস্তবায়ন করে।

২. **অর্থনৈতিক নিরাপত্তা:** প্রত্যেক নাগরিক যাতে অর্থনৈতিক কাজে অংশ নিতে পারে, সেজন্য কল্যাণ রাষ্ট্র কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে। তাছাড়া বেকারদের বেকার ভাতা ও প্রবীণদের বিশেষ ভাতা প্রদানের মত নানা ধরনের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধান করে।

৩. **বৈষম্য দূরীকরণ:** কল্যাণরাষ্ট্র ধনীদের উপর অধিক কর আরোপ করে এবং উক্ত কর গরীবদের কল্যাণার্থে ব্যয় করে। এভাবে কল্যাণ রাষ্ট্র ধনী-গরীরের বৈষম্য হ্রাস করে।

৪. **জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত:** সুস্থ দেহ ও মনের অধিকারী ব্যক্তির সমন্বয়ে গড়ে ওঠে সুস্থ জাতি। এ লক্ষ্যে কল্যাণ রাষ্ট্র বিভিন্ন হাসপাতাল, হেলথ ক্লিনিক, শিশু সনদ, মাতৃসদন স্থাপন করে। তাছাড়া বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা, সংক্রামক রোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

৫. **যোগাযোগ সংক্রান্ত:** যোগাযোগ ব্যবস্থাকে বলা হয় সভ্যতার চাবিকাঠি। যে রাষ্ট্র যত উন্নত সে রাষ্ট্রের যোগাযোগ ব্যবস্থাও উন্নত। কল্যাণ রাষ্ট্র যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে রাস্তা-ঘাট নির্মাণ, রেল, বিমান, ডাক, তার টেলিফোন, ইন্টারনেটসহ তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়নের ব্যবস্থা করে।

৬. **শিল্প ও বাণিজ্য:** কল্যাণ রাষ্ট্র শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নয়নের জন্য কল-কারখানা স্থাপন ও বাণিজ্যনীতি প্রণয়ন করে। তাছাড়া শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নয়নের জন্য কল্যাণ রাষ্ট্র ব্যাংক, বীমা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করে।

৭. **শিক্ষা সংক্রান্ত:** অশিক্ষা ও অজ্ঞতার কবল থেকে মুক্ত করার জন্য কল্যাণ রাষ্ট্র বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও নিয়ন্ত্রণ করে। তাছাড়া শিক্ষার প্রসারে লক্ষ্যে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করে।

৮. **কৃষি উন্নয়ন:** খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে কল্যাণ রাষ্ট্র কৃষির উন্নয়ন সাধনে সচেষ্ট থাকে। এজন্য রাষ্ট্র জলসেচ, খালখনন, বাঁধ নির্মাণ, সুলভ সার, বীজ, কীটনাশক সরবরাহ, কৃষিঋণ প্রভৃতির ব্যবস্থা করে থাকে।

৯. **বিবিধ:** নাগরিকের মৌলিক অধিকার ভোগের নিশ্চয়তা বিধান, শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসার ঘটানো, ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় মালিকানার মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়ে সুষ্ঠু অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা কিংবা চিত্ত বিনোদনের ব্যবস্থা করা কল্যান রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য।

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, শ্রেণি-বর্ণ-ধর্ম-লিঙ্গ নির্বিশেষে সকল জনগণের উন্নতি সাধন করাই কল্যাণ রাষ্ট্রের লক্ষ্য।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি**) /শিক্ষার্থীর কাজ**	কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের কয়েকটি উদাহরণ দিন।

সার-সংক্ষেপ

যে রাষ্ট্র ব্যক্তি ও সমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নে কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে তাকে কল্যাণ রাষ্ট্র বলে। কল্যাণ রাষ্ট্রের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল– (১) জনকল্যাণ সাধন (২) উন্নত জীবন-যাত্রার মান (৩) ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ (৪) মৌলিক চাহিদা পূরণের উদ্যোগ (৫) উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ (৬) আইনের শাসন প্রভৃতি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.১২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কল্যাণ রাষ্ট্রের ধারণা মূলত–

ক) প্রাচীনকালের খ) মধ্যযুগের

গ) আধুনিক কালের ঘ) বিংশ শতাব্দীর

২। কল্যাণ-রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য–

i) জনগনের সর্বাধিক কল্যাণ সাধন ii) জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন iii) জনগনের আয় ও সম্পদের ভারসাম্য রক্ষা

কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) ii ও iii

গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে প্রফেসর শামীম আহমেদ এবং প্রফেসর এম আর ইসলাম পরস্পর ভিন্ন ধরনের বক্তব্য পেশ করেন। প্রফেসর শামীম বলেন, রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্বে মানুষ প্রকৃতির রাজ্যে বসবাস করতো। কালক্রমে তারা নানাবিধ অসুবিধার সম্মুখীন হয়। এ অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য মানুষ নিজেরাই রাষ্ট্রের সৃষ্টি করে। অন্যদিকে, প্রফেসর এম আর ইসলাম বলেন, ব্যক্তি থেকে পরিবার, পরিবার থেকে গোষ্ঠী, গোষ্ঠী থেকে উপজাতি, উপজাতি থেকে রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়েছে।

ক. রাষ্ট্র কি?

খ. বিধাতার সৃষ্টিমূলক মতবাদের মূল বক্তব্য বর্ণনা করুন?

গ. প্রফেসর শামীমের বক্তব্যে কোন মতবাদের প্রতিফলন হয়েছে? ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. প্রফেসর এম আর ইসলাম-এর বক্তব্যটি সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য। এর স্বপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করুন।

২। 'ক' একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। জনগণের মৌলিক চাহিদা তথা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা পূরণ এবং ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য দূর করে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে উক্ত রাষ্ট্র সফল হয়েছে। এদেশের মানুষ অত্যন্ত শান্তিতে জীবন-যাপন করছে।

ক. পুঁজিবাদ কী?

খ. সমাজতন্ত্র বলতে কী বোঝায়?

গ. উদ্দীপকে কোন ধরনের রাষ্ট্রের প্রতিফলন হয়েছে? ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. উক্ত রাষ্ট্রের কার্যকলাপের সাথে বাংলাদেশের তুলনামূলক আলোচনা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.১ ঃ ১। গ ২। ঘ ৩। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.২ ঃ ১। গ ২। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৩ ঃ ১। ক ২। ক ৩। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৪ ঃ ১। ঘ ২। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৫ ঃ ১। ঘ ২। ক ৩। ঘ ৪। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৬ ঃ ১। ঘ ২। ক ৩। খ ৪। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৭ ঃ ১। ক ২। ক ৩। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৮ ঃ ১। ক ২। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৯ ঃ ১। ক ২। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.১০ ঃ ১। খ ২। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.১১ ঃ ১। খ ২। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.১২ ঃ ১। ঘ ২। ঘ

সরকার (Government)

ইউনিট ৭

শান্তি-শৃঙ্খলা ও স্বাধীনতা রক্ষা এবং নাগরিকের নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও মানবিক বিকাশ সাধনই হল রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্য। রাষ্ট্র এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করে সরকারের মাধ্যমে। রাষ্ট্র ও সমাজভেদে এ সরকার ব্যবস্থা বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। কোন রাষ্ট্রে গণতন্ত্র থাকলে অন্য কোন রাষ্ট্রে হয়তো একনায়কতন্ত্র বা রাজতন্ত্র দেখা যায়। আবার শাসন ব্যবস্থায় প্রধান কর্তৃত্ব কার হাতে ন্যস্ত থাকবে তার উপরও সরকারের ধরণ নির্ভর করে। তবে জনগণের সর্বাধিক অংশগ্রহণে গঠিত সরকারই স্থায়ী ও সফল হয়ে থাকে। এই ইউনিটে সরকারের শ্রেণিবিভাগ, বিভিন্ন ধরণের সরকারের দোষ-গুণ এবং বিভিন্ন রকম সরকারের পার্থক্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৭.১ঃ সরকারের ধারণা ও শ্রেণিবিভাগ	পাঠ-৭.৭ঃ রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের গুণাবলি ও সমস্যা
পাঠ-৭.২ঃ গণতন্ত্রের সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা	পাঠ-৭.৮ঃ সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের গুণাবলি ও সমস্যা
পাঠ-৭.৩ঃ একনায়কতন্ত্রের গুণাবলি ও সমস্যা	পাঠ-৭.৯ঃ রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ও মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার
পাঠ-৭.৪ঃ গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র	পাঠ-৭.১০ঃ এককেন্দ্রিক সরকারের গুণাবলি ও সমস্যা
পাঠ-৭.৫ঃ গণতন্ত্রের সাফল্যের শর্তাবলি	পাঠ-৭.১১ঃ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের গুণাবলি ও সমস্যা
পাঠ-৭.৬ঃ আদর্শ শাসন ব্যবস্থা হিসাবে গণতন্ত্র	পাঠ-৭.১২ঃ এককেন্দ্রিক সরকার ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ**

পাঠ-৭.১ সরকারের ধারণা ও শ্রেণি বিভাগ (Concept and Classification of Goverment)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- সরকারের ধারণা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- সরকারের শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	সরকার, এককেন্দ্রিক, যুক্তরাষ্ট্রীয়, স্বৈরতন্ত্র, রাজতন্ত্র, নগর রাষ্ট্র, পুলিশী রাষ্ট্র, জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র।

সরকারের ধারণা

যে চারটি উপাদান নিয়ে রাষ্ট্র গঠিত হয় তার মধ্যে অন্যতম একটি উপাদান হল সরকার। সরকার ব্যতীত রাষ্ট্র পরিচালনা করা অসম্ভব। রাষ্ট্রের কর্মকান্ড সরকারের মাধ্যমেই প্রকাশিত হয়। সরকার হল একটি বাস্তব রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। একে রাষ্ট্রের মুখপাত্রও বলা হয়। বৃহৎ অর্থে সরকার গঠিত হয় সকল নাগরিকের সম্মতিক্রমে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নির্বাচকমন্ডলী তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে সরকার গঠন বা পরিবর্তন করে থাকে।

অধ্যাপক জে ডব্লিউ গার্নার বলেন, "সরকার হচ্ছে একটি কার্য-নির্বাহী মাধ্যম বা যন্ত্র যার মাধ্যমে সরকারের সাধারণ নীতিমালা নির্ধারিত হয় এবং যার দ্বারা সাধারণ বিষয়াদি নিয়ন্ত্রিত হয় ও সাধারণ স্বার্থ রক্ষিত হয়।"

অধ্যাপক আর জি গেটেল বলেন, "সরকার হচ্ছে রাষ্ট্রের একটি যন্ত্র বা সংস্থা।"

পরিশেষে বলা যায় যে, রাষ্ট্রের আইন-কানুন, রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত, বিধি-নিষেধ, ইচ্ছা-অনিচ্ছা যে সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকাশিত ও বাস্তবায়িত হয় তাকে সরকার বলে। সরকারবিহীন রাষ্ট্র তার কর্মকান্ড পরিচালনা করতে সক্ষম হয় না।

সরকারের শ্রেণিবিভাগ

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় সরকারের শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কিত বিষয়টি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বহুকাল ধরে সরকারের শ্রেণিভাগের বিষয়টি গুরুত্বসহকারে বিবেচিত হয়ে আসছে। অধ্যাপক অ্যালান বল (Alan Ball) তাঁর "Modern Politics and Government" গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান চর্চার সূচনা লগ্ন থেকে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের শ্রেণিবিভাগের একটি প্রচেষ্টা সবসময় লক্ষ্য করা যায়। বস্তুত শ্রেণিবিভাগের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের সরকারি কাঠামো ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পন্থা-পদ্ধতির মধ্যে সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য বিচার-বিশ্লেষণ করা যায় এবং এর ফলে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের সমালোচনামূলক মূল্যায়ন করা যায়।

সরকারের শ্রেণিবিভাগ: সনাতনী ধারণা

সরকারের শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে প্রাচীন ও আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে ব্যাপক মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। প্রাচীনকাল থেকে সরকারের শ্রেণিবিভাগ মূলত তিনটি। প্রাচীনকালে যারা সরকারকে বিভিন্ন ভাগে বিশ্লেষণ করেছেন তাঁদের মধ্যে হিরোডোটাস (Herodotus) এবং এরিস্টটল (Aristotle) উল্লেখযোগ্য। হিরোডোটাস রাজতন্ত্র, কতিপয়তন্ত্র ও গণতন্ত্র এ তিন শ্রেণিতে সরকারকে বিভক্ত করেছেন। তবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এরিস্টটল সরকারকে যে শ্রেণিতে বিভক্ত করেছিলেন সেটি বেশি প্রচলিত এবং সাড়া জাগানো।

এরিস্টটল এর সরকারের শ্রেণিবিভাগ

সরকারের শ্রেণি-বিভাজনকে কেন্দ্র করে প্রাচীন এবং আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। প্রাচীন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে গ্রিক দার্শনিক এরিস্টটলের নাম এ ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। পন্ডিত এরিস্টটল তাঁর প্রখ্যাত 'পলিটিক্স' নামক গ্রন্থে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে সরকারের শ্রেণিবিভাগ করেছেন। কথিত আছে যে, তিনি সমকালীন ১৫৮টি নগর রাষ্ট্রের সংবিধান পর্যালোচনা করে এ শ্রেণিবিভাগ করেছেন।

এরিস্টটল দু'টি মূল সূত্র বা নীতির পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের শ্রেণিবিভাগ করেছেন। সরকার ও শাসনব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে তিনি এ দুটি মূল সূত্র উপস্থাপন করেন–

(ক) উদ্দেশ্য নীতি (Principle of Purpose)

(খ) সংখ্যা নীতি (Principle of Number)

(ক) উদ্দেশ্য নীতি (Principle of Purpose) ঃ উদ্দেশ্য নীতির অর্থ হচ্ছে রাষ্ট্রক্ষমতা শাসক বা শাসক-শ্রেণির স্বার্থে ব্যবহৃত হচ্ছে নাকি জনসাধারণের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে এবং শাসক বা শাসকশ্রেণি কী উদ্দেশ্যে কাজ সম্পাদন করতে চায়। এরিস্টটল উদ্দেশ্য নীতির ভিত্তিতে প্রত্যেকটি সরকারকে আবার দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন।

(i) স্বাভাবিক সরকার (Normal Government) এবং

(ii) বিকৃত সরকার (Perverted Government)।

(i) স্বাভাবিক সরকার (Normal Government) ঃ যে শাসনব্যবস্থা জনকল্যাণে নিয়োজিত এবং জনকল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত সে সরকারকে এরিস্টটল স্বাভাবিক শাসনব্যবস্থা বা সরকার বলেছেন। এখানে শাসক ব্যক্তি স্বার্থের কথা ভুলে গিয়ে সামগ্রিক জনগোষ্ঠীর স্বার্থে কাজ করেন। রাজতন্ত্র (Monarchy), অভিজাততন্ত্র (Aristocracy) এবং ন্যায়তন্ত্র (Polity) হচ্ছে স্বাভাবিক সরকার।

(ii) বিকৃত সরকার (Perverted Government) ঃ জনকল্যাণের পরিবর্তে যখন শাসক বা শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষার জন্যই সরকার পরিচালিত হয়, এরিস্টটল তাকে বিকৃত শাসনব্যবস্থা বা সরকার নামে অভিহিত করেছেন। স্বৈরতন্ত্র (Tyranny), কতিপয়তন্ত্র (Oligarcly) এবং গণতন্ত্র হচ্ছে (Democracy) বিকৃত সরকার।

(খ) সংখ্যা নীতি (Principle of Number) ঃ সরকারের শ্রেণি বিভক্তিকরণের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় নীতিটি হল সংখ্যা নীতি। সংখ্যা নীতি অনুসারে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা কতজন ব্যক্তির হাতে ন্যস্ত আছে তার ভিত্তিতে সরকারের শ্রেণিবিভাগ করা হয়। সংখ্যা নীতির ভিত্তিতে এরিস্টটল তিন শ্রেণির সরকারের কথা বলেছেন।

(i) একজনের শাসন (Rule by one)

(**ii**) কয়েকজনের শাসন (Rule by few)

(**iii**) বহুজনের শাসন (Rule by many)।

(i) একজনের শাসন (Rule by one) ঃ রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা একজনের হাতে ন্যস্ত থাকলে এবং জনকল্যাণসাধনই শাসনব্যবস্থা বা সরকারের উদ্দেশ্য হলে তাকে রাজতন্ত্র বলে। অর্থাৎ এক ব্যক্তির স্বাভাবিক শাসনই হল রাজতন্ত্র। কিন্তু এক ব্যক্তির দ্বারা শাসিত শাসন ক্ষমতা যদি কেবল শাসক বা রাজার স্বার্থেই ব্যবহৃত হয়, তবে তাকে স্বৈরতন্ত্র বলে। অতএব এক ব্যক্তি শাসিত রাষ্ট্রের বিকৃত শাসনকেই স্বৈরতন্ত্র বলা হয়।

(ii) কয়েকজনের শাসন (Rule by few) ঃ রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা পরিচালনার দায়িত্ব একজনের পরিবর্তে কয়েকজন ব্যক্তির হাতে ন্যস্ত থাকলে এবং তা জনসাধারণের মঙ্গল বিধানের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হলে তাকে অভিজাততন্ত্র বলে। অর্থাৎ মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যক্তির স্বাভাবিক শাসনই হল অভিজাততন্ত্র। কিন্তু এ শাসনব্যবস্থা শুধুমাত্র শাসকশ্রেণির মুষ্টিমেয় কয়েকজনের স্বার্থ সাধনে পরিচালিত হলে তা কতিপয়তন্ত্র (Oligarchy) হিসেবে গণ্য হয়। অর্থাৎ মুষ্টিমেয় কয়েক ব্যক্তির বিকৃত শাসনই হল কতিপয়তন্ত্র।

(iii) বহুজনের শাসন (Rule by many) ঃ রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা বহুজনের হাতে ন্যস্ত থাকলে এবং সর্বসাধারণের কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হলে, এরিস্টটলের মতে তা হল ন্যায়তন্ত্র। সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সকল নাগরিকের অংশগ্রহণ থাকলে ন্যায়তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এরিস্টটলের মতে এর বিকৃতিরূপ হচ্ছে গণতন্ত্র। গণতন্ত্রে ক্ষমতা বহুজনের হাতে ন্যস্ত থাকে। কিন্তু এ ব্যবস্থাতে ক্ষমতা সামাজিক ন্যায়পরায়ণতা প্রতিষ্ঠার স্বার্থে পরিচালিত না হয়ে শুধুমাত্র শাসক সম্প্রদায়ের স্বার্থে পরিচালিত হয়।

পূর্বোক্ত দু'টি মূল নীতির ভিত্তিতে এরিস্টটল ছয় প্রকার শাসনব্যবস্থা বা সরকারের কথা বলেছেন।

এরিস্টটল প্রদত্ত সরকারের শ্রেণিবিভাগ

সংখ্যা নীতি	উদ্দেশ্য নীতি	
শাসকের সংখ্যা	স্বাভাবিক রূপ	বিকৃত রূপ
একজনের শাসন	রাজতন্ত্র	স্বৈরতন্ত্র
কয়েকজনের শাসন	অভিজাততন্ত্র	কতিপয়তন্ত্র
বহুজনের শাসন	ন্যায়তন্ত্র	গণতন্ত্র

এরিস্টটল এর সরকারের শ্রেণিবিভাগের সীমাবদ্ধতা

এরিস্টটলের শ্রেণিবিভাগ প্রাচীনকালে গ্রহণযোগ্যতা পেলেও আধুনিক কালে গ্রহণযোগ্য হয় না। মধ্যযুগের পর থেকে এ শ্রেণিবিভাগের বিরুদ্ধে নানা রকম বিরূপ সমালোচনা শুরু হয়। বিশেষ করে রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে পার্থক্য না করা, সংখ্যার ভিত্তিতে শ্রেণিবিভাগ, গণতন্ত্র সম্পর্কে বিরূপ ধারণা, অবৈজ্ঞানিক ও অসম্পূর্ণ শ্রেণিবিভাগ বলে অনেক পন্ডিত মত পোষণ করেন।

সরকারের আধুনিক রূপ

এরিস্টটলের পরেও সরকারের শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কিত আলোচনা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে রোমের পলিবিয়াস (Polybius) ও সিসেরো (Cicero)-র নাম উল্লেখ করা যায়। এছাড়া এরিস্টটলের দৃষ্টিভঙ্গিকে মোটামুটি অনুসরণ করে যাঁরা বিভিন্ন সময়ে সরকারের শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন জ্যাঁ বোঁদা (Jean Bodin), চার্লস মন্টেস্কু (Charles Montesquieu), টমাস হবস (Thomas Hobbes), জন লক (John Locke), জন বার্জেস (John Burgess), জোহান ব্লুন্টসলি (Johan Bluntschlli) প্রমুখ।

ম্যারিয়ট এর সরকারের শ্রেণিবিভাগ

সরকারের আধুনিক শ্রেণিবিভাগ প্রসঙ্গে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ম্যারিয়ট (John A. R. Marriott)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ম্যারিয়টের শ্রেণিবিভাগ আধুনিক ও বিস্তৃত। মূলত তিনটি ভিত্তিতে তিনি সরকারের শ্রেণিবিভাগ করেছেন।

১। ক্ষমতার আঞ্চলিক বণ্টনের বিচারে ম্যারিয়ট সরকারকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। এ দু'টি ভাগ হল ঃ এককেন্দ্রিক (Unitary) সরকার ও যুক্তরাষ্ট্রীয় (Federal) সরকার।

২। সংবিধান সংশোধন পদ্ধতির বিচারে তিনি সরকারকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। এ দুটি ভাগ হল ঃ সুপরিবর্তীয় (Flexible) সরকার এবং দুষ্পরিবর্তনীয় (Rigid) সরকার।

৩। আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের মধ্যে সম্পর্কের ভিত্তিতে তিনি তিন ধরনের সরকারের কথা বলেছেন ঃ স্বৈরতন্ত্র (Despotic), সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ পরিচালিত (Parliamentary or cabinet form) এবং রাষ্ট্রপতি শাসিত (Presidential)। কোন শাসন ব্যবস্থাতে শাসন বিভাগের সর্বোচ্চ নির্বাহীর নিয়ন্ত্রণহীন প্রাধান্য থাকলে তাকে স্বৈরতন্ত্র বলে। যে ব্যবস্থাতে আইন বিভাগের প্রাধান্য থাকে তাকে পার্লামেন্টারি বা সংসদীয় সরকার বলে। আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের মধ্যে সম্পর্ক সম্পূরক হলে তাকে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার বলে।

তবে ম্যারিয়টের শ্রেণিবিভাগও পুরোপুরি মেনে নেওয়া যায় না। এ শ্রেণিবিভাগও সম্পূর্ণ নয়। তিনি গণতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র, রাজতন্ত্র প্রভৃতির কথা বলেননি।

লীকক্ এর সরকারের শ্রেণিবিভাগ

ম্যারিয়টকে অনুসরণ করে স্টিফেন লিকক (Stephen Leacock) সরকারের যে শ্রেণিবিভাগ করেছেন তা আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের স্বীকৃতি লাভ করেছে। তিনটি মূলনীতির ভিত্তিতে এ শ্রেণিবিভাগ করা হয়। এ তিনটি নীতি হল ঃ

১। সার্বভৌম ক্ষমতা ব্যবহারকারী সংস্থা নির্ধারণ।

২। আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের মধ্যে সম্পর্কের প্রকৃতি।

৩। শাসন ক্ষমতার আঞ্চলিক বণ্টন নীতি।

লীকক্ সরকারকে প্রধানত দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন, গণতন্ত্র এবং স্বৈরতন্ত্র বা একনায়কতন্ত্র। গণতন্ত্রকে তিনি আবার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ এ দু'শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। পরোক্ষ গণতন্ত্রকে আবার তিনি দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র (Constitutional Monarchy) এবং প্রজাতন্ত্র (Republic)। ক্ষমতার বণ্টনের বিচারে এদের উভয়কে তিনি দু'ভাবে বিভক্ত করেছেন, এককেন্দ্রিক (Unitary) এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় (Federal)। আবার ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির ভিত্তিতে এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার উভয়ের দু'টি রূপের কথা বলেছেন ঃ পার্লামেন্ট বা মন্ত্রিপরিষদ পরিচালিত (Parliamentary or Cabinet) এবং রাষ্ট্রপতি শাসিত (Presidential) সরকার।

লীককে অনুসরণ করে সরকারের শ্রেণিবিভাগ ব্যবস্থাটিকে নিম্নলিখিত ছকের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়।

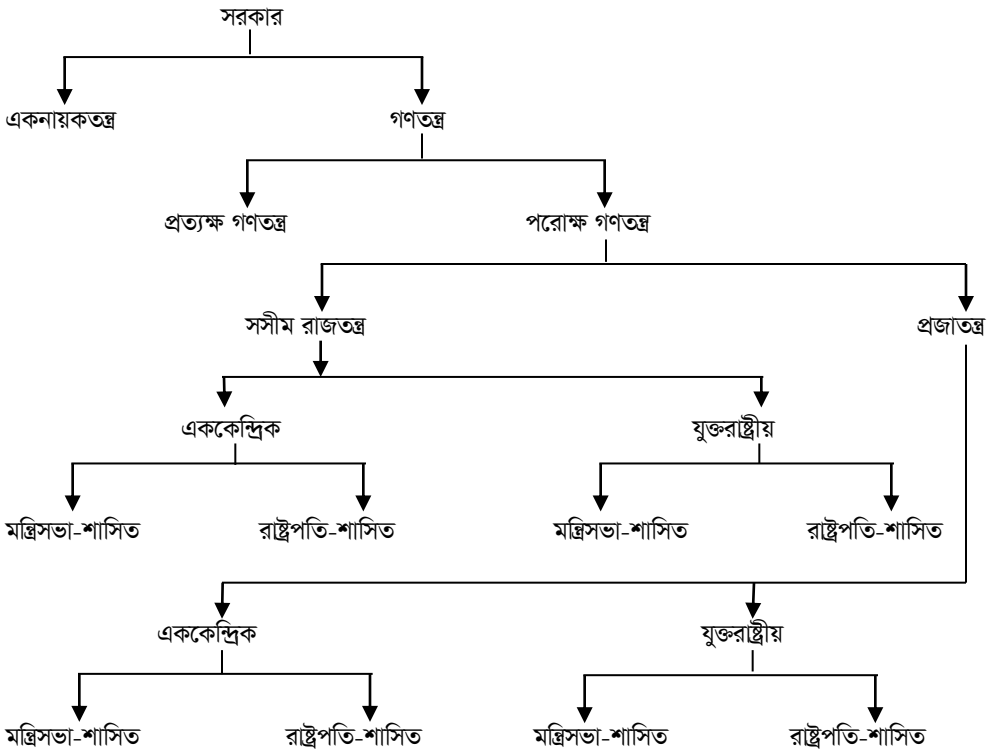

লীককের শ্রেণিবিভাজনকেও সর্বতোভাবে গ্রহণ করা যায় না। তিনি স্বৈরতন্ত্র এবং একনায়কতন্ত্রকে সমার্থক গণ্য করেছেন। স্বৈরতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের উপ-বিভাগ সম্পর্কে কোন মতামত ব্যক্ত করেন নি। এ কারণেই লীককের শ্রেণিবিভাজনের কার্যকারিতা সম্পর্কে আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ কিছুটা সংশয় প্রকাশ করেন।

আধুনিক সরকার

সরকারের শ্রেণিবিভাজনের আধুনিক কাঠামোটি আরো ব্যাপক। বিভিন্ন মতবাদের সারাংশ সংগ্রহ করে এ ধারণা গড়ে তোলা হয়েছে। শ্রেণিবিভাজনের এ প্রকল্প অনুযায়ী সরকারকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। যেমন ঃ স্বৈরতন্ত্র (Autocracy), একনায়কতন্ত্র (Dictatorship) এবং গণতন্ত্র (Democracy)। স্বৈরতন্ত্রের বিভিন্ন রূপ রয়েছে– রাজতন্ত্র (Monarchy), সামরিকতন্ত্র (Military rule) এবং অভিজাত তন্ত্র (Aristocracy)। একনায়কতন্ত্র তিন ধরনের– ব্যক্তিগত (Personal), দলগত (Party Dictatorship) এবং শ্রেণিগত একনায়কতন্ত্র (Class Dictatorship)।

গণতন্ত্র একটি ব্যাপক ধারণা। নানাভাবে এবং নানাধরণে তার প্রকাশ ঘটে। গণতন্ত্রকে ব্যাপক অর্থে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথা, সীমিত বা নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র (Limited or constitutional Monarchy) এবং প্রজাতন্ত্র (Republic)। এদের আবার ক্ষমতা বণ্টন অনুযায়ী এককেন্দ্রিক এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে ভাগ করা যায়। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি অনুযায়ী এককেন্দ্রিক এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারকে মন্ত্রিসভা-চালিত এবং রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারে ভাগ করা যেতে পারে। সরকারের আধুনিক শ্রেণিবিভাগ নিম্নে একটি রেখাচিত্রের সাহায্যে বণ্টন করা হল ঃ

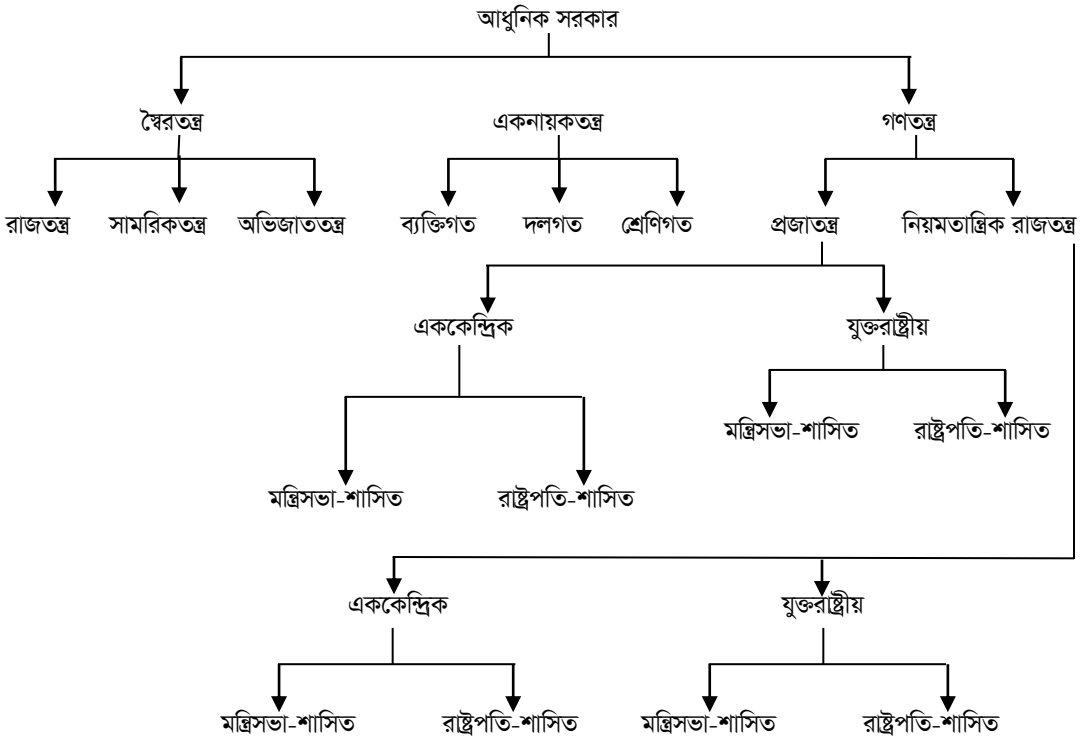

সরকারের শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে পরবর্তীকালে নতুন উপাদান সংযোজিত হয়েছে। রাজনৈতিক আচরণবাদী এবং মার্কসবাদীগণ নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রেণিবিভাজনের বিষয়ে আলোচনা করেছেন। আচরণবাদীগণ সরকারের পরিবর্তে রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিশ্লেষণের পক্ষে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	স্টিফেন লীকক প্রদত্ত সরকারের শ্রেণিবিভাগ দেখান।

সার-সংক্ষেপ

রাষ্ট্র একটি বিমূর্ত ধারণা। রাষ্ট্রের চারটি উপাদানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল সরকার। সরকারের মাধ্যমে রাষ্ট্রের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক সরকার পদ্ধতি ছাড়াও আরো কয়েকটি সরকার পদ্ধতি রয়েছে। এগুলোর মধ্যে একনায়কতন্ত্র, রাজতন্ত্র, এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। রাষ্ট্রের উপাদান কয়টি?

(ক) ২ (খ) ৩

(গ) ৪ (ঘ) ৫

২। 'সরকার হচ্ছে রাষ্ট্রের একটি যন্ত্র বা সংস্থা'– উক্তিটি কে করেছেন?
(ক) অধ্যাপক গার্নার (খ) অধ্যাপক গেটেল
(গ) অধ্যাপক লাস্কি (ঘ) অধ্যাপক উইলোবি

৩। 'The Politics' গ্রন্থের লেখক কে?
(ক) সক্রেটিস (খ) প্লেটো
(গ) এরিস্টটল (ঘ) আলেকজান্ডার

৪। 'The Republic' গ্রন্থের লেখক কে?
(ক) প্লেটো (খ) এরিস্টটল
(গ) লাস্কি (ঘ) গেটেল

৫। এরিস্টটল কয়টি দেশের সংবিধান পর্যালোচনা করে সরকারের শ্রেণি বিভাগ করেছেন?
(ক) ১৪৮ (খ) ১৫০
(গ) ১৫৪ (ঘ) ১৫৮

৬। এরিস্টটল কয়টি মূলনীতির পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের শ্রেণিবিভাগ করেছেন?
(ক) ২ (খ) ৪
(গ) ৬ (ঘ) ৮

৭। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ম্যারিয়ট সরকারের কয়টি শ্রেণিবিভাগ করেছেন?
(ক) ২ (খ) ৩
(গ) ৪ (ঘ) ৫

৮। এরিস্টটলের মতে নিকৃষ্টতম সরকার কোনটি?
(ক) মধ্যতন্ত্র (খ) রাজতন্ত্র
(গ) গণতন্ত্র (ঘ) কতিপয়তন্ত্র

৯। লীকক্ সরকারকে কতটি ভাগে ভাগ করেছেন?
(ক) ২ (খ) ৪
(গ) ৬ (ঘ) ৮

পাঠ-৭.২ গণতন্ত্রের সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা (Merits and Demerits of Democracy)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- গণতন্ত্রের সুবিধাগুলি সম্পর্কে বলতে করতে পারবেন।
- গণতন্ত্রের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা, সুশাসন, বিপ্লব, আইনের অনুশাসন, পুঁজিবাদ।

গণতন্ত্রের সুবিধাসমূহ

বর্তমান সময়ে গণতন্ত্র সর্বোৎকৃষ্ট শাসনব্যবস্থা হিসেবে বিবেচিত হয়। গণতন্ত্রের গুণ বা সপক্ষে সাধারণত নিম্নলিখিত যুক্তিগুলো প্রদর্শন করা হয় ঃ

১। **সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা ঃ** 'সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা' এই তিনটি আদর্শের ওপর ভিত্তি করে গণতন্ত্রের ইমারত দাঁড়িয়ে থাকে। গণতন্ত্রে সকলেই সমান, সমানাধিকার নীতিটি শুধু তত্ত্বগতভাবে নয়, বাস্তবেও গৃহীত হতে দেখা যায়। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ধনী-দরিদ্র, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই আইনের চোখে সমান এবং সকলেই আইন কর্তৃক সমভাবে সংরক্ষিত হওয়ার সুযোগ পায়।

২। **দেশপ্রেম জাগরিত হয় ঃ** গণতন্ত্র জনগণের মধ্যে দেশপ্রেম জাগ্রত করতে পারে। কারণ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় প্রত্যেকেই অংশগ্রহণ করতে পারে এবং সকলের স্বার্থ সমভাবে রক্ষিত হয়।

৩। **সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও সার্বিক কল্যাণ সাধন সম্ভব ঃ** জেরেমি বেন্থাম (Jeremy Bentham)-এর মতে শাসক ও শাসিতের স্বার্থের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে সর্বাধিক জনগণের সর্বাধিক মঙ্গল সাধন করাটাই হল সুশাসনের প্রধান চ্যালেঞ্জ। শাসিতকে শাসকের পদে উন্নীত করা সম্ভব হলে এ সমস্যার সমাধান করা সহজ হয়। একমাত্র গণতন্ত্রেই শাসিত শাসকের পদে অধিষ্ঠিত হতে পারে এবং এর মাধ্যমে সর্বাধিক জনকল্যাণ সাধিত হতে পারে।

৪। **স্থায়িত্ব ঃ** অনেকের মতে, স্থায়িত্ব হল গণতন্ত্রের অন্যতম উল্লেখযোগ্য গুণ। জনগণের সম্মতির উপর এরূপ শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত বলে সরকারের প্রতি জনগণ অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতা প্রদর্শন করে।

৫। **সরকারের স্বৈরাচারিতা রোধ করে ঃ** গণতন্ত্র জনমত পরিচালিত শাসনব্যবস্থা বলে সরকার জনমতের ভয়ে সাধারণত স্বৈরাচারী হতে পারে না।

৬। **বিপ্লবের সম্ভাবনা কম ঃ** জনগণের হাতে সরকার পরিবর্তনের ক্ষমতা থাকায় জনগণের অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হয়ে রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের আকার ধারণ করতে পারে না।

৭। **রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধির সহায়ক ঃ** গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় ধনী-দরিদ্র, অভিজাত-অভাজন, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক এবং সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শাসনকার্য পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারে।

৮। **দায়িত্বশীলতা ঃ** গণতন্ত্রকে বলা হয় দায়িত্বশীল সরকার। শাসিতের সম্মতিতে যেহেতু গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত এবং শাসনকার্য পরিচালিত হয় তাই গণতন্ত্র জনগণের নিকট দায়িত্বশীল থাকে। এখানে সরকার মন্ত্রিপরিষদ শাসিত কিংবা রাষ্ট্রপতি শাসিত হোক না কেন জনগণের দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারে না।

৯। **আইনের শাসন ঃ** সুশাসনের অন্যতম উপদান হল আইনের শাসন (Rule of law)। আইনের শাসন নীতিটি হল জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের আইনের সমান অধিকার লাভ করা। আইনের শাসন যদি মেনে চলা না হয় তাহলে সে রাষ্ট্রের শান্তি-স্থিতিশীলতা নষ্ট হয়ে যায়।

পরিশেষে বলা যায় যে, গণতন্ত্রে সকল জনগণের অংশগ্রহণ থাকে বিধায় এ ব্যবস্থার অধীনে তাদের মধ্যে দেশপ্রেম জাগ্রত হয়। এখানে ব্যক্তির মর্যাদা বৃদ্ধি পায়, গণতন্ত্রের মাধ্যমে মানুষ রাজনৈতিক শিক্ষা লাভ করে। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা শাসন ক্ষমতা পরিচালনা করে বিধায় নানাবিধ সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও বেশিরভাগ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী গণতন্ত্রকেই সর্বোৎকৃষ্ট শাসন ব্যবস্থা মনে করেন।

গণতন্ত্রের সীমাবদ্ধতা

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার পক্ষে নানা প্রকার যুক্তি-তর্কের অবতারণা করা হলেও বিরুদ্ধবাদিগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এর সমালোচনা করেন। নিম্নে গণতন্ত্রের কয়েকটি সীমাবদ্ধতা আলোচনা করা হল ঃ

১। **অদক্ষদের শাসন ঃ** গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হয়। কিন্তু অনেক দেশে জনগণের বিপুল অংশ নানাবিধ অজ্ঞতা, অজ্ঞানতা, কুসংস্কারগ্রস্ত থাকে। এ ধরনের জনসমাজের মধ্য থেকে উঠে আসা জনপ্রতিনিধিদের অনেকের মধ্যেও, এসব দুর্বলতা বিরাজ করে।

২। **স্থায়িত্বের অভাব ঃ** হেনরী মেইনের মতে, স্থায়িত্বের অভাব গণতন্ত্রের অন্যতম প্রধান ত্রুটি। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, জনগণ কর্তৃক পরিচালিত শাসনব্যবস্থায় পরস্পর বিরোধী স্বার্থের দ্বন্দ্ব থাকার ফলে শাসনকার্য যথাযথভাবে পরিচালনা করা সরকারের পক্ষে সম্ভব হয় না।

৩। **আমলাদের প্রাধান্য বৃদ্ধি ঃ** গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনপ্রতিনিধিবর্গ সরকার গঠন করলেও শাসনকার্য পরিচালনার জন্য যে বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁদের সে জ্ঞান থাকে না। ফলে স্বাভাবিকভাবেই আমলাদের ওপর তাঁদের অত্যধিক পরিমাণে নির্ভর করতে হয়। কিন্তু আমলাদের প্রাধান্য বৃদ্ধির অর্থই হল দীর্ঘসূত্রতা এবং জনস্বার্থ উপেক্ষিত হওয়া।

৪। **সৎ ও যোগ্য ব্যক্তির স্থান নেই ঃ** অনেকের মতে, গণতন্ত্রে সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিদের স্থান নেই। এরূপ শাসনব্যবস্থায় দলীয় রাজনীতির প্রাধান্য থাকায় সৎ ও যোগ্য অথচ রাজনীতি-বিমুখ ব্যক্তিরা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে সম্মত হন না।

৫। **দলীয় শাসনের কুফল ঃ** দল প্রথা গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলোর রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের দ্বন্দ্ব অনেক সময় সংঘর্ষে রূপান্তরিত হয়ে দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্ট করে।

৬। **পুঁজিবাদকে প্রশ্রয় দেয় ঃ** অনেকে গণতন্ত্রকে 'পুঁজিবাদীদের দুর্গ' বলে অভিহিত করেন। তাঁদের মতে, পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে গণতন্ত্র রাজনৈতিক এবং কিছু পরিমাণে সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার কথা চিন্তা করলেও অর্থনৈতিক সাম্যের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করে না।

৭। **সংখ্যালঘুর স্বার্থ উপেক্ষিত হয় ঃ** অনেকের মতে, গণতন্ত্র সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন হওয়ার কারণে সংখ্যালঘিষ্ঠরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে আইনসভায় প্রতিনিধি প্রেরণ করতে পারে না। এভাবে তাদের স্বার্থ ক্রমাগত উপেক্ষিত হয়।

৮। **ব্যয়বহুল ঃ** অনেকে গণতন্ত্রকে ব্যয়বহুল শাসনব্যবস্থা বলে সমালোচনা করেন। জনমত গঠন, নির্বাচন অনুষ্ঠান, প্রচারকার্য প্রভৃতির পেছনে গণতন্ত্রে বিপুল পরিমাণ অর্থের অপচয় হয়।

৯। **জরুরি অবস্থার পক্ষে অনুপযোগী ঃ** গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে প্রতিটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় বলে বহি:শত্রুর আক্রমণ, কিংবা বড় ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঘটনায় জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষে তা অনেক সময় অনুপযোগী বলে বিবেচিত হয়।

১০। **রক্ষণশীল শাসনব্যবস্থা ঃ** জনপ্রিয়তা ধরে রাখায় অনেক মনোযোগ দিতে হয় বিধায় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনপ্রতিনিধিরা গতানুগতিকতার উর্ধ্বে উঠতে পারে না।

১১। দীর্ঘসূত্রিতা ঃ অনেকে মনে করেন যে, গণতন্ত্রে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় সরকার বিভিন্ন বিভাগের সাথে পরামর্শ করে থাকে। এ পরামর্শ বা মতামত থেকে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে অনেক সময় ব্যয় হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে যেসব যুক্তির অবতারণা করা হয় তাদের অনেকগুলো ভিত্তিহীন এবং কল্পনা-প্রসূত বলে মনে করা হয়। লর্ড ব্রাইসের মতে, গণতন্ত্র হয়তো বিশ্বমানবের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ জাগরিত করতে পারেনি, হয়তো শ্রেষ্ঠ শিক্ষিত মনকে রাষ্ট্রের কার্যে নিয়োগ করতে সমর্থ হয়নি, হয়তো রাজনীতিকে ত্রুটি মুক্ত করতেও ব্যর্থ হয়েছে, তথাপি একথা সত্য যে, অন্যান্য শাসনব্যবস্থার তুলনায় আজকের গণতন্ত্র নিজেকে অনেকটাই সাধারন মানুষের মনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	গণতন্ত্রের সীমাবদ্ধতার একটি তালিকা তৈরি করুন।

সার-সংক্ষেপ

গণতন্ত্রকে অনেকে অক্ষম ও অশিক্ষিতের শাসন বলে থাকে। এ ধরনের শাসন ব্যবস্থায় দলীয় শাসন প্রতিফলিত হয় বলেও অভিযোগ রয়েছে। তবে বর্তমান সময়ে গণতন্ত্রকে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় শাসনব্যবস্থা। গণতন্ত্রে জনগণের মতের প্রতিফলন হয়ে থাকে। গণতন্ত্রের মাধ্যমেই রাষ্ট্রে আইনের অনুশাসন, ন্যায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠা সম্ভব। এর মাধ্যমে দেশপ্রেম জাগ্রত হয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সাংবিধানিক উপায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও জনগণের সার্বিক কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন

১। গণতান্ত্রিক শাসনে বিপ্লবের সম্ভাবনা কেমন?
- ক) কম
- খ) বেশি
- গ) একেবারেই নেই
- ঘ) কোনটিই নয়

২। গণতন্ত্র সরকারের স্বৈরাচারিতার সম্ভাবনা-
- ক) বাড়ায়
- খ) কমায়
- গ) সম্পূর্ণ দূর করে
- ঘ) কোনটিই নয়

৩। জরুরি অবস্থাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা-
- ক) সুবিধাজনক
- খ) অসুবিধাজনক
- গ) লাভজনক
- ঘ) কোনটিই নয়

৪। গণতন্ত্র পুঁজিবাদের-
- ক) সহায়ক
- খ) শত্রু
- গ) প্রতিবন্ধক
- ঘ) কোনটিই নয়

পাঠ-৭.৩ একনায়কতন্ত্রের গুণাবলি ও সমস্যা (Merits and Demerits of Dictatorship)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- একনায়কতন্ত্রের গুণাবলি সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- একনায়কতন্ত্রের কুফলগুলি সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	একনায়কতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, সুদক্ষ শাসনব্যবস্থা, স্থিতিশীল সরকার, আমলাতন্ত্র, সামরিক শাসন।

একনায়কতন্ত্রের গুণাবলি

একনায়কতন্ত্রের সমর্থককেরা তাঁদের সমর্থিত শাসনব্যবস্থার উৎকর্ষ প্রমাণ করার জন্য নানা প্রকার যুক্তির অবতারণা করেন। একনায়কতন্ত্রের অন্যতম গুণ হল তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ। তবে আরো অন্যান্য যে গুণাবলি রয়েছে তা নিম্নে আলোচনা করা হল ঃ

১। **সুদক্ষ শাসনব্যবস্থা ঃ** একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রকৃতিগতভাবে সুদক্ষ হয়। কেননা, সুযোগ্য নায়কের একক নির্দেশে শাসন কার্যাদি পরিচালিত হয়। একনায়ক সুযোগ্য ও সুদক্ষ হওয়ার জন্য দেশের ভিন্নমুখী জটিল সমস্যাসমূহের দ্রুত সমাধান সম্ভব।

২। **স্থায়িত্ব ঃ** একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় দেশ শাসনের জন্য একনায়ক সুযোগ্য ব্যক্তিগণের উপর সরকারি কার্য পরিচালনার দায়িত্ব বন্টন করেন। ফলে সরকারি কাজে সাফল্য আসে। তাছাড়া একনায়কতন্ত্রে একটি দল থাকায় দল ত্যাগ, রাজনৈতিক দলাদলি, বিভিন্ন স্বার্থের দ্বন্দ্ব থাকে না। ফলে একনায়কতন্ত্র স্থায়িত্ব লাভ করে।

৩। **জাতীয়তাবাদ ঃ** একনায়কতন্ত্রের মূল কথা হল– এক জাতি, এক রাষ্ট্র এবং এক নায়ক। একনায়ক দেশের জনগণের মধ্যে জাতীয় শ্রেষ্ঠত্বের কথা প্রচার করে জাতীয় ঐক্যবোধ জাগরিত করেন। জনগণ দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়। হিটলার জার্মান জাতির শ্রেষ্ঠত্বের কথা প্রচার করে জনগণের মধ্যে জাতীয়তাবাদ সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

৪। **জরুরি অবস্থার পক্ষে উপযোগী ঃ** যুদ্ধ, বহিরাক্রমণ, গোলযোগ প্রভৃতি জরুরি অবস্থার মোকাবেলা করার জন্য দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সেগুলো কার্যকরী করার ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজন। একনায়কতন্ত্রে একনায়কের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। তাই জরুরি অবস্থার পক্ষে একনায়কতন্ত্র বিশেষ উপযোগী বলে মনে করা হয়।

৫। **দলীয় প্রভাব মুক্ত ঃ** একনায়কতন্ত্রে একটি মাত্র রাজনৈতিক দল থাকে। তাই এ শাসনব্যবস্থায় দলীয় কোন্দল, দলীয় সংঘর্ষ ও দলীয় প্রভাব মুক্ত থাকে। একনায়কতন্ত্রে দলীয় প্রভাব মুক্ত থাকে এবং দলীয় শাসনের কুফলগুলো প্রত্যক্ষ করা যায় না।

৬। **সাংস্কৃতিক বিষয়ের উন্নতি ঃ** অনেকের মতে, এরূপ শাসনব্যবস্থায় একনায়কের ইচ্ছাই চূড়ান্ত বলে তিনি যদি শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতির অনুরাগী হন তাহলে ঐসব ক্ষেত্রে প্রভূত উৎকর্ষ সাধিত হতে পারে।

৭। **যোগ্য ও মেধাবীদের নিয়োগ ঃ** নিয়োগের ক্ষেত্রে একনায়কের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। এখানে নিয়োগের ক্ষেত্রে দলীয় চাপ, প্রভাব বা সুপারিশ না থাকায় একনায়ক প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদে মেধাবী, যোগ্য ও অভিজ্ঞ লোকদের নিয়োগ দিতে পারেন। ফলে প্রশাসকবৃন্দ সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারে।

৮। **ব্যয় সংকোচন ঃ** একনায়কতন্ত্রে একনায়ক দীর্ঘদিন যাবৎ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে। এর মাঝে কোন নির্বাচন বা উপনির্বাচনের প্রয়োজন হয় না। আর নির্বাচনের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয়ও হয় না। গণতন্ত্রসহ অন্যান্য সরকার ব্যবস্থায় প্রচুর অর্থ শুধু নির্বাচনের পিছনেই ব্যয় হয়ে থাকে।

৯। **আমলাদের দৌরাত্ম্য হ্রাস ঃ** একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় এক নায়ক চাইলে যোগ্য ও মেধাবীদের প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দিতে পারেন। তারা কাজে অভিজ্ঞ ও দক্ষ। এছাড়া এ শাসনব্যবস্থায় একনায়ক নিজেও অনেক সময় প্রশাসনিক ব্যাপারে অভিজ্ঞ থাকে। তাকে আমলাদের উপর নির্ভরশীল হতে হয় না। যার ফলে আমলাদের দৌরাত্ম ও প্রভাব হ্রাস পায়।

১০। **স্থিতিশীল সরকার ঃ** একনায়কতান্ত্রিক সরকার জনগণের ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত নয় যে জনগণের ইচ্ছানুসারে পরিচালিত হবে। জনগণ ইচ্ছা করলেই এ সরকারকে পরিবর্তন করতে পারে না। দীর্ঘদিন যাবত এ সরকার স্থিতিশীলভাবে সরকার পরিচালনা করে থাকে।

পরিশেষে বলা যায় যে, একনায়কতন্ত্রে একনায়ক যে কোন বিষয়ে একক ও দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। একনায়ক দীর্ঘদিন রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে থাকেন বিধায় তিনি অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অর্জন করেন। একনায়ক দলীয় প্রভাব মুক্ত থেকে দেশকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে শাসন করতে পারেন।

একনায়কতন্ত্রের সমস্যা

একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সামগ্রিক জনগোষ্ঠীর মতামতের কোন স্থান নেই এবং এখানে জনমত কোন প্রভাব বিস্তার করে না। একনায়কতন্ত্রের সমর্থক ও সুবিধাভোগীরা এই ব্যবস্থার নানাবিধ গুণ চিহ্নিত করলেও, বস্তুত এটি একটি সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ধ্বংসকারী ব্যবস্থা। নিম্নে একনায়কতন্ত্রের দোষাবলীর আলোচনা করা হল ঃ

১। **ব্যক্তিস্বাধীনতা পরিপন্থী ঃ** এরূপ শাসনব্যবস্থায় জনগণের স্বাধীনতার কোন মূল্য নেই। এখানে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ঘটে না। আত্মসম্মান ও আত্মপ্রত্যয়বোধ জাগ্রত হয় না।

২। **বাহুবলের উপর নির্ভরশীল ঃ** একনায়কতন্ত্রের ভিত্তি হল বাহুবল। শক্তির জোরে, বল প্রয়োগের দ্বারা নায়ক তাঁর শাসনকে স্থায়িত্ব দেয়ার চেষ্টা করেন। বিরোধীদের কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য নির্বাসন, কারাদন্ড, এমনকি গুপ্তহত্যার আশ্রয় নিতেও তিনি কুণ্ঠিত হন না।

৩। **বিশ্ব শান্তির পরিপন্থী ঃ** একনায়কতন্ত্রের অন্যতম তত্ত্ব হল পৃথিবীতে বাঁচার অধিকার কেবল শক্তিমানেরই আছে। মুসোলিনীর মতে, আন্তর্জাতিক শান্তি হল কাপুরুষের স্বপ্ন; সাম্রাজ্যবাদ হল জীবনের শাশ্বত এবং অপরিবর্তনীয় নিয়ম।

৪। **বিপ্লবের আশংকা ঃ** এরূপ শাসনব্যবস্থায় জনমতের কোন মূল্য থাকে না। শাসিতের সম্মতির উপর শাসকের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় না। তাদের দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত অসন্তোষ একদিন বিপ্লবের আকার ধারণ করে এরূপ শাসনব্যবস্থার ধ্বংস সাধন করে।

৫। **সাম্য বিরোধী ঃ** একনায়কতন্ত্র সাম্য ও সমানাধিকারের নীতিতে আস্থাশীল নয়। তাই এরূপ শাসনব্যবস্থা মুষ্টিমেয় ব্যক্তি দেশ শাসন করে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে বিনা প্রতিবাদে তাদের সেই স্বৈরাচারী জনস্বার্থ বিরোধী শাসন অবনত মস্তকে মেনে নিতে হয়।

৬। **রাজনৈতিক চেতনা অবরুদ্ধ ঃ** এরূপ শাসনব্যবস্থায় একটি মাত্র রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব থাকায় জনগণ অন্য কোন দলের প্রতি তাদের সমর্থন জানানোর সুযোগ পায় না। ফলে জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটে না। সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক চেতনা হয়ে পড়ে অবরুদ্ধ।

৭। **উপেক্ষিত সাধারণ জনগোষ্ঠী ঃ** একনায়কতন্ত্রের রাষ্ট্রই প্রধান; মানুষের কোন মূল্য নেই। একনায়কতন্ত্র প্রচার করে যে, জন্ম থেকেই ব্যক্তি রাষ্ট্রের যূপকাষ্ঠে বলিপ্রদত্ত। সাধারণ জনগোষ্ঠীকে উপেক্ষিত করে বোঝানো হয় যে রাষ্ট্রের জন্য ব্যক্তি; ব্যক্তির জন্য রাষ্ট্র নয়।

৮। **স্বায়ত্তশাসন অস্বীকৃত ঃ** একনায়কতন্ত্র মানুষের স্বায়ত্তশাসনকে উপেক্ষা করে বলে তা কখনই সমর্থনযোগ্য হতে পারে না। একনায়কতন্ত্র যতই সুশাসন ব্যবস্থা হোক না কেন, তা কখনই স্বায়ত্তশাসনের বিকল্প হতে পারে না।

৯। **অস্থায়ী শাসনব্যবস্থা ঃ** একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় একনায়কের হাতে সর্বময় ক্ষমতা থাকে। রাষ্ট্র পরিচালনার সার্বিক দায়িত্ব তিনিই পালন করেন। এ শাসন ব্যবস্থায় মাত্র একজন ব্যক্তির হাতে সর্বময় ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে। ফলে তার মৃত্যুর সাথে সাথে এ শাসনব্যবস্থার অবসান ঘটে। এজন্য এই শাসনব্যবস্থাকে অস্থায়ী শাসনব্যবস্থা বলা হয়ে থাকে।

১০। **দুর্নীতির প্রসার ঃ** একনায়কতন্ত্রে সীমাহীন দুর্নীতির জন্ম হয়। কারও নিকট জবাবদিহি করতে হয় না বলে একনায়ক চরম দুর্নীতির সাথে জড়িয়ে পড়ে। লর্ড এ্যাকটন বলেন, "Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely".

পরিশেষে বলা যায় যে, একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনগণের স্বাধীনতা অবরুদ্ধ থাকে। তাদের মতামতের কোন মূল্য নেই, এখানে ব্যক্তিস্বাধীনতা খর্ব হয়। একনায়কের মুখাপেক্ষী হয়ে সাধারণ জনগোষ্ঠীর জীবন পরিচালিত হয়। একনায়কের আদেশই আইন; আইনের অনুশাসন এখানে অনুপস্থিত।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	একনায়কতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা জনগণ কেন মেনে নেয় না?

সার-সংক্ষেপ

একনায়কতন্ত্র গণতন্ত্রের বিপরীত শাসন ব্যবস্থা। একজন ব্যক্তি যখন দেশের যাবতীয় শাসন ক্ষমতা করায়ত্ত করে অপ্রতিহতভাবে প্রয়োগ করে তখনই সেই শাসন ব্যবস্থাকে একনায়কতন্ত্র বলে। সাধারণত কোন ব্যক্তি বা সমরনায়ক জনগণের নামে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বলপূর্বক ক্ষমতা অধিকার করেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তাদের শাসন জনগণের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয় বিধায়, সমস্ত বিরোধী মতামতকে শক্তি বা বল প্রয়োগের দ্বারা দমন করতে একনায়ক দ্বিধা করেন না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন

১। হিটলার কোন দেশের একনায়ক ছিলেন?
(ক) স্পেন (খ) জার্মানী
(গ) ইংল্যান্ড (ঘ) ইতালী

২। "Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely"–কে বলেছেন?
(ক) ফোর্ড (খ) ব্যানারম্যান
(গ) ফাইনার (ঘ) লর্ড অ্যাকটন

৩। ইতালিতে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন কে?
(ক) ফ্রাঙ্কো (খ) হিটলার
(গ) গাদ্দাফি (ঘ) মুসোলিনী

৪। সর্বাত্মকবাদের প্রশ্রয় দেওয়া হয় কোথায়?
(ক) একনায়কতন্ত্র (খ) গণতন্ত্র
(গ) রাজতন্ত্র (ঘ) সমাজতন্ত্র

পাঠ-৭.৪ গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র (Democracy and Dictatorship)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের পার্থক্য বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	ব্যক্তি স্বাধীনতা, বিশ্ব শান্তি, উগ্রজাতীয়তাবাদ, স্বায়ত্তশাসন, সর্বাত্মকবাদ, বিপ্লব, সাম্য, গুপ্তহত্যা।

গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য

গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র দুটি পরস্পর-বিরোধী রাজনৈতিক আদর্শ। স্বাভাবিকভাবেই গণতান্ত্রিক ও একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার মধ্যে সর্বক্ষেত্রেই পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। পার্থক্যগুলোকে বৈশিষ্ট্য ও গুণগত দিক থেকে নিম্নে আলোচনা করা হল ঃ

১। **শাসনের ক্ষেত্রে ঃ** গণতন্ত্র হল জনগণের শাসন এবং একনায়কতন্ত্র এক ব্যক্তি বা দলের শাসন। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু একনায়কতন্ত্রে জনমতের কোন মূল্য নেই। একনায়কতন্ত্রে জনগণ শাসনকার্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে না। এখানে একজন মাত্র শাসকের অপ্রতিহত প্রাধান্য সর্বত্রই বিদ্যমান থাকে।

২। **দলীয় ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ঃ** গণতন্ত্রে একাধিক রাজনৈতিক দল থাকে কিন্তু একনায়কতন্ত্রে একটি দল থাকে। গণতন্ত্রে একাধিক রাজনৈতিক দল অপরিহার্য। কিন্তু একনায়কতন্ত্রের একনায়কের দল ছাড়া অন্য সব দলের অস্তিত্ব বলপূর্বক বিলুপ্ত করা হয়।

৩। **ব্যক্তিস্বাধীনতার ক্ষেত্রে ঃ** গণতন্ত্র ব্যক্তিস্বাধীনতার অনুপন্থী, অপরদিকে একনায়কতন্ত্র ব্যক্তিস্বাধীনতার পরিপন্থী। জনগণের রাজনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতার স্বীকৃতি গণতন্ত্রের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। কিন্তু একনায়কতন্ত্রে মানুষের সকল প্রকার স্বাধীনতাকে অস্বীকার করা হয়। মানুষের কোন মতামতের মূল্য দেওয়া হয় না।

৪। **গণসম্মতির ক্ষেত্রে ঃ** গণতন্ত্র জনগণের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত শাসনব্যবস্থা। জনগণ ইচ্ছা করলেই সরকারের পরিবর্তন করতে পারে। কিন্তু একনায়কতন্ত্র জনসম্মতির পরিবর্তে পেশি শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এক ব্যবস্থা।

৫। **স্থায়িত্বের ক্ষেত্রে ঃ** গণতন্ত্র দলীয় শাসনব্যবস্থা বলে পরস্পর বিরোধী স্বার্থের সংঘাত, দল ত্যাগ প্রভৃতির ফলে বার বার সরকারের পরিবর্তন হয়। স্থায়িত্বের অভাব গণতন্ত্রের অন্যতম ত্রুটি। কিন্তু একনায়কতন্ত্র একদলীয় শাসন বলে দল ত্যাগ, রাজনৈতিক দলাদলি, দলভিত্তিক স্বার্থের দ্বন্দ্ব প্রভৃতি এখানে থাকে না।

৬। **বিশ্ব শান্তির ক্ষেত্রে ঃ** গণতন্ত্র বিশ্ব শান্তিতে বিশ্বাসী। সর্বপ্রকার বলপ্রয়োগ গণতন্ত্রের নীতি বিরুদ্ধ। কিন্তু একনায়কতন্ত্র উগ্র-জাতীয়তাবাদ প্রচারের মাধ্যমে বিশ্বে অশান্তি আহ্বান করে। মুসোলিনী বলতেন, "স্ত্রীলোকের নিকট মাতৃত্ব যেমন কাম্য, পুরুষের নিকট যুদ্ধও তেমনি কাম্য।"

৭। **জরুরি অবস্থার ক্ষেত্রে ঃ** গণতন্ত্রে আলাপ-আলোচনা, ভোটাভুটি প্রভৃতির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় বলে যুদ্ধ, বহিরাক্রমণ, আভ্যন্তরীণ গোলযোগ প্রভৃতি জরুরি অবস্থার ক্ষেত্রে এরূপ শাসনব্যবস্থা অনুপযোগী বলে প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু একনায়কতন্ত্রে নায়কের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত এবং সেখানে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় না বলে এরূপ শাসনব্যবস্থা জরুরি অবস্থার পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

৮। **সাম্য ও স্বাধীনতার ক্ষেত্রে ঃ** গণতন্ত্র, সাম্য, সমানাধিকার ও ব্যক্তিস্বাধীনতার নীতিসমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত। এরূপ শাসনব্যবস্থায় ধর্ম, বর্ণ, জাতি, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই সমান। কিন্তু একনায়কতন্ত্রে এসব গণতান্ত্রিক নীতি সম্পূর্ণভাবেই উপেক্ষিত হয়।

৯। **স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্রে ঃ** গণতন্ত্র জনগণের স্বায়ত্তশাসন স্বীকৃত; কিন্তু একনায়কতন্ত্রে জনগণের এ অধিকার সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত। তাই বলা হয়, একনায়কতন্ত্র যতই সুশাসন হোক না কেন, তা কখনই স্বায়ত্তশাসনের বিকল্প বলে বিবেচিত হতে পারে না।

১০। **বিপ্লবের সম্ভাবনা ঃ** গণতন্ত্রে জনগণ ব্যালটের সাহায্যে শান্তিপূর্ণভাবে সহজেই সরকারের পরিবর্তন ঘটাতে পারে। তাই এরূপ শাসনব্যবস্থা অনেকাংশে বিপ্লবের সম্ভাবনা মুক্ত বলা যেতে পারে। কিন্তু একনায়কতন্ত্রে শান্তিপূর্ণ ভাবে সরকারের পরিবর্তন সম্ভব নয়। তাই জনগণের দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত অসন্তোষ একদিন বিপ্লবের আকার ধারণ করে এরূপ শাসনব্যবস্থার ধ্বংস সাধন করে।

১১। **দলীয় শাসনের ক্ষেত্রে ঃ** গণতন্ত্র দলীয় শাসন বলে এরূপ শাসনব্যবস্থায় দলীয় সংঘর্ষ, ভোট ক্রয়-বিক্রয়, নির্বাচনে অর্থের অপচয় প্রভৃতি দলীয় শাসনের কুফলগুলো দেখা যায়। কিন্তু একনায়কতন্ত্রে একটি মাত্র রাজনৈতিক দল থাকায় এরূপ শাসনব্যবস্থায় দলীয় শাসনের কুফল প্রত্যক্ষ করা যায় না।

পরিশেষে বলা যায় যে, একনায়কতন্ত্রের চেয়ে গণতন্ত্র উত্তম শাসন ব্যবস্থা। বর্তমান বিশ্বে বেশির ভাগ রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার উপর বেশি আস্থাশীল। গণতন্ত্রের যে দোষ-ত্রুটি রয়েছে সেগুলো সমাধান করা সম্ভব। পক্ষান্তরে, একনায়কের পতন ছাড়া একনায়কতন্ত্রের দোষ-ত্রুটি সমাধান সম্ভব নয়।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের পার্থক্য নিরূপণ করুন।

সার-সংক্ষেপ

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সকল শ্রেণির মানুষ সরকারের অংশ হতে পারে। তত্ত্বগতভাবে এ ব্যবস্থাতে সকল শ্রেণির মানুষের মতামত প্রতিফলিত হয় এবং প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়। এছাড়া নিয়মিত সুষ্ঠু নির্বাচন ও রাজনৈতিক কার্যাবলিতে সকলের অংশগ্রহণের অধিকার গণতন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত। ব্যক্তি-স্বাধীনতার ভিত্তিতে গড়ে উঠা শাসনব্যবস্থাই গণতন্ত্র। অন্যদিকে, একনায়কতন্ত্র হল গণতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী শাসনব্যবস্থা। একনায়কতন্ত্র বলতে এমন শাসনব্যবস্থাকে বোঝায় যেখানে রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতা কোন একজন ব্যক্তির হাতে ন্যস্ত থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন

১। ব্যক্তি স্বাধীনতা কোথায় অস্বীকৃত?
(ক) গণতন্ত্রে (খ) একনায়কতন্ত্রে
(গ) সমাজতন্ত্রে (ঘ) রাজতন্ত্রে

২। "স্ত্রীলোকের কাছে মাতৃত্ব যেমন কাম্য, পুরুষের নিকট যুদ্ধও তেমনি কাম্য"– কে বলেছেন?
(ক) ফ্রাঙ্কে (খ) হিটলার
(গ) মুসোলিনী (ঘ) গাদ্দাফি

৩। জনগণের শাসন স্বীকৃত কোথায়?
(ক) গণতন্ত্র (খ) একনায়কতন্ত্র
(গ) রাজতন্ত্র (ঘ) কোনটিই নয়

৪। গণতন্ত্রের বিপরীত শাসনব্যবস্থা কী?
(ক) রাজতন্ত্র (খ) একনায়কতন্ত্র
(গ) অভিজাততন্ত্র (ঘ) মধ্যতন্ত্র

পাঠ-৭.৫ গণতন্ত্রের সাফল্যের শর্তাবলি
(Conditions for the Success of Democracy)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- গণতন্ত্রের সাফল্যের শর্তাবলি আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	গণতান্ত্রিক জনগণ, গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য, গণতন্ত্রের স্বরূপ, অর্থনৈতিক সাম্য, জাতীয় ঐকমত্য, জবাবদিহিতা, জনমত, গণমাধ্যম।

গণতন্ত্রের সাফল্যের শর্তাবলি

বর্তমানকালে আদর্শগতভাবে গণতন্ত্র সর্বোৎকৃষ্ট শাসন ব্যবস্থা হিসাবে বিবেচিত। এ শাসন ব্যবস্থা কার্যকর ও টেকসই করা কষ্টকর। হেনরী মেইন (Henry Maine) এ প্রসঙ্গে বলেন, "সকল ধরনের সরকারের মধ্যে গণতন্ত্র সবচেয়ে কঠিন"। গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা নানা ধরনের অভিমত ব্যক্ত করেছেন। জন স্টুয়ার্ট মিল গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য তিনটি শর্তের উল্লেখ করেন। শর্তগুলো হল এরূপ ঃ

(ক) গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা গ্রহণ করার ইচ্ছা ও সামর্থ্য জনগণের থাকা প্রয়োজন।
(খ) ব্যক্তিগত অধিকার সংরক্ষেণের জন্য জনগণকে সদাসতর্ক থাকতে হবে।
(গ) নিজ নিজ নাগরিক কর্তব্য পালন এবং অধিকার রক্ষার সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার ইচ্ছা ও সামর্থ্য জনগণের থাকতে হবে।

গণতন্ত্রের সাফল্যের অন্যান্য কতগুলো আবশ্যকীয় শর্তাবলি নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ

১। **গণতান্ত্রিক জনগণ ঃ** মিলের অভিমত ব্যাখ্যা করলে একথা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, 'গণতান্ত্রিক জনগণের' ওপর গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে। বস্তুত জনগণের মধ্যে গণতান্ত্রিক চেতনা ও ভাবধারা যতই বিস্তার লাভ করবে, গণতন্ত্র ততই সাফল্যের পথে এগিয়ে যাবে।

২। **গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ঃ** গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা ছাড়া কোন শাসন ব্যবস্থাতেই গণতন্ত্রের সাফল্য আসতে পারে না। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ চালু না থাকলে দেশের মানুষ গণতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা ও সুফল যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে পারে না।

৩। **সৎ, সুদক্ষ ও কর্তব্যপরায়ণ আমলাতন্ত্র ঃ** শাসনকার্য সুদক্ষভাবে পরিচালনার জন্য যে শিক্ষা এবং বিশেষীকৃত জ্ঞানের প্রয়োজন গণতন্ত্রে জনপ্রতিনিধিদের অনেকের তা থাকে না। তাই শাসনকার্য পরিচালনার জন্য আমলাতন্ত্রের উপর তাঁদের বিশেষভাবে নির্ভর করতে হয়। আমলারা সৎ, সুদক্ষ, কর্তব্যপরায়ণ এবং জনকল্যাণকামী মনোভাবাপন্ন না হলে গণতন্ত্র তার ঈপ্সিত লক্ষ্যে উপনীত হতে পারে না।

৪। **সহিষ্ণুতা ঃ** গণতন্ত্রে সকলেই যাতে স্বাধীনভাবে নিজ নিজ মতাদর্শ প্রচার করতে পারে, ইচ্ছানুযায়ী যেকোন আদর্শকে সমর্থন করতে পারে, সেজন্য অনুকূল পরিবেশের প্রয়োজন। এই পরিবেশ সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন আত্মসংযম এবং সহিষ্ণুতার। গণতন্ত্রে সরকার ও বিরোধী পক্ষকে সহিষ্ণু হতে হয়।

৫। **গণতান্ত্রিক শিক্ষার প্রসার ঃ** গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য সুনাগরিকের প্রয়োজন। কিন্তু সুনাগরিকতার প্রধান প্রতিবন্ধকতা হল নির্লিপ্ততা, ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা ও সংকীর্ণ দলীয় মনোভাব। এসব প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের জন্য প্রয়োজন প্রকৃত গণতান্ত্রিক শিক্ষা।

৬। **রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার ঃ** গণতন্ত্রকে সাফল্যমন্ডিত করার জন্য নাগরিকদের রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকারসমূহের শুধু তত্ত্বগত স্বীকৃতিই যথেষ্ট নয়, সেগুলোকে বাস্তবে কার্যকরি করা প্রয়োজন।

৭। **ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ ঃ** ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণকে অনেকে গণতন্ত্রের সাফল্যের অন্যতম শর্ত বলে মনে করেন। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ হলে জনগণ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে। ফলে তাদের রাজনৈতিক জ্ঞান বৃদ্ধি পায় এবং ক্ষমতা সম্পর্কে অংশীদারিত্বের বোধ জন্ম নেয়।

৮। **সুযোগ্য ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ঃ** জোসেফ শ্যুমপিটার (Joseph Schumpeter)-এর মতে গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য প্রয়োজন ন্যায়পরায়ণ, যুক্তিবাদী এবং বিবেকবান নেতৃত্ব। মনের সংকীর্ণতা দূর করে জনগণকে সুষ্ঠু পথে পরিচালিত করার জন্য সৎ ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের প্রয়োজন।

৯। **আইনের শাসন ঃ** গণতন্ত্রের সাফল্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত আইনের শাসন। এর অর্থ আইনের চোখে সবাই সমান। আইনের আশ্রয় লাভ করার অধিকার সকল নাগরিকের। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল নাগরিক আইনের সমান সুযোগ বা অধিকার লাভ করবে। আইনের শাসনের অনুপস্থিতি নির্বাচনভিত্তিক গণতন্ত্রকে অর্থহীন করে দেয়।

১০। **জবাবদিহিতা ঃ** সুশাসন কিংবা গণতন্ত্রকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক নেতৃত্বের জবাবদিহিতার সংস্কৃতি চালু থাকা আবশ্যক। রাজনৈতিক নেতৃত্বের জবাবদিহিতা থাকলে প্রশাসনসহ রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা চালু হয় যা একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রাণস্বরূপ।

১১। **দল ব্যবস্থা ঃ** রাজনৈতিক দলব্যবস্থা ছাড়া গণতন্ত্রের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। রাজনৈতিক দল জনমত গঠনের মাধ্যমে রাজনৈতিক চর্চা করে থাকে। সুসংহত ও সক্রিয় রাজনৈতিক দল না থাকলে একনায়কতন্ত্রের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

১২। **স্বাধীন ও নিরপেক্ষ গণমাধ্যম ঃ** একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে গণমাধ্যমকে স্বাধীনতা দিতে হয় এবং গণমাধ্যম যাতে নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে পারে তার সুযোগ সৃষ্টি করতে হয়। প্রচার মাধ্যমগুলোর উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ গণতন্ত্রকে বাধাগ্রস্ত করে। তাই স্বাধীন গণমাধ্যম গণতন্ত্রের সাফল্যের অন্যতম শর্ত।

পরিশেষে বলা যায় যে, কোন একক শর্ত পালনের মধ্য দিয়ে গণতন্ত্রের সাফল্য আশা করা যায় না। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ছাড়া গণতন্ত্র স্থায়ী হতে পারে না। বস্তুত: জনগণ ও শাসনকারী গোষ্ঠীর মধ্যে যে কোন একদিকে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অনুপস্থিতি থাকলে টেকসই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হতে পারে না।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার শর্তগুলো কি কি?

সার-সংক্ষেপ

বর্তমান সময়ে গণতন্ত্র হল সবচেয়ে জনপ্রিয় শাসনব্যবস্থা। অন্য যে কোন শাসন পদ্ধতি অপেক্ষা গণতন্ত্রের জনপ্রিয়তা অনেক বেশি। অনেকের মতে আদর্শগত বিচারেও গণতন্ত্র সর্বোৎকৃষ্ট শাসনব্যবস্থা। গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার সফলতার জন্য বহু পূর্বশর্ত রয়েছে। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা আকস্মিকভাবে অর্জন করা যায় না। এর জন্য দরকার গণতান্ত্রিক মূল্যবোধসম্পন্ন জনগণ, গণতান্ত্রিক শিক্ষার প্রসার, জাতীয় ঐক্যমত, আইনের শাসন ও দায়বদ্ধ সরকার।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় শাসনব্যবস্থা কোনটি?
(ক) একনায়কতন্ত্র (খ) গণতন্ত্র
(গ) রাজতন্ত্র (ঘ) প্রজাতন্ত্র

২। "সকল ধরণের সরকারের মধ্যে গণতন্ত্র সবচেয়ে কঠিন"– কে বলেছেন?
(ক) হেনরী মেইন (খ) জন স্টুয়ার্ট মিল
(গ) আর জি গেটেল (ঘ) ল্যারি ডায়মন্ড

৩। জন স্টুয়ার্ট মিল গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য কয়টি শর্তের কথা উল্লেখ করেছেন?
(ক) ২ (খ) ৩
(গ) ৪ (ঘ) ৫

৪। গণতন্ত্রের জন্য কোনটি বেশি প্রয়োজন?
(ক) আমলাতন্ত্র (খ) ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ
(গ) সামরিক শাসন (ঘ) মৌলবাদ

পাঠ-৭.৬ আদর্শ শাসন ব্যবস্থা হিসাবে গণতন্ত্র
(Democracy as an Ideal Type of Government)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- আদর্শ শাসন ব্যবস্থা হিসাবে গণতন্ত্র এর স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	মৌলিক অধিকার, আইনের অনুশাসন, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, জনগণের শাসন, রাজনৈতিক শিক্ষা, গণমাধ্যম।

আদর্শ শাসন ব্যবস্থা হিসাবে গণতন্ত্র

প্রাচীনকাল থেকেই রাষ্ট্র পরিচালনায় বিভিন্ন ধরনের শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত রয়েছে। নানা ধরনের শাসন ব্যবস্থার মধ্যে গণতন্ত্র অন্যতম। বিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পতনের পর থেকে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা সারা বিশ্বে অন্যান্য শাসন ব্যবস্থা থেকে বেশি জনপ্রিয়। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা হচ্ছে জনগণের সম্মতিভিত্তিক জনকল্যাণমুখী একটি শাসন ব্যবস্থা। আধুনিক কল্যাণমূলক রাষ্ট্র ব্যবস্থার মূল চালিকা শক্তিই হচ্ছে গণতন্ত্র। নিম্নে আদর্শ শাসন ব্যবস্থা হিসেবে গণতন্ত্রের স্বরূপ উল্লেখ করা হল ঃ

১। **সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন প্রতিষ্ঠিত ঃ** গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে যে রাজনৈতিক দল সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করে তারাই গণতন্ত্রে সরকার গঠন করে। নির্বাচকমন্ডলী ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করে।

২। **মৌলিক অধিকার স্বীকৃত ঃ** গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় জনগণের মৌলিক অধিকার স্বীকৃত ও সংরক্ষিত। জনগণ যদি মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় তাহলে রাষ্ট্র আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

৩। **আইনের শাসন ঃ** আইনের শাসন বলতে আইনের প্রাধান্যকে বোঝায়। অর্থাৎ আইন সকলের জন্য সমান। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র জনগণের আইনের অধিকার নিশ্চিত করে। রাষ্ট্রে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত না হলে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিনষ্ট হয় জনগণের নিরাপত্তাও বিঘ্নিত হয়। সবচেয়ে বড় কথা, আইনের শাসনের অভাবে মানুষ ন্যায়বিচার বঞ্চিত হয়।

৪। **স্বচ্ছতা ঃ** গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় সরকারের কার্যক্রম সম্পর্কে স্বচ্ছতা বিরাজ করে। স্বচ্ছতা বলতে বুঝায়, সরকার যা করছে জনগণ তা জানতে পারে। রাষ্ট্র কর্তৃক যে সকল উন্নয়ন কর্মকান্ড করা হয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে সকল চুক্তি সম্পাদন করা হয়, সে সকল বিষয় সম্পর্কে জনগণের কাছে স্বচ্ছতা থাকা দরকার; যেটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সম্ভব।

৫। **জবাবদিহিতা ঃ** গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাতে রাজনৈতিক নেতৃত্ব তাদের কর্মকান্ডের জন্য জনগণের নিকট জবাবদিহি করে থাকেন। রাজনৈতিক নেতৃত্বের জবাবদিহিতার সংস্কৃতির ধারাবাহিকতাতে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আমলাতন্ত্রসহ অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে জবাবদিহিতা চালু থাকে।

৬। **নির্বাচন ব্যবস্থা ঃ** গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান দিক হল নির্বাচন ব্যবস্থা। এখানে নির্বাচনের মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সরকার গঠন করে। নির্বাচনে পরাজিত পক্ষ বিরোধী দল হিসেবে সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা করে। শক্তিশালী বিরোধী দল থাকলে সরকার স্বৈরচারী হতে পারে না।

৭। **গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ঃ** জনমত প্রকাশের প্রধান বাহন হচ্ছে গণমাধ্যম। গণমাধ্যম স্বাধীন না হলে সরকারের ভালো-মন্দ দু'টি দিক জনগণ জানতে পারবে না। জনগণের বিভিন্ন চাহিদা ও অভিযোগ গণমাধ্যমে প্রকাশ করতে পারে।

৮। **জনগণের শাসন ঃ** গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে জনগণের শাসন বলে অভিহিত করা হয়। এ ধরনের শাসন ব্যবস্থায় নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের মতামত শাসন ব্যবস্থায় প্রতিফলিত হয়। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা শাসনকার্য পরিচালনা করে বিধায় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে জনগণের শাসন বলা হয়।

৯। **সক্রিয় অংশগ্রহণ ঃ** গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের যেমন অংশগ্রহণের সুযোগ রয়েছে, তেমনি প্রত্যেক নাগরিকেরও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের অধিকার রয়েছে। এই সুযোগ অন্য কোন ধরনের ব্যবস্থাতে অবারিত থাকে না।

১০। **সাংবিধানিক প্রাধান্য ঃ** সংবিধানের প্রাধ্যান্য বলতে বুঝায় সংবিধানের উর্ধ্বে আর কোন আইন নেই। সংবিধানকে অমান্য করার এখতিয়ার সরকারের নেই। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় সংবিধানের প্রাধান্যকে স্বীকার করা হয়। এর ফলে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকারের স্বেচ্ছাচারী হবার সুযোগ সীমিত।

১১। **রাজনৈতিক শিক্ষার বিস্তার ঃ** গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনগণের রাজনৈতিক শিক্ষার বিস্তার ঘটে। এখানে সরকারি দল ও বিরোধী দল রাজনীতি সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয় জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থাপন করে। আইন সভার বির্তক, জনসভা, মিছিল-স্লোগান, টেলিভিশন টকশোসহ নানাবিধ মাধ্যমে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক শিক্ষার বিস্তার ঘটে।

১২। **ক্ষমতা হস্তান্তরের পদ্ধতি ঃ** গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ক্ষমতা হস্তান্তরের পদ্ধতি অত্যন্ত সহজ। এ ধরনের রাষ্ট্রে গণবিপ্লব বা অভ্যুত্থানের সুযোগ নেই। সরকারের জনপ্রিয়তা হ্রাস পেলে নির্বাচনের সময় তারা জনগণের ভোট কম পাবে। গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে আমন্ত্রণ জানানো হয় সরকার গঠনের জন্য।

সবশেষে বলা যায়, আইনের শাসন, ব্যক্তিস্বাধীনতা, শাসন ক্ষমতায় অংশগ্রহণের সুযোগ উন্মুক্ত থাকার কারণে, অনেকেই রাজতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র বা মৌলবাদী শাসনব্যবস্থার তুলনায় গণতন্ত্রকে অনেক উন্নতর মতাদর্শ হিসাবে চিহ্নিত করে থাকেন।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	গণতন্ত্রকে এখন পর্যন্ত সর্বোত্তম শাসন ব্যবস্থা বলা হয় কেন? মূল্যায়ন করুন।

সার-সংক্ষেপ

সরকার পরিচালনার বহু পদ্ধতি রয়েছে। তবে সকল পদ্ধতি অপেক্ষা গণতন্ত্রকে বলা হয় আদর্শ শাসন ব্যবস্থা। গণতন্ত্রপন্থীদের মতে গণতন্ত্রে জনগণের আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন হয়ে থাকে। কেননা গনতন্ত্রে জনগণের মতামতের উপর ভিত্তি করে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। জনগণের মৌলিক অধিকার ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হয় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায়। জনগণের সম্মতির ভিত্তিতে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় গণতন্ত্রকে আদর্শ শাসন ব্যবস্থা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় কোন ধরনের সরকার ব্যবস্থায়?
(ক) একনায়কতন্ত্রে (খ) গণতন্ত্রে
(গ) রাজতন্ত্রে (ঘ) প্রজাতন্ত্রে

২। জনমত প্রকাশের বাহন কী?
(ক) নির্বাচন (খ) সমাবেশ
(গ) গণমাধ্যম (ঘ) সব কয়টি

৩। আধুনিক কল্যাণমূলক রাষ্ট্র ব্যবস্থার মূল চালিকা শক্তি—
(ক) গণতন্ত্র (খ) রাজতন্ত্র
(গ) সমাজতন্ত্র (ঘ) প্রজাতন্ত্র

৪। জনগণ সরাসরি রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করে কোন ধরনের সরকার ব্যবস্থায়?
(ক) রাজতন্ত্র (খ) সমাজতন্ত্র
(গ) গণতন্ত্র (ঘ) কোনটিই নয়

পাঠ-৭.৭ রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের গুণাবলি ও সমস্যা (Merits and Demerits of the Presidential Form of Government)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের গুণাবলি আলোচনা করতে পারবেন।
- রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের সমস্যাবলী বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	জনকল্যাণ, নির্বাচকমন্ডলী, জরুরি অবস্থা, বিচার বিভাগের প্রাধান্য, ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতি।

রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের গুণাবলি

রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের কতকগুলো বিশেষ গুণ রয়েছে নিম্নে তা আলোচনা করা হল ঃ

১। **স্থায়িত্ব ঃ** সরকারের স্থায়িত্ব রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন ব্যবস্থার সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য গুণ হিসেবে বিবেচিত হয়। আইনসভার আস্থা-অনাস্থার উপর সরকারের স্থায়িত্ব নির্ভরশীল নয়। নির্দিষ্ট কার্যকাল অতিক্রান্ত হওয়ার আগে সরকারের পতন ঘটার আশঙ্কা থাকে না।

২। **জনকল্যাণ ঃ** আইনসভার সদস্যদের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সময়ের অপব্যয় ঘটে না। সরকার জনকল্যাণে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবে রূপায়িত করতে পারে। সরকারের অনুসৃত নীতি ও কার্যক্রমের মধ্যে নিরবিচ্ছিন্নতা বজায় থাকে। এর ফলে সরকারের দৃঢ়তা বৃদ্ধি পায়।

৩। **জরুরি অবস্থার উপযোগী ঃ** রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসনব্যবস্থা জরুরি অবস্থা মোকাবেলায় উপযোগী। শাসন-বিভাগের চূড়ান্ত কর্তৃত্ব রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত থাকে বিধায়, জরুরি প্রয়োজনে তিনি দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে পারেন।

৪। **ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের সুবিধা ঃ** ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতির প্রয়োগের ভিত্তিতেই রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসনব্যবস্থার সৃষ্টি হয়। এ ধরণের শাসনব্যবস্থায় আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগ পরস্পর স্বতন্ত্র থেকে নিজ-নিজ এলাকায় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। এর ফলে আইন এবং শাসন বিভাগের মধ্যে সংঘর্ষের আশঙ্কা থাকে না।

৫। **রাষ্ট্রপতির স্বাধীনতা ঃ** এই ধরনের সরকারে সরকারি নীতি নির্ধারণ, সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং এ সমস্ত নীতি ও সিদ্ধান্তকে বাস্তবে রূপায়িত করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি স্বাধীনভাবে ভূমিকা পালন করে থাকেন। তাঁর উপর দলীয় প্রভাব বা প্রাধান্য বিস্তার করা সহজে সম্ভব হয় না।

৬। **রাষ্ট্রের উন্নয়ন সাধন ঃ** রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারে উন্নয়ন প্রক্রিয়া দ্রুত থাকে। রাষ্ট্রপতি তাঁর কাজের জন্য আইনসভার নিকট দায়বদ্ধ থাকেন না বিধায়, তিনি এককভাবে দ্রুত ও কার্যকরী সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। একই সুযোগে আইন সভার সময়ক্ষেপণ বাদ দিয়ে তিনি দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনাও করতে পারেন।

রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারে প্রধান নির্বাহী হিসাবে রাষ্ট্রপতি দলতন্ত্রের মধ্যে আটকে না থেকেই বেশির ভাগ সময় প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্তগুলি নিতে পারেন। এ কারণে কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের পক্ষে মত দেন।

রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের সমস্যাবলী

বিভিন্ন গুণাবলির অস্তিত্ব সত্ত্বেও রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে সমালোচনার অভাব নেই। নিম্নে তা আলোচনা করা হল ঃ

১। **ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির কুফল ঃ** ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের কুফল রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন ব্যবস্থায় পরিলক্ষিত হয়। আইন-বিভাগ এবং শাসন বিভাগ পরস্পর পৃথক থেকে নিজ-নিজ কার্য সম্পাদন করে। তাই এ দুই বিভাগের মধ্যে সহযোগিতার অভাব ঘটে। এতে উভয় বিভাগের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি ও সংঘর্ষের আশংকা থাকে।

২। **স্বৈরাচারমূলক ঃ** এই প্রকার শাসনব্যবস্থায় শাসন বিভাগের সকল ক্ষমতা চূড়ান্তভাবে রাষ্ট্রপতির হাতেই ন্যস্ত থাকে। রাষ্ট্রপতি আইনসভার সদস্য নন। আবার আইনসভার কাছে তিনি দায়বদ্ধও নন। নির্দিষ্ট কার্যকাল অতিক্রান্ত হওয়ার আগে তাঁকে সহজে পদচ্যুত করা যায় না। এর ফলে রাষ্ট্রপতির পক্ষে স্বেচ্ছাচারী হওয়ার পথে কোন বাধা থাকে না।

৩। **অনমনীয়তা ঃ** শাসনব্যবস্থার অনমনীয়তা রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের অন্যতম ত্রুটি হিসেবে গণ্য হয়। রাষ্ট্রপতিই মূলত ক্ষমতার মূল স্তম্ভ বিধায়, তাঁর ইচ্ছার বাইরে রাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসনব্যবস্থায় কোন ধরনের কাম্য পরিবর্তন সহজে সম্পাদন করা সম্ভব হয় না।

৪। **জনমত প্রতিফলিত হয় না ঃ** রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারে জনসাধারণের সঙ্গে রাষ্ট্রপতির কোন প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপিত হয় না। কারণ সে রকম কোন সুযোগ এ ধরনের সরকারে থাকে না। গণসংযোগের মাধ্যমগুলোর সাহায্যে এই সংযোগ পরোক্ষভাবে সম্পাদিত হয়। এ কারণে রাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসনব্যবস্থায় জনমতের প্রকৃত প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয় না।

পরিশেষে বলা যায় যে, নানাবিধ সীমাবদ্ধতা থাকলেও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা চালু আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত দেশে এই ব্যবস্থা বেশ সাফল্যের সঙ্গে বহাল আছে। মার্কিন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় দল প্রথার উদ্ভব ও বিকাশ, আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের মধ্যে সংযোগ ও সহযোগিতার ভিত্তি প্রস্তুত করেছে। তার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার সফল হয়েছে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের কয়েকটি সমস্যা চিহ্নিত করুন।

সার-সংক্ষেপ

গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার একটি রূপ হল রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন ব্যবস্থা। এ ধরনের শাসন ব্যবস্থায় শাসন বিভাগ আইন বিভাগের নিকট দায়ী থাকে না। রাষ্ট্রপতি প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় তাঁর নির্বাহী কর্তৃত্বের সর্বোচ্চ প্রকাশ ঘটান। রাষ্ট্রপতির কার্যকাল সংবিধান অনুযায়ী নির্দিষ্ট থাকে। সংবিধান লংঙ্ঘন, দেশ দ্রোহিতা, উৎকোচ গ্রহণ প্রভৃতি কারণে তাঁকে পদচ্যুত করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন

১। রাষ্ট্রপতি শাসিত ব্যবস্থাতে শাসন বিভাগের প্রধান কে?
(ক) রাষ্ট্রপতি (খ) প্রধানমন্ত্রী
(গ) স্পীকার (ঘ) কোনটিই নয়

২। রাষ্ট্রপতি শাসিত ব্যবস্থাতে আইনসভার নিকট দায়-দায়িত্ব নেই কার?
(ক) প্রধানমন্ত্রী (খ) রাষ্ট্রপতি
(গ) মন্ত্রসভা (ঘ) স্পীকার

৩। রাষ্ট্রপতি শাসিত ব্যবস্থাতে সবচেয়ে ক্ষমতাবান কে?
(ক) সেনাপ্রধান (খ) রাষ্ট্রপতি
(গ) মন্ত্রিসভা (ঘ) স্পীকার

পাঠ-৭.৮ সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের গুণাবলি ও সমস্যা (Merits and Demerits of Parliamentary Form of Government)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের গুণাবলি আলোচনা করতে পারবেন।
- সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের সমস্যাগুলি চিহ্নিত করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	জনমতের প্রাধান্য, জনকল্যাণকামী, নাগরিক সচেতনতা, জাতীয় সংকট, রাজনৈতিক শিক্ষা।

সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের গুণাবলি

বর্তমানকালে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই গণতন্ত্রকে স্বাগত জানানো হয়েছে। আর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে পার্লামেন্টারি বা সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয়, উভয় ব্যবস্থাতেই সংসদীয় শাসন সমানভাবে জনপ্রিয়। সংসদীয় ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলো বিশ্লেষণ করলে এর ব্যাপক জনপ্রিয়তার কারণগুলো অনুধাবন করা যায়। নিম্নে এ ধরনের কয়েকটি কারণ আলোচনা করা হল ঃ

১। **আইন ও শাসন বিভাগের মধ্যে সুসম্পর্ক ঃ** সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক এবং গভীর বোঝাপড়া থাকে। এরকম শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতিকে স্বীকার করা হয় না। উভয় বিভাগের মধ্যে এই পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে সুশাসনের পথ প্রশস্ত হয়।

২। **গণতন্ত্রের স্বরূপ বজায় থাকে ঃ** এই শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রিসভাই হল প্রকৃত শাসক। এই মন্ত্রিসভা আবার জনগণের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত। ফলে জনগণের প্রতিনিধিদের দ্বারাই সরকারি নীতি নির্ধারিত হয় এবং শাসনকার্য পরিচালিত হয়। এতে গণতান্ত্রিক শাসন বা জনগণের শাসনের স্বরূপ বজায় থাকে।

৩। **সরকার স্বৈরাচারী নয় ঃ** সংসদীয় সরকারে মন্ত্রিসভাকে সরকারি নীতি ও কার্যক্রম সম্পর্কে সকল বিষয়ে আইনসভার কাছে দায়িত্বশীল থাকতে হয়। আইনসভার আস্থা হারালে মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হয়। তাই মন্ত্রিসভা স্বৈরাচারী হতে পারে না। এছাড়া, মন্ত্রিসভার জনস্বার্থ বিরোধী এবং স্বৈরাচারী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে বিরোধী দল প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে।

৪। **নমনীয় ও পরিবর্তনশীল ঃ** সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা বিশেষভাবে নমনীয়। এরূপ শাসন ব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে প্রয়োজনমাফিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। প্রয়োজনের তাগিদে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রধানমন্ত্রী বা মন্ত্রিপরিষদে পরিবর্তন আনয়নে অসুবিধা হয় না।

৫। **রাজনৈতিক শিক্ষার বিস্তার ঃ** এ ধরনের শাসনব্যবস্থায় জনগণের রাজনৈতিক শিক্ষার বিস্তার ঘটে। সরকারি নীতি, দেশের বিভিন্ন সমস্যা ও সরকারি কার্যক্রম নিয়ে পার্লামেন্টে আলোচনা ও সমালোচনা হয়। তার মাধ্যমে দেশের সাধারণ মানুষ সরকারের কার্যকলাপ সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারে।

৬। **সুশাসন প্রতিষ্ঠা ঃ** গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাতে যেকোন বিষয়ে স্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায় এবং সঠিকভাবে উচিৎ-অনুচিৎ স্থির করা যায়। এ ধরনের অনুশীলন সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

৭। **রাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের সমন্বয় ঃ** সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় রাজতন্ত্রকে বজায় রেখেও গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ পাওয়া যায়। রাজা বা রাণীকে নিয়মতান্ত্রিক শাসকের পদ দিয়ে মন্ত্রিসভাকে প্রকৃত শাসক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা যায়। উদাহরণ হিসেবে ব্রিটেনের সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার কথা বলা যেতে পারে।

৮। **জনমতের প্রাধান্য ঃ** মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারে জনমতের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। জনগণের মতামত উপেক্ষা করে সরকার এককভাবে কোন সিদ্ধান্ত নিলে জনগণ তা মেনে নেয় না। জনগণের ভোটে নির্বাচিত বিধায় আইন সভার

সদস্যদের জনমতের ব্যাপারে সর্তক থাকতে হয়। এখানে জনমতের উপর ভিত্তি করেই সরকার আইন প্রণয়ন ও নীতি নির্ধারণ করে থাকে।

৯। **বিরোধী দলের মর্যাদা ঃ** মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারে বিরোধী দলের মর্যাদা রয়েছে। এখানে বিরোধী দল সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা করে থাকে। সরকারের ভুল-ত্রুটি ধরিয়ে দেয়া এবং বিকল্প প্রস্তাব উত্থাপনের মাধ্যমে বিরোধী দল গণতন্ত্র চর্চায় অবদান রাখতে পারে।

১০। **জনকল্যাণকামী ঃ** জনকল্যাণ সাধন মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের অন্যতম গুণ। সরকার যদি জনগণের ভাগ্যোন্নয়ন করার চেষ্টা না করে, তাহলে পরবর্তী নির্বাচনে জনগণ সরকারি দলকে ভোট দান থেকে বিরত থাকে। এ আশংকা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সরকারি দল জনকল্যাণকামী হয়ে থাকে। ভোটের মাধ্যমে ক্ষমতায় যাওয়ার আকাঙ্খা থাকে বিধায় বিরোধী দলও জনকল্যাণমুখী অবস্থান গ্রহণ করে।

১১। **জাতীয় সংকট নিরসন ঃ** মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার বিভিন্ন জাতীয় সংকট দক্ষতার সাথে সমাধান করতে পারে। সংকটকালীন সময়ে প্রয়োজনে বিরোধী দলের সাথে সরকারি দল পরামর্শ করে সিদ্ধান্তে আসতে পারে।

নানাবিধ ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক বিবেচনা করে বলা যায় যে, মন্ত্রিপরিষদ শাসিত শাসন ব্যবস্থা অপরাপর শাসন ব্যবস্থা থেকে অধিকতর উত্তম শাসন ব্যবস্থা। এ শাসন ব্যবস্থা জনগণের মতামতের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সরকার তাদের কাজের জন্য আইনসভা ও জনগণের নিকট দায়বদ্ধ থাকে। অন্য কোন শাসনব্যবস্থায় জনগণের নিকট শাসনকারী কর্তৃপক্ষের এতটা দায়বদ্ধতা দেখা যায় না।

সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের সমস্যাবলী

উপরোক্ত গুণাবলির অস্তিত্ব সত্ত্বেও সংসদীয় শাসনব্যবস্থা বিরূপ সমালোচনার হাত এড়াতে পারেনি। বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এরূপ সরকারের বিরুদ্ধে বহুবিধ ত্রুটির কথা বলা হয়। নিম্নে তা আলোচনা করা হল ঃ

১। **সুশাসনের অন্তরায় ঃ** সংসদীয় ব্যবস্থাতে মন্ত্রীগণকে শাসনকার্য ছাড়াও আইন প্রণয়ন কাজে অংশগ্রহণ করতে হয় এবং প্রশ্নোত্তর দানে ব্যস্ত থাকতে হয়। তাছাড়া মন্ত্রীদের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে হয়। এর ফলেও মন্ত্রীদের অনেকটা সময় চলে যায়। এতে বিভাগীয় মন্ত্রীগণ তাঁদের উৎসাহ-উদ্দীপনার পুরোটাই নির্বাহী ক্ষেত্রে নিয়োগ করতে পারেন না। এটি সুশাসনের অন্তরায় হিসেবে বিবেচিত হয়।

২। **অখন্ড সরকারি নীতি অনুসৃত হয় না ঃ** সংসদীয় সরকারের পরিবর্তনশীলতা বা নমনীয়তা অন্যতম গুণ হিসেবে বিবেচিত হয়। কিন্তু এটি সরকারি নীতি ও কার্যক্রমের অখন্ডতার বিরোধী। এ ধরনের শাসনব্যবস্থায় ঘন-ঘন মন্ত্রিসভায় পরিবর্তনের আশংকা থাকে। আবার মন্ত্রিসভায় পরিবর্তন হলে সরকারি নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কিছু ব্যতিক্রম দেখা দেয়।

৩। **জরুরি অবস্থার উপযোগী নয় ঃ** এ ধরনের শাসনব্যবস্থায় সরকারি সকল সিদ্ধান্ত মন্ত্রিসভার বৈঠকে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে গৃহীত হয়। সেজন্য কোন বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না।

৪। **দল ব্যবস্থার ত্রুটি ঃ** সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব অপরিহার্য বিবেচিত হয়। ফলে এ ধরনের শাসনব্যবস্থায় দল ব্যবস্থার সকল ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। সংকীর্ণ দলাদলি, দলীয় স্বার্থ, যোগ্যতার উপেক্ষা প্রভৃতি শাসনব্যবস্থার দক্ষতার হানি ঘটায়।

৫। **নয়া স্বৈরাচার ঃ** সংসদীয় ব্যবস্থাতে কোন একটি দল বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সরকার গঠন করলে একদলীয় শাসনের আশঙ্কা তৈরি হয়। মন্ত্রিসভার স্বৈরাচারের পথে সাফল্যের সঙ্গে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির ক্ষমতা দুর্বল বিরোধী দলের থাকে না।

৬। **ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি অনুপস্থিত:** সংসদীয় ব্যবস্থাতে আইন ও শাসন বিভাগের মধ্যে কোন ভেদ থাকে না। অর্থাৎ আইন সভাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতেই নির্বাহী বিভাগের দায়িত্ব থাকে। সরকারের এই দুই বিভাগের একীভূত হয়ে থাকাকে অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী গণতন্ত্রের জন্য ক্ষতিকর মনে করেন।

৭। **পক্ষপাতমূলক প্রশাসন ঃ** মন্ত্রিপরিষদ শাসিত শাসনব্যবস্থা যেহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক দলের সদস্যদের নিয়ে গঠিত হয় সেহেতু প্রশাসনিক ক্ষেত্রে দলীয় প্রভাব থাকে। আর এ পক্ষপাতমূলক প্রশাসন জনগণের জন্য অকল্যাণকর।

পরিশেষে বলা যায় যে, মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের কিছু ত্রুটি থাকলেও বর্তমান বিশ্বে এ শাসনব্যবস্থা ব্যাপকভাবে জনপ্রিয়। অনেকে মনে করেন, ক্ষমতাসীন দল যদি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ অনুসরণ করে তাহলে সংসদীয় ব্যবস্থাতেই গণতন্ত্রের সবচেয়ে বেশি সুফল পাওয়া সম্ভব।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের সুবিধাগুলো কি কি?

সার-সংক্ষেপ

যে শাসন ব্যবস্থায় মন্ত্রিসভা শাসন ক্ষমতার অধিকারী এবং মন্ত্রিপরিষদ তাঁদের কাজের জন্য আইনসভার নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকেন তাকে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার বা সংসদীয় সরকার বলে। মন্ত্রিপরিষদ শাসিত শাসন ব্যবস্থায় সরকারের সকল ক্ষমতা তত্ত্বগতভাবে একজন রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত থাকে। কিন্তু প্রকৃত শাসন ক্ষমতা মন্ত্রিপরিষদের উপর ন্যস্ত থাকে। বর্তমানে মন্ত্রীপরিষদ শাসিত সরকার জনপ্রিয় ও নন্দিত সরকারে পরিণত হচ্ছে। তবে এ সরকারের কিছু ত্রুটি দূর করে আরো বেশি জনপ্রিয় ও অর্থবহ করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন

১। মন্ত্রণালয়ের প্রধান কে?
(ক) সচিব (খ) উপসচিব
(গ) মন্ত্রী (ঘ) স্পীকার

২। মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারে মূল ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু কে?
(ক) রাষ্ট্রপতি (খ) প্রধানমন্ত্রী
(গ) সেনাপ্রধান (ঘ) প্রধান বিচারপতি

৩। কোনটি মন্ত্রীপরিষদ শাসিত ব্যবস্থাতে দেখা যায় না?
ক) ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ (খ) আমলাতন্ত্র
(গ) দুর্নীতি (ঘ) স্বজনপ্রীতি

পাঠ-৭.৯ রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ও মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার
(Presidential and Parliamentary Form of Government)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ও মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	নামসর্বস্ব শাসক, আইনসভার সার্বভৌমত্ব, সংবিধানের প্রাধান্য, জরুরি অবস্থা, ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি।

রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ও মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের মধ্যে পার্থক্য

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের নীতির আলোকে বা শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের প্রকৃতি অনুসারে আধুনিক গণতান্ত্রিক সরকারসমূহকে দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়। যথা– সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার এবং রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার। এই উভয় ধরনের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার মধ্যে নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যগুলো দেখা যায়।

১। **রাষ্ট্রপ্রধানের ক্ষমতার ক্ষেত্রে পার্থক্য ঃ** সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় নিয়মতান্ত্রিক বা নামসর্বস্ব শাসক এবং প্রকৃত শাসক এই দু'ধরনের শাসক দেখা যায়। কিন্তু রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসনব্যবস্থার নিয়মতান্ত্রিক বা নামসর্বস্ব কোন শাসক প্রধানের পদ থাকে না। রাষ্ট্রপতিই একাধারে রাষ্ট্রপ্রধান এবং শাসন বিভাগের প্রধান কর্তা। তিনি তত্ত্বগতভাবে এবং বাস্তবে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী।

২। **দায়িত্বের ক্ষেত্রে ঃ** সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় প্রকৃত প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ হল মন্ত্রিসভা। মন্ত্রিসভার সকল সদস্য প্রত্যক্ষভাবে আইনসভার কাছে এবং পরোক্ষভাবে জনসাধারণের কাছে দায়িত্বশীল থাকে। অপরপক্ষে, রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি প্রত্যক্ষভাবে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হন। তিনি জনগণের কাছেই দায়িত্বশীল থাকেন।

৩। **মন্ত্রিসভার ক্ষেত্রে ঃ** সংসদীয় আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাদের নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। অপরপক্ষে রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন ব্যবস্থায় একটি মন্ত্রিসভা থাকে। রাষ্ট্রপতিই এই মন্ত্রিসভার সদস্যদের মনোনীত ও নিযুক্ত করেন। মন্ত্রীরা রাষ্ট্রপতির কাছে দায়িত্বশীল। রাষ্ট্রপতির সন্তুষ্টির উপর তাদের কার্যকাল নির্ভরশীল।

৪। **জরুরি অবস্থার ক্ষেত্রে ঃ** রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার স্বার্থে অনেক সময় আইনীভাবেই একক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থায় জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলায় রাষ্ট্রপতি শাসিত ব্যবস্থার মত দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না।

৫। **নমনীয়তা ঃ** সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ও সংবিধান নমনীয়। প্রয়োজনমাফিক আইনগত কিংবা সাংবিধানিক পরিবর্তন এ ব্যবস্থাতে তুলনামূলক সহজ। পক্ষান্তরে, রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের সংবিধান কিংবা সরকার পরিবর্তন করতে হলে এক বিশেষ জটিল পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়।

৬। **আইনসভার সার্বভৌমত্ব ঃ** সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের আইনসভা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। আইনসভা অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করে সরকারকে অপসারণ করতে পারে। অন্যদিকে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থায় আইনসভা নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী নয়।

৭। **নির্বাচনগত পার্থক্য ঃ** রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হন। কিন্তু মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের প্রধানমন্ত্রী প্রথমে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হন। নির্বাচনে জয়ের পরে তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রধান হিসেবে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন।

৮। **আইনসভা ভেঙ্গে দেবার ক্ষেত্রে ঃ** সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারে প্রধানমন্ত্রী আইনসভা ভেঙ্গে দেবার জন্য রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দান করতে পারেন। তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দিতে পারেন। কিন্তু রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারে রাষ্ট্রপতি পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দিতে পারেন না।

সবশেষে বলা যায়, মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ও রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার উভয়ই গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার দুটি রূপ। উভয় সরকার ব্যবস্থারই কিছু দোষ-ত্রুটি রয়েছে। বস্তুত: কোন ধরনের ব্যবস্থা অধিক কার্যকর হবে তা নির্ভর করে একটি দেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক সংস্কৃতির উপরে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	রাষ্ট্রপতি শাসিত ও মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের মাঝে মূল পার্থক্যগুলো তুলে ধরুন।

সার-সংক্ষেপ

আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকারের শ্রেণিবিভাগে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ও রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার পদ্ধতি মূলত দুটি পৃথক বৈশিষ্ট্যমন্ডিত সরকার ব্যবস্থা। উভয় ব্যবস্থারই কিছু ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক রয়েছে। তবে আইনসভা ও শাসন বিভাগের মধ্যে নিবিড় সহযোগিতা থাকলে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারই বেশি উপযোগী। আবার শাসন ব্যবস্থার দ্রুত ও কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার দিক বিবেচনা করলে রাষ্ট্রতি শাসিত সরকারই বেশি কাম্য বলে মনে করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৯

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন

১। সংসদীয় ব্যবস্থাতে শাসন বিভাগের প্রধান কে?
(ক) প্রধানমন্ত্রী (খ) রাষ্ট্রপতি
(গ) স্পীকার (ঘ) প্রধান বিচারপতি

২। জরুরি অবস্থায় কোন সরকার ব্যবস্থা উপযোগী?
(ক) রাষ্ট্রপতি শাসিত (খ) মন্ত্রিপরিষদ শাসিত
(গ) একনায়কতন্ত্র (ঘ) রাজতন্ত্র

৩। সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় আইনসভা ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দেন কে?
(ক) স্পীকার (খ) বিরোধী দল
(গ) প্রধানমন্ত্রী (ঘ) নির্বাচন কমিশন

৪। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক সরকারকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?
(ক) ২ (খ) ৪
(গ) ৬ (ঘ) ৮

পাঠ-৭.১০ এককেন্দ্রিক সরকারের গুনাবলি ও সমস্যা (Merits and Demerits of Unitary Government)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- এককেন্দ্রিক সরকারে গুণাবলি সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- এককেন্দ্রিক সরকারের সীমাবদ্ধতাগুলি বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	ক্ষমতার প্রাধান্য, আইনসভার প্রাধান্য, অর্থনৈতিক বিকাশ, সুষম উন্নয়ন, স্বায়ত্তশাসন, স্বৈরাচার, রাজনৈতিক চেতনা।

এককেন্দ্রিক সরকারের গুণাবলি

এককেন্দ্রিক সরকারের গঠন ও কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে কতকগুলো গুণ বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে এককেন্দ্রিক সরকারের গুণাবলি আলোচনা করা হল ঃ

১। **কেন্দ্রীয় ক্ষমতার প্রাধান্য ঃ** এককেন্দ্রিক সরকারের সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকে। কেন্দ্রীয় সরকারের কোন প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকায় অত্যন্ত সহজ এবং সুষ্ঠুভাবে তার পক্ষে কার্য-পরিচালনা করা সম্ভব। প্রশাসন পরিচালনায় কোন জটিলতা সৃষ্টি হয় না।

২। **শক্তিশালী সরকার ঃ** এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে সরকার শক্তিশালী হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে কেন্দ্র এবং অঙ্গরাজ্যের মধ্যে বিরোধের সম্ভাবনা থাকে, এককেন্দ্রিক সরকারের কোন সাংবিধানিক প্রতিপক্ষ থাকে না। সুতরাং তার পক্ষে একক ইচ্ছায় সকল ক্ষমতা প্রয়োগ এবং একচ্ছত্র প্রভাব ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

৩। **আইন প্রণয়নের প্রাধান্য ঃ** কেন্দ্রীয় সরকার সমগ্র দেশের জন্য আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের দায়িত্ব গ্রহণ করে। প্রশাসনিক নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে এ সরকারই একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী। সমগ্র দেশ একই ধরণের আইন এবং প্রশাসনিক নীতির অন্তর্ভূক্ত হয়।

৪। **আইন সভার প্রাধান্য ঃ** এককেন্দ্রিক সরকারে সংবিধানের পরিবর্তে কেন্দ্রীয় আইনসভার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এককেন্দ্রিক সরকারের চরিত্র অনুসারে সংবিধান নমনীয় বা সুপরিবর্তনীয় হয়। কেন্দ্রীয় আইনসভা সহজেই সাধারণ আইন প্রণয়নের পদ্ধতিতে সংবিধান সংশোধন করতে পারে।

৫। **অর্থনৈতিক বিকাশ ঃ** অর্থনৈতিক দিক থেকেও অনেকের কাছে এককেন্দ্রিক সরকার কাম্য। আধুনিক রাষ্ট্রে সরকারকে জনকল্যাণ এবং দ্রুত অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহের সমাধানের জন্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং রূপায়নের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়।

৬। **ব্যয়ভার হ্রাস ঃ** অনেকে মনে করেন যে, এককেন্দ্রিক সরকারে কেন্দ্র এবং অঙ্গরাজ্যের বিভক্তি না থাকায় প্রশাসন পরিচালনার ব্যয়ভার হ্রাস পায় বিধায় জনসাধারণকেও কর এবং অন্যান্য খাতে অনেক কম ব্যয় ভার বহন করতে হয়। এজন্য এই সরকার জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

৭। **ছোট রাষ্ট্রে উপযোগী ঃ** ক্ষুদ্র আয়তন বিশিষ্ট রাষ্ট্রের জন্য এককেন্দ্রিক সরকার বিশেষ উপযোগী। যেসব দেশে জাতিগত এবং ভাষা ও ঐতিহ্যগত বৈচিত্র্য কম সেসব দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করা এককেন্দ্রিক সরকারের জন্য সুবিধাজনক। যার ফলে সেসব দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

পরিশেষে বলা যায় যে, অর্থনৈতিক সংকট এবং অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা দমনে এককেন্দ্রিক সরকার দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। আবার শান্তির সময়েও এর অন্যথা হয় না। এসব কারণে সারা পৃথিবীর অনেক দেশে এককেন্দ্রিক ব্যবস্থা চালু আছে।

এককেন্দ্রিক সরকারের সমস্যাবলী

এককেন্দ্রিক সরকারের কতকগুলো গুণ থাকলেও এটি ত্রুটিমুক্ত কোন ব্যবস্থা নয়। নিম্নে এককেন্দ্রিক সরকারের সমস্যাগুলি আলোচনা করা হল ঃ

১। **কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্য ঃ** এককেন্দ্রিক সরকারে সর্বত্রই কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। এর ফলে আঞ্চলিক সরকারগুলোর অস্তিত্ব অর্থহীন হয়ে পড়ে। এককেন্দ্রিক ব্যবস্থায় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার শক্তিশালী হওয়াও কঠিন।

২। **প্রশাসনিক জটিলতা ঃ** একই ধরনের আইন ও ব্যবস্থার মাধ্যমে সকল অঞ্চলের সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান সম্ভব নয়। বিভিন্ন অঞ্চলের সমস্যার সমাধানের জন্য বিভিন্ন ধরণের ব্যবস্থা প্রয়োজন। আঞ্চলিক বৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজন বৈচিত্র্যপূর্ণ পদ্ধতি ও ব্যবস্থা। এককেন্দ্রিক সরকারে তা সম্ভব নয়।

৩। **আমলা নির্ভর সরকার ঃ** এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় একটি কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে দেশের প্রতিটি অঞ্চলের এবং সকল সমস্যার খুঁটিনাটি বিবেচনার পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। রাজনীতিবিদগণ দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য আমলাদের সাহায্য ও পরামর্শের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন।

৪। **কেন্দ্রবিরোধী মনোভাব ঃ** এককেন্দ্রিক ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে সর্বদা সকল রাজ্য বা অঞ্চলের দাবির প্রতি নজর দেওয়া ও সুবিচার করা সম্ভব হয় না। এর ফলে আঞ্চলিকতা, প্রাদেশিকতা, বিচ্ছিন্নতাকামী প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।

৫। **দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যর্থ ঃ** এককেন্দ্রিক সরকারে খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব নয়। এই ব্যবস্থাতে কেন্দ্রীয় সরকারের আইন ও শাসন বিভাগের বোঝা ক্রমশই ভারী হয়ে ওঠে। একটি মাত্র সরকারকে সকল দায়িত্ব পালন করতে হয় বিধায় বিভিন্ন অঞ্চলের প্রয়োজন অনুযায়ী দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হয় না।

৬। **ভৌগোলিক ও মানসিক দূরত্ব ঃ** বৃহদায়তন রাষ্ট্রে এককেন্দ্রিক সরকার সফল হতে পারে না। এককেন্দ্রিক ব্যবস্থাতে কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিভিন্ন অঞ্চলের জনগণের মধ্যে ভৌগোলিক এবং মানসিক দূরত্ব বেশি থাকে।

৭। **অর্থনৈতিক বৈষম্য ঃ** অর্থনৈতিক দিক থেকেও এককেন্দ্রিক সরকারকে সমর্থন করা যায় না। যে-কোন রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক সমস্যা ও সম্ভাবনা থাকে। এককেন্দ্রিক সরকারে যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকার এককভাবে সামগ্রিক জাতীয় অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণ করে সেজন্য প্রতিটি অঞ্চলের দিকে দৃষ্টি দেয়া সম্ভব হয় না।

৮। **স্থানীয় উদ্যোগ ও উৎসাহ দমন ঃ** জে ডব্লিউ গার্নারের মতে, এককেন্দ্রিক সরকার স্থানীয় উদ্যোগ ও উৎসাহ দমন করে। সরকার রাজনৈতিক বিষয়ে স্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে উৎসাহ সঞ্চারের পরিবর্তে নিরুৎসাহ সৃষ্টি করে।

৯। **নমনীয় সরকার ঃ** এককেন্দ্রিক সরকার নমনীয় বলেই শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দল নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে সংবিধান সংশোধন করতে পারে। এর ফলে একদিকে দলীয় স্বেচ্ছাচার এবং অন্যদিকে শাসনতান্ত্রিক একনায়কতন্ত্রের পথ প্রশস্ত হয়। অতিনমনীয়তা সংবিধানের মৌলিক বৈশিষ্ট্য ধ্বংস করতে পারে।

১০। **আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ঃ** যে-সব দেশে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন এবং স্বাধীনতার দাবি অত্যন্ত প্রবল সেসব দেশে এককেন্দ্রিক সরকার সাফল্য অর্জন করতে পারে না।

পরিশেষে বলা যায় যে, ক্ষুদ্র আয়তন রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এককেন্দ্রিক সরকারের সফল হবার সম্ভাবনা বেশি থাকে। বৃহদায়তন রাষ্ট্রে এককেন্দ্রিক সরকারের পক্ষে সকল অঞ্চলে সমান নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা এবং সমান সেবাদান সমস্যা হতে পারে। নানাবিধ জাতি, ভাষা কিংবা সংস্কৃতিতে বিভক্ত রাষ্ট্রের জন্য এককেন্দ্রিক ব্যবস্থাকে সহায়ক হিসেবে বিবেচনা করা হয় না।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	এককেন্দ্রিক সরকারের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করুন।

সার-সংক্ষেপ

এককেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থায় সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকে। এ ধরনের সরকারে কেন্দ্রীয়, প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক সরকারের হাতে ক্ষমতা বণ্টন করে দেওয়া হয় না। আয়তনে ছোট রাষ্ট্রগুলির ক্ষেত্রে এক কেন্দ্রিক সরকার বেশ কার্যকর হলেও, বিশাল আয়তন ও নানা জাতি, নানা সংস্কৃতি সম্পন্ন রাষ্ট্রগুলেতে এককেন্দ্রিক সরকার খুব বেশি সফল হয় না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.১০

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। এককেন্দ্রিক সরকারের ক্ষমতার উৎস কি?

(ক) আইনসভা (খ) মন্ত্রিসভা

(গ) সংবিধান (ঘ) জনগণ

২। সার্বভৌম ক্ষমতার অবস্থান অনুসারে সরকার ব্যবস্থা কয় প্রকার?

(ক) ২ (খ) ৪

(গ) ৬ (ঘ) ৮

৩। এককেন্দ্রিক সরকার কোন ধরনের রাষ্ট্রের জন্য উপযোগী?

(ক) আয়তনে বড় (খ) আয়তনে ছোট

(গ) উন্নত রাষ্ট্র (ঘ) উন্নয়নশীল রাষ্ট্র

পাঠ-৭.১১ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের গুণাবলি ও সমস্যা (Merits and Demerits of Federal Government)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের গুণাবলি সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সমস্যাগুলি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	জাতীয় ঐক্য, প্রশাসনিক নৈপুণ্য, ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, ভৌগোলিক ঐক্য, জাতীয় সরকার, জাতীয় সংহতি।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের গুণাবলি

বর্তমানে পৃথিবীর অনেক দেশেই যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থা চালু আছে। নিম্নে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের গুণাবলি আলোচনা করা হল ঃ

১। **সমন্বয় সাধন ঃ** যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার জাতীয় ঐক্য এবং স্বার্থের সঙ্গে আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যের সমন্বয় সাধন করে। এ ধরণের সরকারে একাধারে কেন্দ্রকে গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষমতা অর্পণ এবং আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি পূরণ করা সম্ভব। এ সরকারের সামগ্রিকভাবে জাতীয় অগ্রগতি নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

২। **আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ ঃ** যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণে সাহায্য করে। বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের সরকারসমূহ ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

৩। **কেন্দ্রীয় আমলাতান্ত্রিকতা প্রতিরোধ ঃ** যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার কেন্দ্রীয় আমলাতান্ত্রিকতা প্রতিরোধে সহায়ক। অঙ্গরাজ্যের সরকারসমূহ আঞ্চলিক সমস্যা, দাবি এবং প্রয়োজন সম্পর্কে অবহিত থাকে। অঞ্চলের জনসাধারণের সঙ্গে রাজনৈতিক প্রশাসকদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ সুশাসনের সম্ভাবনা সৃষ্টি করে বিধায় আমলাদের প্রাধান্য হ্রাস পায়।

৪। **রাজনৈতিক সচেতনতা ঃ** বিশাল দেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থাই জনসাধারণকে রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। সরকারের সঙ্গে তাদের নৈকট্য যত বেশি হয়, সরকার এবং সরকারের কার্যাবলিতে অংশগ্রহণের জন্যও তাদের উৎসাহ তত বৃদ্ধি পায়। রাজনৈতিক সক্রিয়তাই জনসাধারণের রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি করে।

৫। **প্রশাসনিক নৈপুণ্য ঃ** যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার প্রশাসনিক নৈপুণ্য বৃদ্ধির সহায়ক। অঙ্গরাজ্যের সরকারসমূহ আঞ্চলিক এবং কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়ভূক্ত সমস্যার সঙ্গে জড়িত থাকে। অঙ্গরাজ্যের সরকার নিজ-নিজ ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালনে ব্যাপৃত থাকে বিধায় তাদের নৈপুণ্য ও পারদর্শিতা বৃদ্ধি পায়।

৬। **কেন্দ্রীয় স্বৈরাচার প্রতিরোধ ঃ** যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় স্বৈরাচার প্রতিরোধে সহায়ক। সংবিধান কর্তৃক অঙ্গরাজ্যগুলোকে ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়। এর ফলে কেন্দ্রীয় সরকার স্বীয় বিবেচনা ও সুবিধা অনুযায়ী রাজ্যের ক্ষমতা সংকোচন অথবা নিজের ক্ষমতার অপব্যবহার করতে পারে না।

৭। **আইন প্রণয়নে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ঃ** যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার আইন প্রণয়ন ও প্রশাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। এ পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুফলগুলো সমগ্র দেশে প্রয়োগ করা যায়। এর ফলে জাতীয় স্বার্থরক্ষায় কেন্দ্র এবং অঙ্গরাজ্যের মধ্যে একটি প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ গড়ে ওঠে। এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে এ ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার অবকাশ থাকে না।

৮। **স্থানীয় নেতৃত্বের বিকাশ ঃ** যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় অঙ্গরাজ্যসমূহ বেশির ভাগ স্থানীয় সমস্যাসমূহ কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তা ছাড়া মীমাংসা করে থাকে। এর ফলে তাদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি বিকশিত হয়। এ অভিজ্ঞতা ও নেতৃত্ব পরবর্তীতে জাতীয় সমস্যা সমাধানে সহায়ক হয়।

৯। **রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ঃ** যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের বিপুলসংখ্যক নাগরিক শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পায় এবং রাজনৈতিক শিক্ষা লাভ করে থাকে। রাজ্যসমূহের জন্য পৃথক আইনসভা, নির্বাহী বিভাগ ও বিচারালয় থাকার ফলে এককেন্দ্রিক ব্যবস্থার তুলনায় অধিক সংখ্যক লোক শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করে এবং শাসন ব্যবস্থাকে আরো শক্তিশালী করে।

পরিশেষে বলা যায় যে, আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ এবং রাজনৈতিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার অতুলনীয়। তাই এ সরকার ব্যবস্থা বহু জাতি, বহু ভাষা, বহু সংস্কৃতির দেশগুলোতে জাতীয় সংহতির সহায়ক।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সমস্যাবলী

বর্তমান সময়ে সারা পৃথিবীতে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার কোন সমস্যা নেই। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ নানা দৃষ্টিকোণ থেকে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সমস্যাগুলো আলোচনা করেছেন। নিচে তার বর্ণনা করা হল ঃ

১। **দুর্বল সরকার ব্যবস্থা ঃ** যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবসায় কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যের মধ্যে সংবিধান কর্তৃক ক্ষমতা বণ্টিত হওয়ার ফলে এককেন্দ্রিক সরকার অপেক্ষা এ সরকার দুর্বল হতে বাধ্য। এ ব্যবস্থায় কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যের অথবা রাজ্যের সঙ্গে বিরোধের ফলে সরকার দুর্বল হয়ে পড়ে।

২। **সমন্বয় সাধন দুঃসাধ্য ঃ** যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় এবং অঙ্গরাজ্যগুলোর মধ্যে ক্ষমতা, নীতি ও কর্মসূচির সমন্বয় সাধন দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। রাজনৈতিক কারণে বিভিন্ন রাজ্য সরকার বিভিন্ন কর্মসূচির ভিত্তিতে প্রশাসন পরিচালনা করলে, বিশেষভাবে কেন্দ্র এবং রাজ্যের নীতির মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হলে প্রশাসনিক জটিলতা সৃষ্টি হয়।

৩। **অগ্রগতি ব্যাহত ঃ** যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা জাতির অগ্রগতিকে ব্যাহত করতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয় হওয়ার ফলে পরিবর্তিত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে দ্রুত লয়ে চলার পথে বাধার সৃষ্টি হয়।

৪। **জাতীয় স্বার্থ অবহেলিত ঃ** যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় প্রতিটি অঙ্গরাজ্যে বসবাসকারী জনগণ সংশ্লিষ্ট অঙ্গরাজ্যের প্রতি তাদের প্রাথমিক আনুগত্য প্রকাশ করে। স্বাভাবিকভাবেই আঞ্চলিক স্বার্থের সঙ্গে জনগণের প্রাথমিক স্বার্থ জড়িত থাকে বলেই অনেক ক্ষেত্রেই তারা বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থ সম্পর্কে সচেতন থাকে না এবং অনেক ক্ষেত্রেই জাতীয় স্বার্থের তুলনায় আঞ্চলিক স্বার্থের প্রতিই বেশি অঙ্গীকারবদ্ধ থাকে।

৫। **বিরোধ সৃষ্টি ঃ** যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় কেন্দ্র এবং রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টিত হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক কারণে বিরোধ সৃষ্টি হতে পারে।

৬। **জটিল সংবিধান ঃ** যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার সংকটকালীন পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের অনুকূল নয়, যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান জটিল। প্রয়োজন অনুযায়ী তাকে সংশোধন করে জরুরি সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। তাছাড়া অঙ্গরাজ্যের সরকারের বিরোধীতার ফলে বহু ক্ষেত্রে জরুরি ভিত্তিতে সমস্যার সমাধানে বাধা সৃষ্টি হয়।

৭। **ব্যয়-বহুল ঃ** যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার পরিচালনা ব্যয়-বহুল। কেন্দ্র এবং রাজ্যে সরকার পরিচালনার জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয়। বহু ক্ষেত্রে অর্থের অপচয়ও ঘটে।

৮। **ক্ষমতা বণ্টনের সমস্যা ঃ** যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে ক্ষমতা বণ্টনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রের প্রাধান্যের স্বীকৃতি এবং অঙ্গরাজ্যসমূহের কেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল করে তোলার নীতি অঙ্গরাজ্যের স্বাতন্ত্র্য ব্যাহত করে। অর্থনৈতিক ক্ষমতার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভরশীলতা যত বৃদ্ধি পায় অঙ্গরাজ্যের স্বাতন্ত্র্যও তত বেশি ব্যাহত হয়। ভারতের মত রাষ্ট্রে এ ধরনের সমস্যা মাঝে মাঝে দেখা দেয়।

৯। **সংকীর্ণতাবাদী আন্দোলন ঃ** যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে কেন্দ্রের নীতি সিদ্ধান্তের ফলে যদি দীর্ঘকাল ধরে কোন অঞ্চলের দাবি উপেক্ষিত হয়, তাহলে এর বিরুদ্ধে সংকীর্ণতাবাদী আন্দোলন গড়ে উঠতে পারে। বস্তুত: যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার সব সময়ে জাতীয় ঐক্যের অনুকূল হয় না।

১০। **দীর্ঘসূত্রিতা ঃ** যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় এবং আঞ্চলিক প্রশাসন থাকায় কখনো কখনো সিদ্ধান্ত গ্রহণে দীর্ঘসময় ব্যয় হয়। বিশেষ পরিস্থিতিতে এককেন্দ্রিক সরকার যেভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারে, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে সেটা কঠিন হয়ে

পড়ে। আবার কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতা ও মতামত পেতে দীর্ঘসূত্রিতার কারণে আঞ্চলিক সরকারের কাজের গুরুত্বই অনেক সময় কমে যায়।

১১। **বিচ্ছিন্নতাবাদের আশঙ্কা ঃ** যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে সকল প্রদেশে সমানভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয় না। অনেক প্রদেশ আবার রাজনৈতিক যোগাযোগের কারণে পিঁছিয়ে পড়ে। তখন তারা অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। এ ধরনের অবস্থা অনেক দিন চলতে থাকলে এবং কোন একটি প্রদেশের অনেক মানুষের মধ্যে কেন্দ্রের ব্যাপারে বঞ্চনার বোধ দেখা দিলে বিচ্ছিন্নতাবাদ জন্ম নেয়ার আশঙ্কা দানা বেধে উঠে।

পরিশেষে বলা যায় যে, সংবিধান বর্ণিত পন্থাতে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলো নিজ-নিজ কর্মপন্থা নির্ধারণ করলে, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা থেকে গণতন্ত্রের সর্বোচ্চ সুফল অর্জন করা সম্ভব।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	আপনি কি যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার সমর্থন করেন? উত্তরের পক্ষে যুক্তি দিন?

সার-সংক্ষেপ

যে সরকার ব্যবস্থায় কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতা সাংবিধানিক উপায়ে বন্টন করা হয় এবং উভয় সরকার স্ব-স্ব ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করে ও স্বাতন্ত্র্য ক্ষমতা চর্চা করে তাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বলে। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থা আয়তনে বৃহৎ রাষ্ট্রের জন্য বেশি উপযোগী। কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে সবসময় সমন্বয় ও যোগাযোগ রক্ষা করে চলতে হয়। যার জন্য রাষ্ট্রের অগ্রগতি ব্যাহত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.১১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন

১। কেন্দ্রিয় স্বৈরাচার প্রতিরোধ করে কোন ব্যবস্থা?

ক) যুক্তরাষ্ট্রীয় খ) এককেন্দ্রিক
গ) মন্ত্রিপরিষদ শাসিত ঘ) স্বৈরাচারী

২। বিচ্ছিন্নতাবাদের আশঙ্কা থাকে কোন ব্যবস্থাতে?

ক) এককেন্দ্রিক খ) যুক্তরাষ্ট্রীয়
গ) রাষ্ট্রপতি শাসিত ঘ) স্বৈরাচারী

৩। প্রশাসনের কোন সমস্যাটি যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাতে দেখা যায়?

ক) অতিদ্রুততা খ) দীর্ঘসূত্রিতা
গ) সংকীর্ণতা ঘ) তথ্যহীনতা

পাঠ-৭.১২ এককেন্দ্রিক সরকার ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার (Unitary and Federal Government)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- এককেন্দ্রিক সরকার ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	স্থানীয় সরকার, অঙ্গরাজ্য, আইনের বৈধতা, আইন সভার প্রাধান্য।

এককেন্দ্রিক সরকার ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের পার্থক্য

এককেন্দ্রিক সরকার হল এমন সরকার, যেখানে শাসন বিষয়ক ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে কেন্দ্রীভূত থাকে। যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স এককেন্দ্রিক সরকারের যথার্থ দৃষ্টান্ত। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় সংবিধান কর্তৃক কেন্দ্র এবং অঙ্গরাজ্যের সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টিত হয়। এককেন্দ্রিক এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের মধ্যে কয়েকটি মৌলিক পার্থক্য আছে। নিম্নে পার্থক্যসমূহ আলোচনা করা হল ঃ

১। **রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে ঃ** এককেন্দ্রিক সরকারে রাষ্ট্র পরিচালনার একচ্ছত্র ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত। তার ইচ্ছা এবং সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ভিন্ন ধরণের। কেন্দ্রীয় সরকার এবং অঙ্গরাজ্যের সরকারসমূহ নিয়ে এই সরকার গঠিত হয়। এই সরকারে অঙ্গরাজ্যের সরকারসমূহের অস্তিত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল নয়। তারা সংবিধান কর্তৃক গঠিত। এ কারণেই তাদের স্বতন্ত্র সাংবিধানিক মর্যাদা আছে। সংবিধানের কাছেই তারা দায়বদ্ধ থাকে।

২। **সংবিধানের ধরণ ঃ** এককেন্দ্রিক সংবিধান ব্রিটেনের মতো অলিখিত এবং ফ্রান্সের মতো লিখিত হতে পারে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান অবশ্যই লিখিত হবে। এর প্রধান কারণ হল এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে সকল ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে। সেই কারণে সংবিধান অলিখিত হলেও কোন অসুবিধা নেই। পক্ষান্তরে, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে কেন্দ্রীয় ও অঙ্গরাজ্য উভয়েরই সরকার থাকে। সংবিধানে প্রত্যেকের নিজ নিজ এখতিয়ার এবং ক্ষমতা নির্দিষ্ট না থাকলে উভয় পক্ষের মধ্যে বিরোধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে।

৩। **সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে ঃ** এককেন্দ্রিক সরকার নিজের প্রয়োজন অনুসারে অপেক্ষাকৃত সহজে আইন ও ক্ষমতার পরিবর্তন ঘটাতে পারে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে সংবিধান সংশোধনের পদ্ধতি সুপরিবর্তনীয় হলে এবং ঐ ক্ষমতা এককভাবে কেন্দ্রের হাতে ন্যস্ত থাকলে, কেন্দ্রীয় সরকার অঙ্গরাজ্যের ক্ষমতা সংকুচিত করতে পারে। এ কারণেই যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানের সংশোধন পদ্ধতি দুষ্পরিবর্তনীয় হতে বাধ্য।

৪। **আনুগত্য প্রকাশের ক্ষেত্রে ঃ** এককেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থায় নাগরিকদের কেবল কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে থাকে। অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থায় নাগরিকদের বাস্তবে নিজ-নিজ রাজ্যের সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি আনুগত্য ধারণ করতে হয়।

৫। **আইন সভার প্রাধান্যের ক্ষেত্রে ঃ** এককেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় আইনসভার সার্বভৌমত্ব স্বীকার করা হয়। অর্থাৎ এখানে আইনসভার প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। এখানে আইন সভা কর্তৃক প্রণীত আইনকে অমান্য করা কঠিন। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থাতে আইন সভার পরিবর্তে সংবিধানের সার্বভৌমত্ব অধিক গুরুত্ব পেয়ে থাকে।

৬। **নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ঃ** এককেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থায় অঙ্গরাজ্যের সরকারসমূহ কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন। পক্ষান্তরে, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থায় অঙ্গরাজ্যের সরকারসমূহ কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত থেকে সরকার পরিচালনা করে।

৭। **স্থানীয় সরকার ঃ** এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থায় প্রশাসনের সুবিধার জন্য বিভিন্ন স্থানীয় সরকার গঠন হতে পারে। তবে এসব স্থানীয় সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন এবং তার প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে। অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় আঞ্চলিক বা স্থানীয় সরকারসমূহ সংবিধান দ্বারা গঠিত এবং ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, এককেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থা ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থা দু'টি পৃথক ও বিপরীতধর্মী সরকার ব্যবস্থা। কোন রাষ্ট্র কোন ধরনের সরকার গ্রহণ করবে তা সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের আয়তন, নাগরিকের মনোভাব সর্বোপরি বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের মূল পার্থক্যগুলো চিহ্নিত করুন।

সার-সংক্ষেপ

এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের প্রকৃতি ও স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গেলে তাদের মধ্যে স্বাভাবিক কতকগুলো পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এককেন্দ্রিক সরকারে যেখানে ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতে ন্যস্ত থাকে, সেখানে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে ক্ষমতা সংবিধান অনুসারে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.১২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন

১। নিচের কোন দেশে এককেন্দ্রিক সরকার বিদ্যমান?
(ক) যুক্তরাষ্ট্র (খ) যুক্তরাজ্য
(গ) ভারত (ঘ) কানাডা

২। সংবিধান সংশোধন কোন ব্যবস্থাতে সহজ?
(ক) এক কেন্দ্রিক খ) যুক্তরাষ্ট্রীয়
(গ) নির্দলীয় (ঘ) কোনটি নয়

৩। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় মূল ক্ষমতা কার হাতে?
(ক) কেন্দ্র (খ) রাজ্য
(গ) আমলাতন্ত্র (ঘ) সেনাবাহিনী

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুপদী নির্বাচনী প্রশ্ন

১। সরকারের প্রধান লক্ষ্য–
(i) কঠোর অনুশাসন (ii) জনকল্যাণ নিশ্চিত (iii) বিদ্রোহ দমন
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii
(গ) i ও ii (ঘ) ii ও iii

২। কীভাবে গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করা যায়?
(i) ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে;
(ii) ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে;
(iii) সচেতনতার মাধ্যমে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) i ও ii
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩নং ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দিন ঃ

সৈকত বাংলাদেশের নাগরিক। বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক দেশ। তথাপি এদেশে এখনও দুর্নীতি বিদ্যমান। অনিয়মও রয়েছে যথেষ্ট। উক্ত সমস্যাসমূহ থেকে মুক্তির জন্য সৈকত মনে করে এদেশে আইনের শাসন, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে।

৩। অনুচ্ছেদের আলোকে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বর্তমানে যে জিনিসটি খুবই দরকার–

(ক) স্বৈরতন্ত্র (খ) রাজতন্ত্র
(গ) সুনাগরিক (ঘ) বুদ্ধিজীবী

৪। দুর্নীতি ও অনিয়ম বাংলাদেশের কোন ধরনের সমস্যা?

(ক) স্থানীয় সমস্যা (খ) আঞ্চলিক সমস্যা
(গ) জাতীয় সমস্যা (ঘ) আন্তর্জাতিক সমস্যা

নিচের ছকটি দেখে ৫নং প্রশ্নের উত্তর দিন ঃ

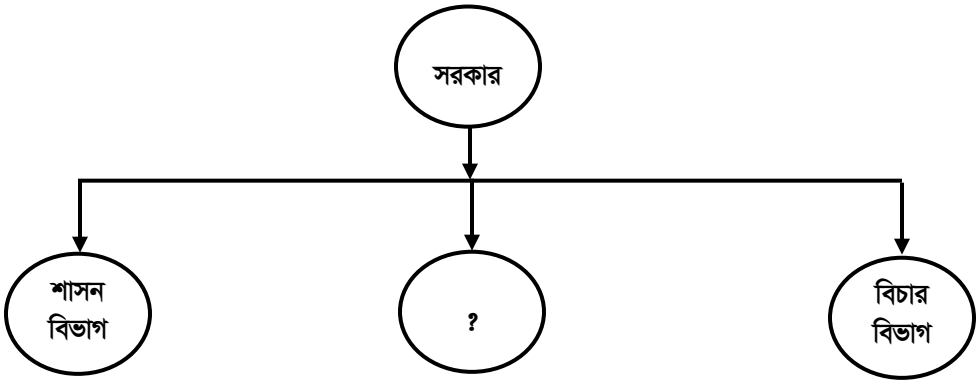

৫। (?) চিহ্নিত স্থানটি কোনটি নির্দেশ করে?

(ক) আইন বিভাগ (খ) সামরিক বাহিনী
(গ) আমলাতন্ত্র (ঘ) এলিট

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৬নং ও ৭নং প্রশ্নের উত্তর দিন ঃ

'ক' নামক রাষ্ট্রে আইনের অনুশাসন, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, শক্তিশালী নির্বাচন কমিশন বিদ্যমান। অপরদিকে 'খ' নামক রাষ্ট্রের জনগণ এসব প্রতিষ্ঠার জন্য দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। তবে দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রামের পর সেখানে গণতন্ত্র চালু হলেও আইনসভার নিকট শাসন বিভাগের জবাবদিহিতা নেই।

৬। 'ক' নামক রাষ্ট্রে কোন ধরনের সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান?

(ক) এককেন্দ্রিক (খ) যুক্তরাষ্ট্রীয়
(গ) সংসদীয় (ঘ) রাষ্ট্রপতি শাসিত

৭। উদ্দীপকে বর্ণিত 'খ' নামক রাষ্ট্রে সরকারের যে বিভাগের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে তা হল–

(ক) আইন (খ) শাসন
(গ) বিচার (ঘ) নির্বাচক মন্ডলী

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। নিচের ছকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন ঃ

A সরকার ব্যবস্থা		B সরকার ব্যবস্থা	
#	প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রীগণ তাঁদের কাজে জন্য সংসদের নিকট দায়ী।	#	প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রীগণ তাঁদের কাজে জন্য সংসদের নিকট দায়ী নয়।
#	শাসন বিভাগের সদস্যগণ আইন সভারও সদস্য হয়ে থাকেন।	#	শাসন, আইন ও বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ করা হয়ে থাকে।
#	জনমত দ্বারা পরিচালিত হয়।	#	জাতীয় সংকটকালে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

(ক) গণতন্ত্রের সংজ্ঞা দিন।

(খ) গণতন্ত্রের শ্রেণিবিভাগ করুন।

(গ) A দ্বারা কোন ধরনের সরকার ব্যবস্থাকে বোঝানো হয়েছে? ব্যাখ্যা করুন।

(ঘ) আপনি কি মনে করেন B অপেক্ষাকৃত উত্তম সরকার ব্যবস্থা? বিশ্লেষণ করুন।

২। নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।

মি. রাহুল 'ক' রাষ্ট্রের একজন মন্ত্রী। তাঁর কার্যক্রমের জন্য তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে ও তাঁর মন্ত্রিসভা দেশের জাতীয় সংসদের নিকট জবাবদিহি করতে হয়। তাদের দেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করেন। তাদের দেশের আইন অনুযায়ী অনাস্থা দিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারলে তাদের পদত্যাগ করতে হয়।

(ক) আব্রাহাম লিঙ্কন প্রদত্ত গণতন্ত্রের সংজ্ঞা দিন।

(খ) যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থা কীরূপ?

(গ) মি. রাহুল এর দেশের সরকার ব্যবস্থা কোন ধরনের সরকার ব্যবস্থা? ব্যাখ্যা করুন।

(ঘ) "উদ্দীপকে উল্লিখিত সরকার ব্যবস্থাই উত্তম সরকার ব্যবস্থা।"– বিশ্লেষণ করুন।

৩। নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।

রায়হান 'ক' রাষ্ট্রের এবং রাহাত 'খ' রাষ্ট্রের নাগরিক। রায়হানের রাষ্ট্রের সরকার জনগণের ভোটে নির্বাচিত হন। উক্ত রাষ্ট্রের সরকার প্রধান ও মন্ত্রিসভা আইনসভার নিকট জবাবদিহি করেন না। অন্যদিকে রাহাতের রাষ্ট্রের সরকার জনগণের ভোটে নির্বাচিত হন এবং সরকার প্রধান ও মন্ত্রিসভা আইনসভার নিকট জবাবদিহি করে থাকে। যার ফলে রাষ্ট্রের উন্নয়ন দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায়।

(ক)সরকার কী?

(খ) এককেন্দ্রিক সরকার বলতে কি বুঝেন?

(গ) এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের মধ্যে পার্থক্য নিরূপন করুন।

(ঘ) রায়হান ও রাহাতের দেশের দুটি সরকার ব্যবস্থার মধ্যে বাংলাদেশের জন্য আপনি কোন ধরনের সরকার ব্যবস্থাকে উত্তম বলে মনে করবেন। ব্যাখ্যা দিন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.১ ঃ ১। গ ২। খ ৩। গ ৪। ক ৫। ঘ ৬। ক ৭। খ ৮। গ ১০। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.২ ঃ ১। ক ২। খ ৩। খ ৪। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৩ ঃ ১। খ ২। ঘ ৩। ঘ ৪। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৪ ঃ ১। খ ২। গ ৩। ক ৪। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৫ ঃ ১। খ ২। ক ৩। খ ৪। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৬ ঃ ১। খ ২। ঘ ৩। ক ৪। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৭ ঃ ১। ক ২। খ ৩। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৮ ঃ ১। গ ২। খ ৩। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৯ ঃ ১। খ ২। ক ৩। গ ৪। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.১০ ঃ ১। গ ২। ক ৩। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.১১ ঃ ১। ক ২। খ ৩। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.১২ ঃ ১। খ ২। ক ৩। ক

চূড়ান্ত মূল্যায়ন ঃ ১। খ ২। গ ৩। গ ৪। গ ৫। ক ৬। গ ৭। খ

রাজনৈতিক দল, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী, নেতৃত্ব ও সুশাসন (Political Party, Pressure Group, Leadership and Good Governance)

ইউনিট ৮

আদর্শ গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দল অপরিহার্য উপাদান হিসেবে স্বীকৃত। রাজনৈতিক দল ব্যতীত গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কল্পনা করা যায় না। দক্ষ ও যোগ্য নেতৃত্বের উপর যে কোন সরকার ব্যবস্থার সাফল্য নির্ভর করে। সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য শক্তিশালী রাজনৈতিক দলের সাথে কার্যকরী নেতৃত্ব আবশ্যকীয়। এই ইউনিটের মাধ্যমে রাজনৈতিক দল, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী ও সুশাসন নিশ্চিতকরণে নেতৃত্বের ভূমিকা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৮.১ঃ রাজনৈতিক দলের ধারণা ও বৈশিষ্ট্য	পাঠ-৮.৬ঃ চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ভূমিকা
পাঠ-৮.২ঃ রাজনৈতিক দলের কার্যাবলি	পাঠ-৮.৭ঃ নেতৃত্বের ধারণা ও প্রকারভেদ
পাঠ-৮.৩ঃ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিরোধী দলের ভূমিকা	পাঠ-৮.৮ঃ নেতৃত্বের গুণাবলি
পাঠ-৮.৪ঃ চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ধারণা ও বৈশিষ্ট্য	পাঠ-৮.৯ঃ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্ব
পাঠ-৮.৫ঃ রাজনৈতিক দল ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী	

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ**

পাঠ-৮.১ রাজনৈতিক দলের ধারণা ও বৈশিষ্ট্য (Concepts and Characteristics of Political Party)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- রাজনৈতিক দলের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- রাজনৈতিক দলের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	রাজনৈতিক দল, মতাদর্শ, জাতীয় স্বার্থ, নিয়মতান্ত্রিকতা, জনবিচ্ছিন্ন।

রাজনৈতিক দলের ধারণা

দল ব্যবস্থা বর্তমান প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থার একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। কার্যত বর্তমান যুগে রাজনৈতিক দলের সাহায্যেই শাসনকার্য পরিচালিত হয়। এই দলীয় রাজনীতির উদ্ভব অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালের ঘটনা। জন ব্লন্ডেল (John Blondel)-এর মতানুসারে দল-ব্যবস্থার আলোচনা এখনও প্রাথমিক পর্যায়েই থেকে গেছে। প্রাচীনকালে গ্রিস ও রোমে বিভিন্ন বংশ ও গোষ্ঠী রাজনৈতিক দলের ভূমিকা গ্রহণ করত। মধ্যযুগে সেই কর্তৃত্ব অভিজাত সম্প্রদায়, পুরোহিত সম্প্রদায়, বণিক শ্রেণির মত সমসাময়িক প্রভাবশালী সম্প্রদায়ের হাতে চলে যায়। প্রাচীনকালে গ্রিক নগর রাষ্ট্রে বা রোমের নগর জীবনে অথবা মধ্যযুগে রাজনৈতিক দলের উপযোগিতা অনুভূত হয়নি। প্রকৃত প্রস্তাবে রাজনৈতিক দলের উদ্ভব ও বিকাশের বিষয়টি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিকাশের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। আধুনিক অর্থে রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি হয় সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে। রাণী প্রথম এলিজাবেথের রাজত্বকালে হুইগ (Whig) ও টোরি (Tory) নামক দুইটি দলের সৃষ্টি হয়।

বর্তমানে দলব্যবস্থা হল গণতন্ত্রের প্রাণস্বরূপ। রাজনৈতিক দল সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মতভাবে আলোচনা মূলত: শুরু হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে। রাজনৈতিক দল নিয়ে যে শাস্ত্র আলোচনা করে তা "Stasiology" নামে পরিচিত। 'Stasis' শব্দের অর্থ বিরোধীতার মনোভাব। এই শব্দটি গ্রিক থেকে ইংরেজি ভাষায় এসেছে। বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা দিয়েছেন। এসব সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করে বলা যায়, বেশ কিছু সংখ্যক ব্যক্তি যদি রাষ্ট্রের সামাজিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি বিশেষ সমস্যা সংক্রান্ত কতকগুলো মূল বিষয়ে সম-মতাবলম্বী হয় এবং মতাদর্শের মূলগত ঐক্যের ভিত্তিতে দেশের উন্নতি বিধানের জন্য শাসন পরিচালনার সুযোগ লাভের উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধভাবে প্রচারকার্য চালিয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্জনের চেষ্টা করে তবে সেই সংঘবদ্ধ ব্যক্তিদের সংগঠনটিকে রাজনেতিক দল বলে।

এডমন্ড বার্ক (Edmand Burke) বলেন, "কতকগুলো নির্দিষ্ট নীতির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে জাতীয় স্বার্থ সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে সম্মিলিত জনসমষ্টিকে রাজনৈতিক দল বলা হয়।"

অধ্যাপক আর্নেস্ট বার্কার (Ernest Barker)-এর মতানুসারে, "বিভিন্ন মতবাদের দ্বারা পরিচালিত হলেও সকল রাজনৈতিক দলই জাতীয় স্বার্থের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে সমগ্র জাতির সাধারণ স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়ে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণের দ্বারা নির্বাচকমন্ডলীর সমর্থন পেতে সচেষ্ট হয়।"

অধ্যাপক আর এম ম্যাকাইভার (R.M. MacIver) বলেন, নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে কোন সংঘবদ্ধ জনসমাজ বৈধ উপায়ে শাসন ক্ষমতা দখল করতে চেষ্টা করলে তাকে রাজনৈতিক দল বলে।

অতএব, রাজনৈতিক দল বলতে একই রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী এমন এক দল নাগরিককে বোঝায় যারা সংঘবদ্ধ হয়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য গঠনের জন্য শাসনতান্ত্রিক উপায়ে সরকারি ক্ষমতা অর্জন করার চেষ্টা করে।

রাজনৈতিক দলের বৈশিষ্ট্য

রাজনৈতিক দলের একটি স্থায়ী সংগঠন থাকে এবং এ সংগঠনের মাধ্যমে এটি কাজ করে। একটি রাজনৈতিক দলের সদস্যবৃন্দ একই মতাদর্শে বিশ্বাসী হয়ে রাষ্ট্র ক্ষমতা অর্জনের জন্য কাজ করে। নিম্নে রাজনৈতিক দলের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ তুলে ধরা হল –

১। **সমমতাদর্শ ঃ** সমমতাদর্শে অনুপ্রাণিত, ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত ব্যক্তিদের নিয়ে রাজনৈতিক দল গঠিত হয়। বিস্তারিত কার্যক্রম প্রসঙ্গে কিংবা কর্ম পদ্ধতি দলের সদস্যদের মধ্যে মতভেদ থাকতে পারে। কিন্তু একটি দল হিসাবে বিরাজ করার জন্য এর সদস্যদের মধ্যে মতাদর্শের মূলগত ঐক্য থাকতে হবে ।

২। **নির্দিষ্ট কর্মসূচি ঃ** প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের নির্দিষ্ট কর্মসূচি থাকে। এই কর্মসূচিকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য দলগুলো নিয়মতান্ত্রিক এবং সংবিধানসম্মত পদ্ধতিতে অগ্রসর হয়।

৩। **জাতীয় স্বার্থ ঃ** রাজনৈতিক দল মাত্রই জাতীয় স্বার্থের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়। প্রত্যেক দল সমগ্র জাতির সাধারণ স্বার্থ সাধনে আত্মনিয়োগ করে। অন্যথায় তা জনবিচ্ছিন্ন দলে পরিণত হয়।

৪। **আলাপ-আলোচনা ঃ** দেশ ও দেশবাসীর সমসাময়িক সমস্যাদি সম্পর্কে অবিরত আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে দলমাত্রই নিজ মতাদর্শের অনুকূল জনমত গঠনের চেষ্টা করে।

৫। **সরকার গঠন ঃ** প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের চূড়ান্ত লক্ষ্য হল জনসমর্থনের ভিত্তিতে নির্বাচনে জয়ী হয়ে সরকার গঠন করা এবং শাসনকার্য পরিচালনার মাধ্যমে দলীয় আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে কার্যকর করা। এ কারণে রাষ্ট্র ক্ষমতা লাভের উদ্দেশ্যহীন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, কল্যাণমূলক বা অন্য কোন ধরণের সংগঠনকে রাজনৈতিক দল বলা হয় না। জোসেফ শ্যুমপিটার (Joseph Schumpeter) বলেন, "The first and foremost aim of each political party is to prevail over others in order to get into power or to stay in it."

৬। **রাজনৈতিক একক ঃ** রাজনৈতিক দলের সকল সদস্যের মধ্যে রাজনৈতিক সমঝোতা থাকা আবশ্যক। দলের সদস্যদের কার্যপদ্ধতিতে এমনভাবে সংগঠিত হতে হয়, যাতে করে তারা একটি রাজনৈতিক এককে পরিণত হয়। রাজনৈতিক এককে পরিণত হবার পর তারা দলীয় স্বার্থে কাজ করে থাকে।

৭। **সংঘবদ্ধতা ঃ** দলীয় কর্মীদের একই মনমানসিকতা ও মতাদর্শে সুসংবদ্ধ হতে হয়। তাদের মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্য ও কর্মস্পৃহা থাকতে হয়।

৮। **নিয়মতান্ত্রিকতা ঃ** রাজনৈতিক দলের মূল লক্ষ্য ক্ষমতা গ্রহণ হলেও, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাতে সে পথ হবে নিয়মতান্ত্রিক। নিয়মতান্ত্রিক বা শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতিই ক্ষমতা অর্জনের মূলমন্ত্র। একটি গণতান্ত্রিক দল কখনোই রাজনৈতিক দল নীতি-বহির্ভূত পদ্ধতিতে ক্ষমতায় আসতে পারে না। অবৈধ ক্ষমতা দখল বৈধতার সংকট তৈরি করে।

৯। **দল গঠন ঃ** কেবল স্বদেশী নাগরিকগণই রাজনৈতিক দল গঠন করতে পারেন; বিদেশিগণ পারেন না। মতাদর্শ, জাতি, ধর্ম, অর্থনৈতিক স্বার্থ এবং কর্মপন্থার বিভিন্নতা হেতু বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি হয়ে থাকে।

১০। **দলীয় আদর্শ অনুশীলন ঃ** গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাতে একটি রাজনৈতিক দল নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় যায়। ক্ষমতায় যাওয়ার পথে যে কোন দলকে তার মতাদর্শ বিষয়ে জনগণকে জানাতে হয়। জনগণের সমর্থন পেয়ে ক্ষমতায় যেতে পারলে, একটি রাজনৈতিক দল নিজ মতাদর্শ বাস্তবায়নের বৈধতা পায়।

পরিশেষে বলা যায়, রাজনৈতিক দল হচ্ছে মতাদর্শ ভিত্তিক সুসংবদ্ধ সংগঠন। এই সংগঠনের মূল লক্ষ্য রাষ্ট্র ক্ষমতা লাভ করা। রাজনৈতিক দলকে জনসমর্থন আদায়ের জন্য রাজনৈতিক কর্মসূচির বাইরেও, আর্থ-সামাজিক বিষয়াদি নিজ কর্মসূচিতে সন্নিবেশিত করতে হয়।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	রাজনৈতিক দলের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।

সার-সংক্ষেপ

রাজনৈতিক দল হল গণতন্ত্রের মূল চালিকা শক্তি। যখন কিছু সংখ্যক মানুষ মতাদর্শগতভাবে একমত পোষণ করে এবং ন্যূনতম কর্মসূচির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হয় তখন তাকে রাজনৈতিক দল বলে। সংক্ষেপে রাজনৈতিক দল হল একটি জনসমষ্টি যা ক্ষমতা অর্জন করার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে চেষ্টা করে। ব্যাপক অর্থে বলা যায়, রাজনৈতিক দল হল কোন জনসমষ্টি যা রাষ্ট্রের সমস্যাবলি এবং সমাধানের উপায় সম্পর্কে ঐক্যমত পোষণ করে এবং নির্দিষ্ট আদর্শের ভিত্তিতে জনমতের মাধ্যমে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার চেষ্টা করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। Stasis শব্দটি কোন ভাষার শব্দ?
(ক) ল্যাটিন (খ) গ্রীক
(গ) ফরাসি (ঘ) ইংরেজি

২। "কতকগুলো নির্দিষ্ট নীতির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে জাতীয় স্বার্থ সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে সম্মিলিত জনসমষ্টিকে রাজনৈতিক দল বলা হয়"– উক্তিটি কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর?
(ক) এডমন্ড বার্ক (খ) আর্নেস্ট বার্কার
(গ) ম্যাকাইভার (ঘ) লাসওয়েল

৩। "নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে কোন সংঘবদ্ধ জনসমাজ বৈধ উপায়ে শাসন ক্ষমতা দখল করতে চেষ্টা করলে তাকে রাজনৈতিক দল বলে।"– কে বলেছেন?
(ক) লাসওয়েল (খ) এডমন্ড বার্ক
(গ) প্লেটো (ঘ) ম্যাকাইভার

৪। রাজনৈতিক দল নিয়ে যে শাস্ত্র আলোচনা করে তাকে বলে–
(ক) Astrology (খ) Stasiology
(গ) Geology (ঘ) Sociology

পাঠ-৮.২ রাজনৈতিক দলের কার্যাবলি (Functions of Political Party)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- রাজনৈতিক দলের কার্যাবলি সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা, রাজনৈতিক নিয়োগ, দেশপ্রেম, জনমত, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ।

রাজনৈতিক দলের কার্যাবলি

সাধারণ চিন্তাধারায় রাজনৈতিক দলের কার্যাবলিকে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা, রাষ্ট্র ক্ষমতা লাভ ও পরিচালনা সংক্রান্ত কার্যাবলির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা রাজনৈতিক দলের কার্যাবলি কেবলমাত্র ক্ষমতা সংশ্লিষ্ট বলে মনে করেন না। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অ্যালান বল (Alan Ball) এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন, "রাজনৈতিক দলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে ঐক্যবদ্ধ, সরলীকৃত এবং স্থিতিশীল করা।" নিম্নে রাজনৈতিক দলের নানাবিধ কার্যাবলি সম্পর্কে আলোচনা করা হল–

১। **রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্থায়িত্ব সংরক্ষণ ঃ** রাজনৈতিক পদ্ধতির ঐক্যবদ্ধকরণ ও সংরক্ষণ রাজনৈতিক দলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। অধ্যাপক অ্যালান বল (Alan Ball) তাঁর Comparative Politics and Government নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেন, "One of the most important functions of political parties is that of uniting, simplifying and stabilising the political process" রাজনৈতিক দলের কার্যপ্রক্রিয়ার মাধ্যমে রাষ্ট্র তথা রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংহতি ও স্থায়িত্ব সংরক্ষিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়।

২। **রাষ্ট্র ক্ষমতা লাভ ও সরকার গঠন ঃ** প্রতিটি রাজনৈতিক দলের মূল লক্ষ্য হল রাষ্ট্র ক্ষমতা লাভ এবং সরকার গঠন। ক্ষমতায় এসে নিজের কর্মসূচি ও মতাদর্শকে বাস্তবায়িত করার জন্য প্রতিটি দলই উদ্যোগ গ্রহণ করে। আধুনিক গণতান্ত্রিক দেশে একাধিক রাজনৈতিক দল নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দলের লক্ষ্য হল ক্ষমতায় টিকে থাকা। আর বিরোধী দলসমূহ নিজ-নিজ আদর্শের ভিত্তিতে শাসক দলকে ক্ষমতাচ্যুত করতে চায়।

৩। **রাজনৈতিক সংযোগ সাধন ঃ** আধুনিক কালের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল রাজনৈতিক সংযোগ সাধন। রাজনৈতিক দল সরকার ও জনসাধারণের মধ্যে সংযোগ সৃষ্টি ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে অনন্য ভূমিকা পালন করে। সরকারের দায়িত্ব ও ভূমিকা এবং নাগরিক অধিকার সম্পর্কে দল জনগণকে অবহিত ও সতর্ক করে। স্ব স্ব মতাদর্শ ও কর্মসূচির পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক দল নির্বাচকমন্ডলীকে শিক্ষিত ও সচেতন করে তোলে। অধ্যাপক অ্যালান বল বলেন, "Political parties provide a link between government and people. They seek to educate, instruct and activate the electorate".

৪। **রাজনৈতিক নিয়োগ ঃ** রাজনৈতিক দল রাজনৈতিক নিয়োগের একটি অন্যতম প্রধান মাধ্যম। রাজনৈতিক নিয়োগ বলতে বোঝায়, কোন ব্যক্তিকে রাজনৈতিক ভূমিকায় অবতীর্ণ করানো। রাজনৈতিক দল প্রতিটি রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এ নিয়োগের দায়িত্ব বহন করে।

৫। **রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ঃ** রাজনৈতিক কার্যকলাপে নাগরিকদের অংশগ্রহণের সুযোগ ও সম্ভাবনা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। রাজনৈতিক দল জনসাধারণের সামনে বিভিন্ন রাজনৈতিক সমস্যা তুলে ধরে। এ সমস্ত রাজনৈতিক বিষয়াদি বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাদের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। তার ফলে রাজনৈতিক কাজকর্মে জনসাধারণের অংশগ্রহণের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

৬। **সমস্যা নির্বাচন ঃ** আধুনিক রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও অসংখ্য সমস্যা বিদ্যমান। অসংখ্য সমস্যাবলির মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলো নির্ধারণ করা রাজনৈতিক দলগুলোর প্রাথমিক কাজ।

৭। **সমস্যা সমাধান ঃ** রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাবলির ব্যাপারে রাজনৈতিক দল গুলি নিজ-নিজ দলীয় মতাদর্শের উপর ভিত্তি করে সেসব সমস্যার সমাধানকল্পে নীতি ও কর্মসূচি নির্ধারণ করে। প্রতিটি রাজনৈতিক দল বিশ্বাস করে যে, তার অনুসৃত নীতি ও কর্মসূচি অনুসরণ করে সমস্যার সমাধান সম্ভব।

৮। **জনমত গঠন ঃ** নির্ধারিত নীতি ও কর্মসূচির স্বপক্ষে জনমত গঠন করা রাজনৈতিক দলের উল্লেখযোগ্য কাজ। প্রতিটি দল সভা-সমিতি, পত্র-পত্রিকা, পুস্তক-পুস্তিকা, রেডিও-টিভি, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম প্রভৃতির মাধ্যমে প্রচারকার্য চালিয়ে নিজস্ব নীতি ও কর্মসূচির সমর্থনে জনমত গঠনের চেষ্টা করে।

৯। **প্রার্থী মনোনয়ন ঃ** আধুনিক গণতন্ত্রে প্রতিটি স্বীকৃত রাজনৈতিক দলের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করা। এই লক্ষ্যে নির্বাচনের সময় তারা প্রার্থী মনোনয়ন করে এবং সেসব প্রার্থীর সমর্থনে নির্বাচনী প্রচার-কার্য চালায়।

১০। **প্রতিশ্রুতি রক্ষা ঃ** প্রতিটি রাজনৈতিক দলের মূল লক্ষ্য হচ্ছে রাষ্ট্র সরকারি ক্ষমতা করায়ত্ব করে নিজ নীতি ও আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করা। নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের সমর্থন পেলে সেই উদ্দেশ্যকে সফল করে তোলার সুযোগ উপস্থিত হয়। যে দল নির্বাচনের প্রাক্কালে জনগণের নিকট প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি যথাযথভাবে পালন করতে পারে, সেই দল পরবর্তী নির্বাচনের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসমর্থন লাভ করার সম্ভাবনা থাকে।

১১। **সমন্বয় সাধন ঃ** সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সহযোগিতার বন্ধন সুদৃঢ় না হলে শাসন কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হতে পারে না। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সহযোগিতার বন্ধন সুদৃঢ়করণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ক্ষমতা-স্বতন্ত্রীকরণ নীতির উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসনব্যবস্থায় আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের মধ্যে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলই সহযোগিতার সেতু রচনা করে।

১২। **সরকার ও জনগণের মধ্যে সংযোগ সাধন ঃ** আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলগুলো সরকারের সাথে জনসাধারণের সংযোগ রক্ষা করে। সরকারি নীতির স্বপক্ষে ও বিপক্ষে প্রচারকার্য চালিয়ে জনমত গঠন করা রাজনৈতিক দলগুলোর কাজ।

১৩। **মতৈক্যের ভিত্তি ঃ** রাজনৈতিক দল জনসাধারণের মধ্যে মতৈক্যের ভিত্তি প্রস্তুত করে। জনসাধারণের বৃহত্তর আস্থা ছাড়া কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষেই টিকে থাকা সম্ভব নয়।

১৪। **জাতীয় স্বার্থ ঃ** রাজনৈতিক দলগুলো জনগণের মধ্যে জাতীয় স্বার্থের বোধ সৃষ্টিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। রাজনৈতিক দলের নানাবিধ কার্যক্রম দ্বারা জাতি, বর্ণ কিংবা ধর্মগত সংকীর্ণতা দূর হয়ে বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে দেশবাসীর মধ্যে স্বদেশ প্রেম জাগ্রত হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, রাজনৈতিক দলের কার্যাবলি বহুমুখী। রাজনৈতিক দলবিহীন আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিচালনা সম্ভব নয়। রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় আসার মধ্য দিয়ে নিজ-নিজ নীতি ও কর্মসূচী বাস্তবায়ন করতে চায়।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	রাজনৈতিক দলের পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি চিহ্নিত করুন।

সার-সংক্ষেপ

আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের ভূমিকা অনস্বীকার্য। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা রাজনৈতিক দলের কার্যাবলি প্রসঙ্গে রাষ্ট্রে ক্ষমতা গ্রহন ছাড়াও অন্য কতকগুলো কার্যক্রমের কথা বলেছেন। এসব কার্যক্রমের মধ্যে আছে রাজনৈতিক নিয়োগ, রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ, স্বার্থের সমষ্টিকরণ ও স্বার্থের গ্রন্থিকরণ। আধুনিক যুগে রাজনৈতিক দলের নীতি আদর্শের মধ্যে পার্থক্য থাকতে পারে কিন্তু সকল দলের কার্যাবলি প্রায় একই রকম।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। 'Comparative Politics and Government' নামক গ্রন্থের লেখক কে?
(ক) ম্যাকাইভার (খ) হ্যারল্ড লাসওয়েল
(গ) অ্যালান বল (ঘ) আর্নেস্ট বার্কার

২। "Political parties provide a link between government and people" – উক্তিটি কে করেছেন?
(ক) স্যামুয়েল ফাইনার (খ) ম্যাকাইভার
(গ) অ্যালান বল (ঘ) হ্যারল্ড লাসওয়েল

৩। রাজনৈতিক দলের কাজ হল–
(i) সরকার গঠন করা (ii) জনমত গঠন করা
(iii) সমস্যা চিহ্নিত করা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) i ও ii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৪। রাজনৈতিক দলের প্রধান কাজ কোনটি?
(ক) রাজনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণ (খ) প্রার্থী মনোনয়ন
(গ) সরকার গঠন (ঘ) সমস্যা নির্বাচন

পাঠ-৮.৩ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিরোধী দলের ভূমিকা (Role of Opposition Party in a Democratic State)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিরোধী দলের ভূমিকা সম্পর্কে বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	গঠনমূলক সমালোচনা, রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ, জবাবদিহিতা, বিকল্প নীতি, গণতন্ত্র, বিরোধী দল।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিরোধী দলের ভূমিকা

দল প্রথার ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সে দলই শাসনকার্য পরিচালনা করে। নির্বাচনে পরাজিত দল বা দলগুলি আইন সভাতে বিরোধী দলের ভূমিকা নেয়। একটি আদর্শ বিরোধী দল কেবল বিরোধীতার খাতিরেই বিরোধীতা করে না। বরং সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা, ভুলগুলো ধরিয়ে দেয়া এবং জাতীয় স্বার্থে প্রয়োজন মাফিক সরকারকে পরামর্শ দেয়ার দায়িত্ব পালন করে। নিম্নে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিরোধী দলের ভূমিকা আলোচনা করা হল ঃ

১। **গঠনমূলক সমালোচনা ঃ** গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিরোধী দল সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা করে সরকারকে নিয়ন্ত্রণে রাখে। সরকার বিরোধী দলের সমালোচনার চাপে একক কোন সিদ্ধান্ত জনগণের উপর চাপিয়ে দিতে পারে না। বিরোধী দল সুপরিকল্পিতভাবে সরকারের সমালোচনা করে সরকারের ত্রুটি-বিচ্যুতি জনসাধারণের সামনে তুলে ধরে।

২। **অধিকার বাস্তবায়ন ঃ** জনগণের অধিকার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিরোধী দল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সরকার যাতে জনগণের অধিকার খর্ব করে কোন সিদ্ধান্ত নিতে না পারে সে ব্যাপারে বিরোধী দলকে সচেষ্ট থাকতে হয়।

৩। **গণতন্ত্র রক্ষা ঃ** আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিরোধী দল ছাড়া গণতন্ত্র টিকে থাকতে পারে না। গণতন্ত্র মানেই বিভিন্ন মতামতের সংমিশ্রণ। এক্ষেত্রে বিভিন্ন দলের সহাবস্থান অবশ্যই থাকতে হয়। শক্তিশালী বিরোধী দলের অভাবে সরকার স্বৈরাচারী হয়ে যেতে পারে। জন স্টুয়ার্ট মিল তাই বলেন, "যেখানে বিরোধী দল নেই, সেখানে গণতন্ত্র নেই"।

৪। **বিকল্প নীতি উত্থাপনঃ** বিরোধী দলের অন্যতম একটি কাজ হচ্ছে সরকারি নীতিমালাগুলো ভালোভাবে যাচাই বাছাই করা। এক্ষেত্রে যদি কোন নীতিমালা জন বান্ধব মনে না হয়, সেক্ষেত্রে বিরোধী দল দেশের স্বার্থে উন্নততর বিকল্প নীতি প্রস্তাব করতে পারে। এর মধ্য দিয়ে বিরোধী দল জনগণের নিকট তাদের অবস্থানও স্পষ্ট করতে পারে।

৫। **সমস্যা চিহ্নিত করা ঃ** রাষ্ট্রে অনেক ধরনের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক সমস্যা বিদ্যমান থাকে। এ ধরনের সমস্যাগুলো সমগ্র জনগোষ্ঠীর পক্ষে বিরোধীদল সরকারের কাছে উপস্থাপন করতে পারে।

৬। **জনমত গঠন ঃ** রাষ্ট্র ও সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের মধ্যে কোন দুর্বলতা চিহ্নিত করতে পারলে, সেগুলো ব্যবহার করে বিরোধী দল নিজেদের পক্ষে জনমত গঠনের চেষ্টা করতে পারে। বিরোধী দল যদি তাদের যুক্তির স্বপক্ষে শক্তিশালী জনমত গড়ে তুলতে পারে তাহলে পরবর্তী নির্বাচনে তাদের ক্ষমতায় আসার পথ সুগম হয়।

৭। **প্রার্থী মনোনয়ন ঃ** আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তর হয়ে থাকে। আর এ ক্ষমতা হস্তান্তরের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য মাধ্যম হল সাধারণ নির্বাচন। তাই নির্বাচনের সময় বিরোধী দল নিজ-আদর্শ সংশ্লিষ্ট প্রার্থী মনোনয়ন করে এবং প্রার্থীর সমর্থনে প্রচারকার্য চালায়।

৮। **পারস্পরিক সম্পর্ক ঃ** গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার জন্য বিরোধী দলকে ভূমিকা রাখতে হয়। এক্ষেত্রে সরকারি দলের সাথে সার্বক্ষনিক বৈরিতার সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার পরিবর্তে যুক্তিসঙ্গত সমালোচনা ও প্রয়োজন মাফিক সমর্থন দান করাটাও বিরোধী দলের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

৯। **রাজনৈতিক সংযোগ সাধন ঃ** আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিরোধী দলের অন্যতম কাজ হল রাজনৈতিক সংযোগ সাধন। বিরোধী দল জনগনের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া বা মতামতকে সরকারের নিকট পেশ করে থাকে। এভাবে বিরোধী দলের সাথে জনগণের সংযোগ সাধন হয়ে থাকে।

১০। **রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ ঃ** রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে বিরোধী দল তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। জনগণকে রাজনীতির সাথে একত্রীকরণ, মূল্যবান ভোট সম্পর্কে সচেতন করাসহ বিভিন্ন বিষয়ে বিরোধী দল কাজ করে থাকে। আর এভাবেই রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ সৃষ্টি হয়।

১১। **জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা ঃ** গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সাধারণ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল মন্ত্রিসভা গঠন করে। মন্ত্রিসভা তাদের কার্যের জন্য ব্যক্তিগত ও যৌথভাবে আইনসভার নিকট দায়ী থাকে। মন্ত্রিসভার যেকোন সিদ্ধান্ত বা নীতি সম্পর্কে বিরোধীদলের সদস্যরা জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারেন। মন্ত্রীগণ তার জবাব দিতে বাধ্য থাকেন। যে কোন আপত্তিকর সিদ্ধান্ত বা নীতির বিরুদ্ধে বিরোধী দলীয় সদস্যরা অভিযোগ উত্থাপন করতে পারেন।

পরিশেষে বলা যায় যে, একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য বিরোধী দল অতি আবশ্যক। কোন রাষ্ট্রে যদি শক্তিশালী বিরোধী দল না থাকে, তাহলে সে রাষ্ট্র স্বৈরাচারী রাষ্ট্রে পরিণত হবার আশঙ্কা থাকে। সরকারকে সর্বদা বিরোধী দলের দাবির প্রতি সহনশীল হতে হবে। আবার বিরোধী দল অহেতুক রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি না করার ব্যাপারে সর্তক থাকবে। বস্তুতঃ বিরোধী দল ছাড়া রাজনৈতিক ব্যবস্থাই অচল হয়ে পড়ে। এসব কারণে, সার্বিক গুরুত্ব বিবেচনা করে, ব্রিটেনে বিরোধী দলকে মহামান্য রাজা-রাণীর বিরোধী দল বলা হয়ে থাকে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিরোধী দল গুরুত্বপূর্ণ কেন?

সার-সংক্ষেপ

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাতে নির্বাচনে যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে তারা সরকার গঠন করে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। বাকি দলগুলো বিরোধী দল হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য বিরোধী দল অপরিহার্য। কোন রাষ্ট্রে যদি শক্তিশালী বিরোধী দল না থাকে তাহলে সে রাষ্ট্র স্বৈরাচারী রাষ্ট্রে পরিণত হবার সমূহ আশঙ্কা থাকে। গণতন্ত্র রক্ষায় বিরোধীদলের বিকল্প নেই।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বিকল্প নীতি উত্থাপন কে করতে পারে ?
(ক) সরকারি দল (খ) বিরোধী দল
(গ) সামরিক বাহিনী (ঘ) সচিবালয়

২। রাজনৈতিক দল ও গণতন্ত্রের মধ্যে সম্পর্ক কেমন ?
(ক) পরস্পর বিরোধী (খ) ঘনিষ্ঠ
(গ) বৈরী (ঘ) কোন সম্পর্ক নেই

৩। বিরোধী দলের কাজ হল–
(i) গঠনমূলক সমালোচনা করা (ii) সরকার গঠন করা
(iii) গণতন্ত্র রক্ষা করা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) i ও ii

(গ) i ও iii (ঘ) ii ও iii

৪। গণতন্ত্রে বিরোধী দল গঠনমূলক সমালোচনা করে কেন?

(i) জনমত গঠনের জন্য

(ii) নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য

(iii) ভয়-ভীতির কারণে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) i ও ii

(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৮.৪ চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ধারণা ও বৈশিষ্ট্য (Concepts and Characteristics of Pressure Group)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোকপাত করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী, চাপ প্রয়োগ, সমজাতীয় মনোভাব, সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য।

চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ধারণা

আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী সম্পর্কিত আলোচনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বর্তমানে যে কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী অত্যন্ত প্রভাবশালী অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়। রাজনৈতিক দলের মত সরকারি ক্ষমতা দখল চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর লক্ষ্য নয়। কিন্তু সরকারি নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে এই গোষ্ঠীগুলো কার্যকরী প্রভাব বিস্তার করে। প্রভাব বিস্তার বা চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীগুলো সরকারি সিদ্ধান্তকে নিজেদের স্বার্থের অনুকূলে আনার বিষয়ে সচেষ্ট থাকে। বিশেষ স্বার্থযুক্ত এই গোষ্ঠীসমূহ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দেশে রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের উপরেও প্রভাব বিস্তার করে। সেজন্য দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। জনসাধারণের বিভিন্ন রকম সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, বৃত্তিগত প্রভৃতি স্বার্থকে কেন্দ্র করে এই গোষ্ঠীসমূহের সৃষ্টি হয়।

চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর নামকরণ ও সংজ্ঞা সম্পর্কে কিছু সমস্যা আছে। অনেকে চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী (Pressure group), স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী (Interest group), লবি (Lobby), মনোভাব কেন্দ্রিক গোষ্ঠী (Attitude group) এবং রাজনৈতিক গোষ্ঠীকে (Political group) সমার্থক শব্দরূপে গণ্য করেন। এর ফলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়।

অ্যালেন পটার চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর পরিবর্তে 'সংগঠিত গোষ্ঠী' (Organized group) শব্দ দু'টি ব্যবহারের পক্ষে। কারণ এ ধারণার মাধ্যমে গোষ্ঠীর সংগঠনের ব্যাপকতাকে আরো যথার্থভাবে অনুধাবন করা সম্ভব।

অ্যালান বলের মতে, "চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হল এমন একটি গোষ্ঠী যার সদস্যগণ 'অংশীদারী মনোভাবের' দ্বারা আবদ্ধ।"

এইচ জিগলার এর মতে, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হচ্ছে এমন একটি সংগঠিত ব্যক্তি সমষ্টি যার সদস্যগণ সরকারি ক্ষমতা প্রয়োগে অংশগ্রহণ করে না। বরং তাদের লক্ষ্য হল সরকারি সিদ্ধান্ত প্রভাবিত করা।

অ্যালমন্ড গ্যাব্রিয়েল ও জি পাওয়েল বলেন, "স্বার্থগোষ্ঠী বলতে আমরা নির্দিষ্ট স্বার্থের বন্ধনে আবদ্ধ অথবা সুযোগ-সুবিধা দ্বারা সংযুক্ত এমন এক ব্যক্তিসমষ্টিকে বুঝি যারা এরূপ বন্ধন সম্পর্কে সচেতন।"

সংক্ষেপে বলতে গেলে চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী বা স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী হল এমন এক দল ব্যক্তির সমষ্টি। যারা নির্দিষ্ট লক্ষ্যের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হয় এবং নিজেদের লক্ষ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন থাকে।

চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য

চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর সদস্যরা তাদের স্বার্থগত ইস্যুগুলোতে একই রকম মনোভাব পোষণ করে। এই গোষ্ঠী নানাবিধ চাপ প্রয়োগ ও কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে তাদের দাবি-দাওয়া আদায় করে। নিম্নে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলঃ

১। **দলীয় সংগঠনবিহীন ঃ** চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এদের কোন দলীয় সংগঠন নেই। এদের উদ্দেশ্য রাজনৈতিক ক্ষমতা গ্রহণ নয়। সরকারের উপরে চাপ প্রয়োগ করে নিজেদের স্বার্থ বা দাবি আদায় করা হচ্ছে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর লক্ষ্য।

২। **দলীয় কর্মসূচিবিহীন ঃ** চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর কোন রাজনৈতিক দল নয় বিধায় এদের কোন দলীয় কর্মসূচিও নেই। এটি নির্দলীয় সংগঠন। এরা শুধু গোষ্ঠীর স্বার্থ পূরণের জন্য চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে নিজেদের স্বার্থ হাসিলের চেষ্টা করে।

৩। **নির্বাচনে প্রার্থী না দেওয়া ঃ** চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী নির্বাচনে প্রার্থী দেয় না এবং নির্বাচনে কোন প্রার্থীর পক্ষে সরাসরি প্রচারণা চালায় না। তবে অনেক সময় তাদের পছন্দের প্রার্থীকে অর্থ কিংবা জনবল দিয়ে সহযোগিতা করে থাকে। এছাড়াও কোন কোন দেশে চাপসৃষ্টিকারী কোন কোন গোষ্ঠীকে পছন্দের দলের পক্ষে প্রকাশ্য অবস্থান নিতে দেখা যায়।

৪। **সরকারি নীতিকে প্রভাবিত করা ঃ** চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর সদস্যরা গোষ্ঠীর সদস্য হিসাবে সরকারের কোন পদে অধিষ্ঠিত হতে চায় না। বরং নানাভাবে সরকারি নীতিকে নিজেদের অনুকূলে আনার জন্য প্রচেষ্টা চালায়।

৫। **সরাসরি রাজনীতিতে সম্পৃক্ত নয় ঃ** চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী সরাসরি রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত থাকে না। তবে পরোক্ষভাবে রাজনীতিক নেতৃবৃন্দের সাথে তাদের যোগাযোগ থাকতে পারে। আর এ যোগাযোগের ভিত্তিতে তারা প্রভাব বিস্তার করে।

৬। **সমজাতীয় মনোভাব ঃ** চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর সদস্যরা সাধারণত সমজাতীয় মনোভাব সম্পন্ন হয়ে থাকে। আর এ সমজাতীয় মনোভাবের মূলে রয়েছে তাদের স্বার্থ। কেননা সমজাতীয় মনোভাব সম্পন্ন না হলে তাদের স্বার্থ হাসিলে ব্যর্থ হয়।

৭। **বেসরকারি সংগঠন ঃ** চাপসৃষ্টিকারী দলের সদস্যগণ বেসরকারি ব্যক্তিবর্গের সমষ্টি বিশেষ। চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর আনুষ্ঠানিক সরকারি স্বীকৃতিও সাধারণত থাকে না।

পরিশেষে বলা যায়, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা সরাসরি না থাকলেও, মূলত রাজনীতিবিদ বা রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ততার মাধ্যমেই তারা দাবি বা স্বার্থ হাসিল করে থাকে। এভাবে দেখলে রাজনৈতিক দল না হলেও, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলো পরোক্ষভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি**)** **/শিক্ষার্থীর কাজ**	বাংলাদেশের কয়েকটি চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর নাম উল্লেখ করুন।

সার-সংক্ষেপ

চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হল এমন এক জনসমষ্টি যারা সমজাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়ার উপরে প্রভাব বিস্তার করে। ক্ষমতা দখল চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর উদ্দেশ্য নয় বরং নীতি নির্ধারণে প্রভাব বিস্তার করাই এর উদ্দেশ্য। সরকারি নীতি নির্ধারণে চাপ প্রয়োগ করে গোষ্ঠীগত স্বার্থ রক্ষা করাই চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর প্রধান উদ্দেশ্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর পরিবর্তে 'সংগঠিত গোষ্ঠী' শব্দ দু'টি ব্যবহারের পক্ষে কে?
(ক) এইচ জিগলার (খ) অ্যালেন পটার
(গ) আর্থার বেন্টলে (ঘ) হ্যারি ট্রুম্যান

২। "চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হল এমন একটি গোষ্ঠী যার সদস্যগণ 'অংশীদারী মনোভাবের' দ্বারা আবদ্ধ।"– কার উক্তি?
(ক) অ্যালেন পটার (খ) হ্যারি ট্রুম্যান
(গ) অ্যালান বল (ঘ) জন পিয়ার্স

৩। "চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হল এমন একটি সংগঠিত ব্যক্তি সমষ্টি যার সদস্যগণ সরকারি ক্ষমতা প্রয়োগে অংশ গ্রহণ করেন না। তাদের লক্ষ্য হল সরকারি সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করা"– মন্তব্যটি কে করেছেন?
(ক) জন পিয়ার্স (খ) অ্যালেন পটার
(গ) স্যামুয়েল জি.হান্টিংটন (ঘ) এইচ জিগলার

৪। চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য নয়–
(i) সরকারি ক্ষমতা অর্জন
(ii) সরকারি সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করা
(iii) নির্বাচনে প্রার্থী দেওয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৮.৫ রাজনৈতিক দল ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী (Political Parties and Pressure Groups)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- রাজনৈতিক দল ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মধ্যে সাদৃশ্য বলতে পারবেন।
- রাজনৈতিক দল ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	রাজনৈতিক সংস্কৃতি, গণসংযোগ, তথ্য সরবরাহ, সংহতি, জনসমর্থন, মতাদর্শ, নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

রাজনৈতিক দল ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী

রাজনৈতিক দল ও চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী উভয়েই আধুনিক গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার অপরিহার্য অংশ। এ সম্পর্কে আলোচনা ব্যতীত রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার আলোচনা পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না।

রাজনৈতিক ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারকরূপে রাজনৈতিক দল এবং চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য রয়েছে। তবে সংগঠন, সদস্য সংখ্যা, সাংগঠনিক নীতি ও শৃঙ্খলা, কার্য-পরিচালনা পদ্ধতি, লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যের বিচারে রাজনৈতিক দল এবং চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মধ্যে সাদৃশ্যের তুলনায় বৈসাদৃশ্যই বেশি লক্ষ্যণীয়।

সাদৃশ্য ঃ রাজনৈতিক দল এবং চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর উভয়েই রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত। উভয়েই গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক নির্ধারক। উভয়েই রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে নিজেদের দাবি ও মনোভাব ব্যক্ত করে। রাজনৈতিক দল ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী উভয়ই স্বার্থের সংহতি সাধনের সাথে জড়িত। উভয়েই রাজনৈতিক নিয়োগ বা রাজনৈতিক ভূমিকায় নাগরিকদের অবতীর্ণ করানোর দায়িত্ব বহন করে। রাজনৈতিক সংস্কৃতির ধারা উভয়ের মাধ্যমেই প্রকাশিত হয়। বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংরক্ষণ বা পরিবর্তন, গণ-সংযোগ সাধন, তথ্য সরবরাহ, জনমত গঠন, সরকারের সমালোচনা ইত্যাদির ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দল ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর কার্যক্রমে সাদৃশ্য দেখা যেতে পারে। তবে এই দুইয়ের কার্যক্রমের মাত্রা ও গভীরতার মধ্যে পার্থক্য আছে। রাজনৈতিক দল ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর কর্মকান্ড আঞ্চলিক অথবা জাতীয় ভিত্তিতে পরিচালিত হতে পারে।

পার্থক্য/বৈসাদৃশ্য ঃ রাজনৈতিক দল ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। অধ্যাপক অ্যালেন বল, অধ্যাপক নিউম্যান প্রমুখ আধুনিক কালের রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ রাজনৈতিক দল ও চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্যের কথা বলেছেন। উৎপত্তি, উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি প্রভৃতির পরিপ্রেক্ষিতে উভয়ের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য দেখা যায়। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হল–

১। **লক্ষ্যের ক্ষেত্রে ঃ** সাধারণত বহুমুখী ও ব্যাপক সামাজিক বা জাতীয় স্বার্থের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি হয়। বহু ও বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দায়-দায়িত্ব রাজনৈতিক দলের কর্মসূচির অন্তর্ভূক্ত থাকে। রাজনৈতিক দলের প্রধান বিবেচ্য বিষয় হল বৃহত্তম জাতীয় ও সামাজিক স্বার্থ সাধন। রাজনৈতিক দলের কার্যক্রম জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রেই সম্প্রসারিত। কিন্তু মুষ্টিমেয় ব্যতিক্রম বাদ দিলে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর সামনে বৃহত্তম জাতীয় কল্যাণ সাধনের কোন মহান উদ্দেশ্য থাকে না। সংকীর্ণ ও সমজাতীয় বিশেষ গোষ্ঠীগত স্বার্থকে কেন্দ্র করে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর উৎপত্তি।

২। **উৎপত্তিগত ক্ষেত্রে ঃ** সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল গড়ে উঠে। এই মতাদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে দলীয় নীতি ও ব্যাপক কর্মসূচি রচিত হয় এবং তা বাস্তবে রূপায়িত করার চেষ্টা করা হয়। পক্ষান্তরে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে উৎপত্তির ভিত্তিতে কোন বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয় না। কোন রাজনৈতিক

মতাদর্শের প্রতি চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর অঙ্গীকার থাকে না। এ সমস্ত গোষ্ঠীর অঙ্গীকার থাকে গোষ্ঠীগত স্বার্থ বা কল্যাণের প্রতি।

৩। **সংহতির প্রশ্নে ঃ** একটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে বিভিন্ন গোষ্ঠীর লোক থাকতে পারে। তার ফলে দলের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সংহতির প্রশ্ন বড় করে দেখা দেয়। কিন্তু চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে সংহতির সমস্যা বড় একটা দেখা দেয় না। কারণ চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর সদস্য সংখ্যা রাজনৈতিক দলের তুলনায় সাধারণত কম হয় এবং অভিন্ন স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে গোষ্ঠীর সদস্যরা ঐক্যবদ্ধ থাকে।

৪। **সাংগঠনিক ক্ষেত্রে ঃ** চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর তুলনায় রাজনৈতিক দল অনেক বেশি সংগঠিত ও কাঠামোবদ্ধ। অভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শ ও দলীয় শৃঙ্খলার ভিত্তিতে দলীয় সংহতি বজায় রাখার ব্যবস্থা হয়। সাংগঠনিক দিক থেকে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী রাজনৈতিক দল অপেক্ষা দুর্বল। দলীয় কর্মসূচির প্রতি অঙ্গীকার ও আনুগত্যের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দলের সদস্যপদ প্রদান করা হয়। অপরদিকে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদে বিশ্বাসী মানুষ চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর সদস্য হতে পারে।

৫। **উদ্দেশ্যগত পার্থক্য ঃ** রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্য বহুমুখী ও ব্যাপক হলেও, রাষ্ট্র ক্ষমতায় এসে দলীয় নীতি ও কর্মসূচিকে বাস্তবে রূপায়িত করাই হল দলের মূল লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য প্রতিটি রাজনৈতিক দল দলীয় সদস্যদের সংখ্যা বৃদ্ধির চেষ্টা করে। রাজনৈতিক দল নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশগ্রহণ করে, দলীয় প্রার্থী মনোনয়ন করে, নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলে সরকার গঠন ও পরিচালনা করে। পক্ষান্তরে, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে সরকারি সিদ্ধান্তকে নিজেদের স্বার্থের অনুকূলে প্রভাবিত করাই হল চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর প্রধান উদ্দেশ্য।

৬। **কর্মপদ্ধতির ক্ষেত্রে ঃ** রাজনৈতিক দলের কর্মপদ্ধতি প্রকাশ্য ও প্রত্যক্ষ। রাজনৈতিক দলগুলো জনসমর্থন অর্জনের উদ্দেশ্যে নিজ নিজ বক্তব্য ও কর্মসূচি সরাসরি জনগণের কাছে পেশ করে। এ কারণে রাজনৈতিক দলের কার্যাবলি ও কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে জনসাধারণ সহজেই অবহিত হতে পারে। পক্ষান্তরে, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর কর্মকান্ড পরোক্ষভাবে এবং কখনো-কখনো গোপনে সম্পাদিত হয়। জনসাধারণের সমর্থন অর্জনের ব্যাপারে চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর আগ্রহ বা উদ্যোগ বড় একটা দেখা যায় না।

৭। **সমঝোতার ক্ষেত্রে ঃ** প্রয়োজনবোধে নির্দিষ্ট কর্মসূচির ভিত্তিতে রাজনৈতিক দলের মধ্যে সমঝোতার ঘটনা প্রায়ই ঘটে। বহুদলীয় ব্যবস্থায় সমমনোভাবাপন্ন দলগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক জোট নিতান্তই স্বাভাবিক। কিন্তু বিভিন্ন স্বার্থের চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে এ ধরনের সমঝোতা খুব একটা দেখা যায় না।

৮। **নির্বাচনে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে ঃ** প্রতিটি রাজনৈতিক দল দলীয় প্রার্থীদের নিয়ে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সরাসরি অবতীর্ণ হয়। রাজনৈতিক দলের মুখ্য লক্ষ্য হল ক্ষমতা দখল করা। কিন্তু চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে না। তবে এই চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলো নিজস্ব স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে কোন দল বা প্রার্থীকে সমর্থন এবং তার পক্ষে প্রচারণা চালাতে পারে।

৯। **সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ঃ** কর্মপদ্ধতির প্রকৃতির ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দল ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্য দৃশ্যমান। অভিন্ন গোষ্ঠী-স্বার্থের জন্য চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী যে কোন বিষয়ে সহজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অনুসরণ, জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যুক্ত থাকে বিধায় একটি রাজনৈতিক দলের পক্ষে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ খুব সহজে সম্ভব হয় না।

১০। **অপরিহার্যতার ক্ষেত্রে ঃ** আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব অপরিহার্য। কিন্তু চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে এ বক্তব্য প্রযোজ্য নয়। সকল রাজনৈতিক ব্যবস্থায় চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী থাকে না। উদাহরণস্বরূপ, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থাতে চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর অস্তিত্ব খুব একটা দৃশ্যমান হয় না।

১১। **মতাদর্শের পার্থক্য ঃ** রাজনৈতিক দল ব্যাপক মতাদর্শের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। মতাদর্শগত অঙ্গীকার পূরণের জন্য রাজনৈতিক নানাবিধ কর্মসূচি প্রণয়ন করে। কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন রাজনৈতিক দলের অস্তিত্বের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত। চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর অঙ্গীকার সাধারণত স্বার্থের প্রতি, রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতি নয়। তবে রাজনৈতিক দলের পৃষ্ঠপোষকতা প্রাপ্ত চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলো রাজনৈতিক মতাদর্শকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করতে পারে না।

পরিশেষে বলা যায় যে, রাজনৈতিক দলের লক্ষ্য হল রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন। লক্ষ্য পূরণের জন্য রাজনৈতিক দলের প্রধান কাজ থাকে সদস্য নিয়োগ, নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়ন, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে সরকার গঠন ও পরিচালনা, সরকারের কর্মসূচি নির্ধারণ ও প্রয়োগ। পক্ষান্তরে, চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর লক্ষ্য হল সরকারি নীতিকে প্রভাবিত করা।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	রাজনৈতিক দল ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্যগুলো চিহ্নিত করুন।

সার-সংক্ষেপ

রাজনৈতিক দল হল একই মতাদর্শের অনুসারী একটি জনসমষ্টি যারা নিজেদের আদর্শে জনগণকে প্রভাবিত করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণ করার প্রচেষ্টা চালায়। ক্ষমতা লাভের পর রাজনৈতিক দল দেশের সকল অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাগুলো নিজেদের কর্মসূচিতে সন্নিবেশিত করে জাতীয় স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা চালায়। অন্যদিকে, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হল এমন এক জনসমষ্টি যারা সমজাতীয় স্বার্থে উদ্বুদ্ধ হয়ে রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা চালায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন

১। রাজনৈতিক দল কিসের ভিত্তিতে কর্মসূচি প্রণয়ন করে?
(ক) দলীয় মতাদর্শ (খ) ব্যক্তিস্বার্থ
(গ) সরকারি নীতি (ঘ) আন্তর্জাতিক চাপ

২। চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর প্রধান লক্ষ্য কোনটি?
(ক) গোষ্ঠী স্বার্থ সংরক্ষণ (খ) দল গঠন
(গ) সরকার গঠন (ঘ) দেশের উন্নয়ন

৩। চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী –
(ক) সরকারি সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে;
(খ) সরকারি ক্ষমতা দখল করে;
(গ) নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে

৪। জনগণ ও সরকারের মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজ করে কোনটি?
(ক) আমলাতন্ত্র (খ) চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী
(গ) এলিট শ্রেণি (ঘ) রাজনৈতিক দল

পাঠ-৮.৬ চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ভূমিকা (Role of Pressure Groups)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	জনসংযোগ, রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ, রাজনৈতিক নিয়োগ, জনস্বার্থ, রাজনৈতিক প্রচার

চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ভূমিকা

চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী আধুনিক গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার একটি অপরিহার্য উপাদান হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করেছে। চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর আলোচনা ব্যতীত আধুনিক গণতন্ত্রের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় তুলে ধরা সম্ভব নয়। নিম্নে চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ভূমিকা আলোচনা করা হল ঃ

১। **স্বার্থের সংহতি সাধন ঃ** প্রতিটি আধুনিক গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় স্বার্থের সংহতি সাধনের জন্য যে সব ব্যবস্থা আছে তার মধ্যে চাপসৃষ্টিকারী দল অন্যতম। সমাজের বিভিন্ন অংশ এবং বিভিন্ন পেশার সঙ্গে যুক্ত মানুষের স্বার্থ চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়।

২। **জনসংযোগ ঃ** চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর নিজেদের স্বার্থ-সংরক্ষণ ও প্রসারের জন্য সংযোগ সাধনের উদ্যোগ ত্যাগ করতে পারে না। সরকারের নীতির সাথে অনেক সময়েই নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর স্বার্থ ছাড়াও ব্যাপক জনস্বার্থ জড়িত থাকে। চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী গণসংযোগের মাধ্যমে জনসাধারণের নিকটে নিজেদের দাবির যৌক্তিকতা এবং সরকারের জনস্বার্থ বিরোধী নীতির সমালোচনা করে।

৩। **তথ্য প্রদান ঃ** চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী সংবাদ এবং তথ্য সংগ্রহের অন্যতম উৎস। সরকারকে প্রভাবিত করার জন্য আইনসভার সদস্য, আমলা, সাধারণ মানুষ এবং প্রশাসনের উচ্চতর পর্যায়েও এ গোষ্ঠী তথ্য সরবরাহ করে। আইনসভার সদস্যদের মাধ্যমে বিভিন্ন গোষ্ঠী নিজ নিজ বক্তব্য পেশ করার চেষ্টা করে। পুস্তিকা প্রকাশ, জনসভা, সংবাদপত্রে সরব প্রচারসহ নানান মাধ্যমে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী নিজেদের বক্তব্য পেশ করে।

৪। **রাজনৈতিক প্রচার ঃ** চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী রাজনৈতিক প্রচারকার্য পরিচালনার একটি সংগঠিত মাধ্যম। চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীই কোন বা কোন ভাবে রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পর্কিত থাকে। নির্বাচনী রাজনীতিতে কোন চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীই স্বতন্ত্রভাবে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করে না। সরকার গঠন তাদের লক্ষ্য নয়, তাদের মূল লক্ষ্য সরকারের নীতিকে প্রভাবিত করা। নির্বাচনী রাজনীতিতে বিভিন্ন চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে। অনেক সময় রাজনৈতিক দল এবং গোষ্ঠীর কার্যকলাপ এমনভাবে জড়িয়ে থাকে যে, তাদের ভূমিকার পার্থক্য নির্ধারণ করা সম্ভব হয় না।

৫। **সামাজিকীকরণ ঃ** চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের মাধ্যম। বর্তমানে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলের ন্যায় অনেক চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীও জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক প্রচারকার্য পরিচালনা করে। এভাবেই তারা জনগণের মধ্যে সামাজিকীকরণের মাধ্যম হিসাবে কাজ করে।

৬। **সরকারের ত্রুটি-বিচ্যুতি দূরীকরণ ঃ** চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী প্রশাসনের দক্ষতা বজায় রাখতে এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি দূরীকরণে সাহায্য করে। এ গোষ্ঠী সরকারের ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে ব্যাপক প্রচার চালায়। এর ফলে সরকার নিজের ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন থাকে। গোষ্ঠীর চাপের ফলে আমলাতন্ত্রের উদাসীন্য এবং নিস্পৃহতা দূর করা সম্ভব হয়। নিজেদের বক্তব্য রাজনৈতিক দলের ন্যায় চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীও রাজনৈতিক সমস্যাসমূহ সম্পর্কে জনসাধারণের নিকট পেশ করে।

৭। **সরকারের উপদেষ্টা ঃ** চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী সরকারের উপদেষ্টার ভূমিকা পালন করে। বর্তমানে সরকার বিশেষ স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট আইন প্রণয়ন এবং ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা করে।

৮। **রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংরক্ষণ ও পরিবর্তন ঃ** চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীসমূহ বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংরক্ষণ অথবা পরিবর্তনে অংশগ্রহণ করে। চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীসমূহ রাজনৈতিক বিচার-বিবেচনার দ্বারা অনেক সময়ই প্রভাবিত হয়। রাজনৈতিক দলের মত বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে তাদের মধ্যেও সুস্পষ্ট মনোভাব, অনুভূতি এবং সংবেদনশীলতা থাকে। এসবের সাথে সামঞ্জস্য রেখেই রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংরক্ষণ অথবা পরিবর্তনের আন্দোলনে তারা অংশগ্রহণ করে।

৯। **আইন ও নীতির উৎস ঃ** চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীসমূহ কখনো-কখনো আইন এবং সরকারি নীতি ও সিদ্ধান্তের উৎসে পরিণত হয়। বিদ্যমান আইন ও নীতি পরিবর্তনের জন্য চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীসমূহ অনেক সময় সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করে। আইনসভার সদস্যদের মাধ্যমে বক্তব্য পেশ, সরকারের নিকট সরাসরি বক্তব্য উপস্থাপন, জনসভা, বিক্ষোভ, সমাবেশ অথবা ধর্মঘটের মাধ্যমে গোষ্ঠীসমূহ তাদের স্বার্থের প্রতিকূল আইন ও নীতি পরিবর্তনের জন্য চাপ সৃষ্টি করে।

পরিশেষে বলা যায় যে, আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীসমূহের ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ। গোষ্ঠী স্বার্থের বাইরে এসে, রাষ্ট্রের সুশাসন প্রতিষ্ঠায় চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	বাংলাদেশে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ভূমিকা মূল্যায়ন করুন।

সার-সংক্ষেপ

চাপসৃষ্টিকারী দল কোন রাজনৈতিক সংগঠন নয়। তবুও আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় চাপসৃষ্টিকারী দলের ভূমিকা অপরিহার্য। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সরকারি সিদ্ধান্তকে নিজেদের অনুকূলে প্রভাবিত করাই হল চাপ সৃষ্টিকারী দলের প্রধান কাজ। মূলত: গোষ্ঠী স্বার্থ আদায়ে কাজ করলেও, কোন কোন চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীকে কখনো কখনো বৃহত্তর জনকল্যাণমূলক বা জাতীয় স্বার্থে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করতে দেখা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন

১। 'স্বার্থ একত্রীকরণকারী' বলা হয় কাকে?
(ক) রাজনৈতিক দল (খ) জনগণ
(গ) সরকার (ঘ) চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী

২। চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর লক্ষ্য কি ?
(ক) ক্ষমতা দখল (খ) বিদেশী স্বার্থ রক্ষা
(গ) ব্যবসা করা (ঘ) কোনটি নয়

৩। কারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সরকারি সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে কিন্তু সরকার গঠনে সচেষ্ট নয়?
(ক) সাধারণ জনগণ (খ) চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী
(গ) রাজনৈতিক দল (ঘ) বিরোধী দল

৪। রাজনৈতিক দলকে পরামর্শ দিয়ে প্রভাবিত করে কে?
(ক) চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী (খ) সাধারণ জনগণ
(গ) নির্বাচকমন্ডলী (ঘ) নির্বাচন কমিশন

পাঠ-৮.৭ নেতৃত্বের ধারণা ও প্রকারভেদ (Concepts and Classification of Leadership)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- নেতৃত্বের ধারণা সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- নেতৃত্বের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	নেতৃত্ব, সুশাসন, কার্যনির্বাহ, সম্মোহনী নেতৃত্ব, প্রতীকধর্মী, সর্বাত্মকবাদী, বিশেষজ্ঞসুলভ নেতৃত্ব।

নেতৃত্বের ধারণা

নেতৃত্বের ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Leadership' শব্দটি ইংরেজি 'Lead' থেকে এসেছে। 'Lead' শব্দের বাংলা অর্থ হল পরিচালনা করা, পথ দেখানো এবং নির্দেশ প্রদান করা। সুতরাং যিনি নির্দেশ প্রদান করেন, পথ দেখান এবং সামনে থেকে পরিচালনা করেন তাকে নেতা (Leader) বলে। আর নেতার গুণাবলিকে বা যোগ্যতাকে বলা হয় নেতৃত্ব।

সুতরাং 'নেতৃত্ব' বলতে সাধারণত নেতার গুণাবলিকে বুঝায়। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানে 'নেতৃত্ব' শব্দটি এত সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয় না। কোন ব্যক্তি বা কোন দলের নেতা কতখানি গুণের অধিকারী এবং তা অন্যদেরকে কতখানি প্রভাবিত করতে পারে, তার নিরীখেই নেতৃত্বের পরিমাপ হয়। নেতৃত্ব হচ্ছে একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক গুণ। সমাজ তথা রাষ্ট্রকে কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়াই নেতৃত্বের মূল লক্ষ্য। সুসংহত, পরিলক্ষিত কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে নেতৃত্ব বিকাশ হয়। একজন ব্যক্তির কার্যনির্বাহ বা আদেশ-নির্দেশ প্রদান ও প্রয়োগের ক্ষমতাই নেতৃত্ব। সুযোগ্য নেতৃত্বের বদৌলতে কোন দেশ উন্নয়নের চরম শিখরে আরোহন করতে পারে।

এইচ. ও ডানেল (H.O. Dunel) এর মতে, "সাধারণ লক্ষ্য অর্জনের জন্য জনগণকে সহযোগী হতে উদ্বুদ্ধ ও উদ্যোগী করার কাজকেই নেতৃত্ব বলে।"

ডব্লিউ গোল্ডনার (W. Gouldner) বলেন, "নেতৃত্ব ব্যক্তি বা দলের সেই নৈতিক গুণাবলি যা অন্যদের অনুপ্রেরণা দিয়ে বিশেষ দিকে ধাবিত করে"।

কিম্বল ইয়ং (Kimbal Young) এর মতে, "নেতৃত্ব হল ব্যক্তির সেই গুণাবলি যার মাধ্যমে সে অন্যের কর্মকান্ডকে প্রভাবিত করে এবং অন্যদের উপর প্রভাব বিস্তার করে।"

সুতরাং নেতৃত্ব হল একটি শক্তিশালী কৌশল বা প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে নেতা অন্যের উপর কর্তৃত্ব প্রয়োগ করতে পারে।

নেতৃত্বের প্রকারভেদ

নেতৃত্ব বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করে কয়েক প্রকার নেতৃত্বের কার্যকারিতা তুলে ধরেছেন।

১। **সম্মোহনী নেতৃত্ব ঃ** জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবার সর্বপ্রথম সম্মোহনী নেতৃত্বের ধারণা দেন। কোন বিশেষ নেতা যখন তার বক্তব্য, চারিত্রিক দৃঢ়তা, সাহসিকতা, কর্মপদ্ধতি ও মোহনীয় ব্যক্তিত্বের প্রবল স্পর্শে রাষ্ট্রের নাগরিকদের তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশে অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হয় তখন সেই নেতৃত্বকে সম্মোহনী নেতৃত্ব বলে। জনগণ সম্মোহনী নেতৃত্বের কর্মকান্ডে আপ্লুত, বিমুগ্ধ ও অন্ধ অনুকরণে অনুপ্রাণিত হয়। জনগণের বিশ্বাস অর্জন করে তাদের মনের মণিকোঠায় পৌঁছে যায় সম্মোহনী নেতৃত্ব। সম্মোহনী নেতৃত্বের অধিকারী ব্যক্তি সাধারণত রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করে দেশের সামগ্রিক কল্যাণে এমন কি স্বাধীনতা অর্জনে অদম্য ভূমিকা রাখেন। সম্মোহনী নেতৃত্বের অধিকারী হলেন ব্রিটিশ ভারতের মহাত্মা গান্ধী, ইন্দোনেশিয়ার সুকর্ণ, দক্ষিণ আফ্রিকার নেলসন ম্যান্ডেলা প্রমুখ।

২। **বিশেষজ্ঞসুলভ নেতৃত্ব ঃ** যখন কোন ব্যক্তি বিশেষ জ্ঞান, উচ্চতর শিক্ষা ও দক্ষতার জন্য সুখ্যাতি অর্জন করে কোন সংঘ বা সংগঠনে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দেন, তখন ঐ ব্যক্তির এরূপ গুণকে বিশেষজ্ঞসুলভ নেতৃত্ব বলে। কবি, সাহিত্যিক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, বিজ্ঞানী, শিল্পী, অধ্যাপকদের মধ্যে থেকে বিশেষজ্ঞসুলভ নেতৃত্ব আসতে পারে।

৩। **রাজনৈতিক নেতৃত্ব ঃ** রাজনৈতিক নেতৃত্ব কোন রাজনৈতিক আদর্শ ও কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে বিকাশ লাভ করে থাকে। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে রাজনৈতিক আদর্শের ভিত্তিতে স্বাধীনতা আন্দোলনের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলকে সংগঠিত করার কাজে সাফল্য লাভ করে কোন ব্যক্তি রাজনৈতিক নেতৃত্বের অধিকারী হয়ে উঠেন। ব্রিটিশ ভারতের মহাত্মা গান্ধী, অবিভক্ত বঙ্গে এ কে ফজলুল হক, ইন্দোনেশিয়ার সুকর্ণ প্রমুখ ব্যক্তি রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

৪। **প্রশাসনিক নেতৃত্ব ঃ** প্রশাসনের সাথে যে সকল ব্যক্তিবর্গ নিয়োজিত তাদের কোন প্রশাসনের বিশেষ যোগ্যতা, সাফল্য, দক্ষতা ও অন্যান্য গুণাবলির ফলে যে নেতৃত্ব গড়ে ওঠে তাকে প্রশাসনিক নেতৃত্ব বলে।

৫। **গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব ঃ** যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে জনগণের অথবা সংগঠনের সদস্যদের মতামতকে প্রাধান্য দিয়ে যে নেতৃত্ব গড়ে ওঠে তাকে গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব বলে। একজন গণতান্ত্রিক নেতা গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত হয়ে থাকেন এবং কর্মীদের মধ্যে দায়িত্ব ও ক্ষমতার কিছু অংশ বন্টন করেন।

৬। **তত্ত্বাবধানকারী নেতৃত্ব ঃ** একনায়কতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় তত্ত্বাবধানকারী নেতৃত্ব লক্ষ্য করা যায়। একক শাসক হিসেবে নেতা সকল কার্য পরিচালনা করেন। সংগঠনের কাজে তার মতামতই প্রাধান্য পায়; জনগণের মতামত প্রকাশের কোন সুযোগ থাকে না।

৭। **সমাজ সংস্কারক নেতৃত্ব ঃ** সমসাময়িক সামাজিক ব্যবস্থার কোন বিশেষ দিক সংস্কারের জন্য বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে অনুপ্রাণিত করা সমাজ সংস্কারকের অন্যতম প্রধান কাজ। যেমন, ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজা রামমোহন রায়, বেগম রোকেয়া, কাজী আব্দুল ওদুদ, সুফিয়া কামাল প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ সমাজ ও শিক্ষা সংস্কারক হিসেবে নন্দিত।

৮। **প্রতীকধর্মী নেতৃত্ব ঃ** যে নেতা তার দেশ ও জাতির প্রকৃত ক্ষমতাশালী না হয়েও, মর্যাদার প্রতীক হিসেবে নেতৃত্ব দান করেন তাকে প্রতীকধর্মী নেতৃত্ব বলে। যেমন, ব্রিটেনের রাজা বা রাণী, থাইল্যান্ডের রাজা প্রমুখ।

৯। **সর্বাত্মকবাদী নেতৃত্ব ঃ** সর্বাত্মকবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় এ ধরণের নেতৃত্ব লক্ষ্য করা যায়। এ ধরণের নেতৃত্ব ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত সবকিছু নেতা নিয়ন্ত্রণ করে। এ ধরনের রাষ্ট্রে সংবিধানের জায়গায় নেতার ইচ্ছাই সর্বোচ্চ আইন হয়ে উঠে।

১০। **বুদ্ধিজীবী নেতৃত্ব ঃ** চিন্তা ও সৃজনশীল জগতে আলোড়ন ও প্রভাব সৃষ্টিকারী ব্যক্তি তাঁর জ্ঞান, মেধা ও লেখনীর মাধ্যমে নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হন। যেমন, প্লেটো, কার্ল মার্কস, জাঁ জ্যাক রুশো প্রমুখ।

পরিশেষে বলা যায়, নেতৃত্বের প্রকারভেদে ভিন্নতা লক্ষ্য করা গেলেও এর মূল লক্ষ্য সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণ সাধন করা।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	নেতৃত্বের প্রকারভেদ উল্লেখ করুন।

সার-সংক্ষেপ

নেতৃত্ব হল কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সমষ্টির সেই সব গুণাবলি যা সমাজ বা রাষ্ট্রের কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে অন্যদের অনুপ্রাণিত করার মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ করে। যোগ্য নেতৃত্বের কারণে একটি দেশ যেমন সফলতার শীর্ষে আরোহণ করতে পারে, তেমনি অযোগ্য নেতৃত্বের কারণে কোন রাষ্ট্রে অধঃপতন নেমে আসতে পারে। নেতৃত্বের বিভিন্ন ধরণ রয়েছে, যেমন– রাজনৈতিক নেতৃত্ব, সম্মোহনী নেতৃত্ব, গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব, সমাজ সংস্কারক নেতৃত্ব ও বুদ্ধিজীবী নেতৃত্ব।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। 'নেতৃত্ব' হচ্ছে নেতার–
(ক) সামাজিক ও রাজনৈতিক গুণ (খ) অর্থনৈতিক গুণ
(গ) নৈতিক গুণ (ঘ) ধৈর্য গুণ

২। নেতৃত্ব হচ্ছে ব্যক্তির সেই গুণাবলি যার মাধ্যমে সে অন্যের কর্মকান্ডকে প্রভাবিত করে এবং অন্যদের উপর প্রভাব বিস্তার করে। কে বলেছেন?
(ক) বার্নাড (খ) ডানেল
(গ) মিলেট (ঘ) ইয়ং

৩। সম্মোহনী নেতৃত্বের অধিকারী হলেন–
(i) মহাত্মা গান্ধী (ii) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
(iii) জর্জ বুশ
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) i ও ii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৪। দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ কল্যাণের জন্য নেতার কোন গুণটি থাকা আবশ্যক?
(ক) প্রজ্ঞা (খ) সততা
(গ) দূরদৃষ্টি (ঘ) সব কয়টি

পাঠ-৮.৮ নেতৃত্বের গুণাবলি (Qualities of Leadership)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- নেতৃত্বের প্রয়োজনীয় গুণাবলি সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	বুদ্ধিমত্তা, উত্তম শ্রোতা, ন্যায়পরায়ণতা, দেশপ্রেম, ধৈর্য্য, দূরদৃষ্টি।

নেতৃত্বের প্রয়োজনীয় গুণাবলি

মার্ক মিলার মনে করেন, "আত্মসংযম, সাধারণ জ্ঞান, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, ন্যায়পরায়ণতা, সৎ সাহস, বিশ্বাস ও আনুগত্য প্রভৃতি একজন যোগ্য নেতার গুণাবলি।"

অধ্যাপক মিশেলস বলেন, "নেতৃত্ব হচ্ছে ইচ্ছাশক্তি, বিস্তৃত জ্ঞান, বিশ্বাসের দৃঢ়তা ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা।" দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেলের মতে, "নেতৃত্বের অপরিহার্য গুণ হল আত্মবিশ্বাস, সার্বিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতা ও দ্রুত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ক্ষমতা।" নিম্নে নেতৃত্বের প্রয়োজনীয় গুণাবলি উল্লেখ করা হল।

১। **আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ঃ** নেতাকে অবশ্যই আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী হওয়া উচিত। চারিত্রিক দৃঢ়তা, মাধুর্য, তেজস্বিতা, নমনীয়তা, বাগ্মীতা প্রভৃতি গুণের মাধ্যমে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশ হয়। ব্যক্তিত্বই একজন মানুষকে নেতৃত্বের পদে অধিষ্ঠিত হতে সাহায্য করে।

২। **বুদ্ধিমত্তা ঃ** বুদ্ধিমত্তা নেতার আবশ্যকীয় গুণ। নেতা তার তীক্ষ্ণ বোধশক্তি দিয়ে সমস্যা সমাধান করে জনগণের নিকট সম্মান ও শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত হতে পারেন। নির্বোধ ও বুদ্ধিমত্তাহীন ব্যক্তি ভালো নেতা হওয়ার যোগ্যতা রাখে না।

৩। **শিক্ষা ঃ** শিক্ষা মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক চেতনা বৃদ্ধি করে। যার জন্য নেতাকে নিজস্ব বিষয়ে শিক্ষা ও প্রজ্ঞার অধিকারী হতে হবে। তাকে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিষয়ে সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কে অবহিত থাকতে হয়। একজন অশিক্ষিত ব্যক্তি জনগণের ভালো নেতা হতে পারেন না।

৪। **মানসিক ও দৈহিক সুস্থতা ঃ** মানসিক ও দৈহিক সুস্থতা ব্যতীত কোন ব্যক্তি নেতা হতে পারেন না। নেতাকে অবশ্যই সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে। সুস্বাস্থ্য ছাড়া নেতা কঠিন দায়িত্ব পালন করতে পারবে না। নেতার কর্ম দক্ষতা ও কষ্ট সহিষ্ণুতা নির্ভর করে তার মানসিক ও শারীরিক সুস্থতার উপর।

৫। **অভিজ্ঞতা ঃ** যিনি যে বিষয়ে নেতৃত্ব প্রদান করবেন তাকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ হতে হবে। অভিজ্ঞতা ব্যতীত যে কোন কর্ম পরিকল্পনা পরিপূর্ণ রূপে বাস্তবায়ন করা কষ্টসাধ্য। কেননা নেতার কর্ম কল্পনার উপর দেশ ও জাতির সামগ্রিক কল্যাণ নির্ভর করে।

৬। **বাগ্মিতা ও উত্তম শ্রোতা ঃ** বাগ্মিতা নেতার অন্যতম গুণ। নেতা ভালো বক্তৃতা দানে সক্ষম হলে শ্রোতারা তার কথা আগ্রহের সাথে শ্রবণ করেন। বাগ্মি নেতা জনগণের মন জয় করে নিতে পারেন। ভালো বক্তৃতাদানের সাথে একজন নেতাকে জনগণের কথা মনযোগের সাথে শুনতে হবে এবং সেরকম পদক্ষে গ্রহণ করতে হবে।

৭। **দূরদৃষ্টি ঃ** দূরদৃষ্টি সম্পন্ন একজন নেতা ভবিষ্যতের সমস্যার ব্যাপারে আগে থেকে ধারণা করায় সক্ষম থাকেন। ভবিষ্যতের সমস্যার সম্ভাব্য সমাধানের ব্যাপারে তিনি চিন্তা করতে পারেন। এমন গুনাবলি সম্পন্ন নেতা যে কোন রাষ্ট্র বা সমাজের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ।

৮। **ধৈর্য ও সহনশীলতা ঃ** নেতাকে অবশ্যই ধৈর্য ও সহনশীল হতে হয়। যে কোন জটিল পরিস্থিতি নেতাকে ধৈর্য, সাহস ও সহনশীলতার মাধ্যমে মোকাবেলা করতে হয়।

৯। **নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি ঃ** একজন ভালো নেতা কখনো আংশিক জনগোষ্ঠীর হতে পারে না। তিনি সার্বজনীন নেতা। তাই তাকে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, ধনী-গরীব নির্বিশেষে সকলের কাছে নিরপেক্ষ হিসাবে বিবেচিত হতে হবে।

১০। **দেশপ্রেম ঃ** একজন নেতাকে অবশ্যই দেশপ্রেমিক হতে হবে। দেশদ্রোহী কোন কর্মকান্ডের সাথে তিনি যেমন সম্পৃক্ত হবেন না, তেমনি তার অনুসারীদেরকেও এধরনের কর্মকান্ড থেকে বিরত রেখে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করবেন।

১১। দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ঃ নেতাকে অনেক সময় তাৎক্ষণিক সংকট মোকাবেলার জন্য দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এধরণের সিদ্ধান্ত নিতে পারার সক্ষমতা জাতিকে সংঘাতময় পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করতে পারে।

১২। ন্যায়পরায়ণতা ঃ নেতাকে ন্যায়পরায়ণ হতে হবে। তিনি হবেন ন্যায়-নীতির প্রতীক। সকল শ্রেণির মানুষের কাছে তিনি সমান গ্রহণযোগ্য হবেন। তিনি হবেন উন্নত সৎ চরিত্রের অধিকারী।

১৩। উদারতা ঃ নেতা হবেন উদার মনের অধিকারী। নেতাকে ব্যক্তি স্বার্থ পরিহার করে সর্বজনের স্বার্থকে প্রাধান্য দিতে হবে। নেতাকে সংকীর্ণতা, দীনতা, পরশ্রীকাতরতা, স্বার্থপরতা ও হীনমন্যতা ত্যাগ করতে হবে।

১৪। প্রতিশ্রুতি রক্ষা ঃ নেতাকে অবশ্যই তার প্রদেয় প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে হবে। বিশেষ করে নির্বাচনের প্রাক্কালে জনগণের নিকট দায়বদ্ধ প্রতিশ্রুতি নেতাকে পূরণ করতে হবে। অর্থাৎ নেতাকে তার কথা ও কাজের মিল রাখতে হবে।

১৫। আত্মবিশ্বাসী ঃ নেতার অন্যতম গুণ আত্মবিশ্বাস। আত্মবিশ্বাসহীন কোন নেতা জনগণের কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। তাই নেতাকে অবশ্যই কাজে-কর্মে আত্মবিশ্বাসী হতে হবে।

১৬। মিষ্টভাষী ঃ একজন ভালো নেতাকে রুঢ় আচরণ পরিত্যাগ করতে হবে। তাকে হতে হবে মিষ্টভাষী, সদালাপী, নিরহংকারী, সদাহাস্যোজ্জল এবং কঠোর পরিশ্রমী।

পরিশেষে বলা যায়, একটি ভালো রাষ্ট্রের জন্য একজন ভালো নেতা অত্যন্ত জরুরি। সঠিক নেতৃত্ব থাকলে পিছিয়ে পড়া যে কোন দেশ ও জনগোষ্ঠী উন্নয়নের ধারায় অবতীর্ণ হতে পারে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	নেত্বত্বের দশটি গুণাবলি লিখুন।

সার-সংক্ষেপ

নেতৃত্ব একটি বিশেষ গুণ। যে কেউ ইচ্ছা প্রকাশ করলেই নেতা হতে পারে না। নেতা হওয়ার জন্য কিছু গুনাবলি একান্ত প্রয়োজন। কিথ ডেভিস নেতৃত্বের কয়েকটি গুণের কথা বলেছেন। যথা– বুদ্ধিমত্তা, পরিপক্কতা ও উদারতা, অভ্যন্তরীণ প্রেষণা ও মানবিক দিক সম্পর্কিত ধারণা। নেতাকে অবশ্যই সৎ, বুদ্ধিমান, শিক্ষিত, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, জনদরদি, উদার, সংযম, নিষ্ঠাবান, দূরদৃষ্টি ও উপস্থিত বুদ্ধি সম্পন্ন হতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন

১। "নেতৃত্বের অপরিহার্য গুণ হল আত্মবিশ্বাস, সার্বিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতা ও দ্রুত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ক্ষমতা" উক্তিটি কে করেছেন?

(ক) অধ্যাপক মিসেলস (খ) বার্ট্রান্ড রাসেল
(গ) লাসওয়েল (ঘ) অ্যালান বল

২। 'নেতৃত্ব হচ্ছে ইচ্ছাশক্তি, বিস্তৃত জ্ঞান, বিশ্বাসের দৃঢ়তা ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা।' কে বলেছেন?

(ক) বার্ট্রান্ড রাসেল (খ) লর্ড ব্রাইস
(গ) অধ্যাপক মিশেলস (ঘ) জাঁ পল সাঁত্রে

৩। নেতৃত্বের অপরিহার্য গুণ–

(i) বুদ্ধিমত্তা (ii) শিক্ষা (iii) দূরদর্শিতা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) i ও ii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৮.৯ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্ব (Leadership in Establishing Good Governance)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্বের ভূমিকা পর্যালোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	সুশাসন, রাজনৈতিক শিক্ষা, আইনের শাসন, সমন্বয় সাধন, জবাবদিহিতা।

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্ব

সুশাসন এবং নেতৃত্ব বর্তমান সময়ের অত্যন্ত জনপ্রিয় আলোচ্য বিষয়। সঠিক এবং কার্যকরী নেতৃত্ব থাকলে রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা সহজ হয়। সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য অনেকগুলো পূর্বশর্তের মধ্যে যোগ্য নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা অন্যতম। নিম্নে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্বের ভূমিকা আলোচনা করা হল–

১। **নীতি নির্ধারক ঃ** নেতার প্রথম ও প্রধান কাজ হল রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণ এবং তা বাস্তবায়ন করা। জনস্বার্থের অনুকূল, যুগোপযোগী রাষ্ট্রীয় নীতিমালা গ্রহণে নেতৃত্বের দক্ষতার সাথে সুশাসনের বিষয়টি গভীরভাবে জড়িত।

২। **জনমত গঠন ঃ** রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিষয়ে নেতারা জনমত গঠন করেন। জনগণ রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতার উৎস। জনগণ যাতে রাষ্ট্রীয় কার্যে অংশগ্রহণ করতে পারে সেদিকে নেতৃত্বকে গুরুত্ব দিতে হবে। সাধারণ নাগরিকেরা উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় যদি অংশগ্রহণ করে তাহলে সে রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩। **রাজনৈতিক শিক্ষার প্রসার ঃ** একজন নেতা রাজনৈতিক শিক্ষার প্রসারে অনেক বড় ভূমিকা রাখেন। রাষ্ট্র, সমাজ, উন্নয়ন, পররাষ্ট্রনীতি থেকে শুরু করে অনেকগুলো বিষয়ে রাজনৈতিক নেতৃত্ব নিয়মিত বক্তব্য দিয়ে থাকেন। নির্বাচনের প্রাক্কালে বিভিন্ন রকম সভা-সমাবেশ, মিছিল, ব্যানার, ফেস্টুন, লিফলেট, পোস্টার, শব্দযন্ত্র, র‍্যালি প্রভৃতির মাধ্যমে নেতারা জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করে। এ ধরনের সকল কর্মকান্ড থেকে সাধারণ জনগণ অবিরাম রাজনৈতিক শিক্ষা লাভ করে।

৪। **পরিকল্পনা প্রণয়ন ঃ** পরিকল্পনা প্রণয়ন নেতার একটি বিশেষ কাজ। সঠিক ও উন্নয়নমুখী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা প্রতিটি রাষ্ট্রের জন্য অপরিহার্য। সুষ্ঠু, উন্নত, কার্যকরী পরিকল্পনা প্রণয়নের উপর নেতার সাফল্য নির্ভর করে। নেতা যদি সর্বদা সংবিধানসম্মত পন্থা গ্রহণ করে তাহলে সে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে।

৫। **রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ঃ** রাজনৈতিক পরিবেশ স্থিতিশীল থাকলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা পায়। রাজনৈতিক পরিবেশ স্থিতিশীল রাখার জন্য অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হয় নেতাদের। রাজনৈতিক পরিবেশ স্থিতিশীল হলে উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। উন্নয়ন ত্বরান্বিত হলে সুশাসন নিশ্চিত হয়।

৬। **ঐক্যমত ঃ** ঐক্যমত সৃষ্টি করা নেতার অন্যতম কাজ। নেতারা বিভিন্নভাবে জনগণের মধ্যে বিভিন্ন বিতর্কিত বিষয়ে ঐক্যমত সৃষ্টি করেন। জনসমাজে ঐক্যমত্য থাকলে যে কোন দেশে সার্বিক উন্নয়নে প্রাণ আসে। যথাযথ উন্নয়ন হলে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা পায়।

৭। **গণতন্ত্র সুরক্ষা ঃ** গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় সুশাসন নিশ্চিত হয়। গণতান্ত্রিক ধারাকে অব্যাহত রাখার দায়িত্ব নেতৃবৃন্দের হাতে। নেতৃবৃন্দ গণতন্ত্রকে সুরক্ষা দিলে সুশাসন সুরক্ষা পাবে। কেননা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যেই সুশাসন বিদ্যমান।

৮। **আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ঃ** আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় নেতৃবৃন্দকে ভূমিকা রাখতে হয়। একজন ভালো নেতা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সকল উদ্যোগে নিজেকে শামিল করেন। রাষ্ট্রে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা পেলে সুশাসন স্বাভাবিক হয়ে ওঠে।

৯। **স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা ঃ** স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কার্যকরী ভূমিকা রাখে। এ বিষয়ে সহযোগিতা করেন নেতৃবৃন্দ। সঠিক নেতৃত্বই প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখে।

১০। **সমন্বয় সাধন ঃ** যোগ্য নেতৃত্ব রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন দল, সংগঠন, ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কাজের সমন্বয় সাধন করে থাকেন। এর ফলে দেশের উন্নয়ন, প্রবৃদ্ধি ও সুশাসন নিশ্চিত হয়।

পরিশেষে বলা যায়, সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্বের গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ শাসনকার্য পরিচালনার মূলে রয়েছে নেতৃত্ব। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য যোগ্য নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার কোন বিকল্প নেই।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা বেশি কেন?

সার-সংক্ষেপ

বর্তমান সময়ে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সুশাসন হচ্ছে অন্যতম প্রধান চাহিদা। সুশাসন ব্যতীত গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত রাখা সম্ভবপর নয়। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্বের গুরুত্ব অপরিসীম। আধুনিক শাসন ব্যবস্থায় নেতা তাঁর কার্যাবলি গণতান্ত্রিকভাবে সম্পাদনের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখেন। সঠিক নেতৃত্বের মাধ্যমে একটি রাষ্ট্র উন্নতির শীর্ষে অবস্থান করতে পারে। দক্ষ ও সঠিক নেতৃত্ব ছাড়া সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৯

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। নেতার প্রথম ও প্রধান কাজ কি?
(ক) সমন্বয় সাধন (খ) স্বচ্ছতা
(গ) নীতি নির্ধারণ (ঘ) পরিকল্পনা প্রণয়ন

২। রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতার উৎস কে?
(ক) রাজনৈতিক দল (খ) জনগণ
(গ) চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী (ঘ) আমলা

৩। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্ব–
(i) নীতি নির্ধারণ করে (ii) আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করে (iii) জনমত গঠন করে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) i ও ii
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন ১নং ও ২নং প্রশ্নের উত্তর দিন ঃ

'ক' একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। জাতীয় নির্বাচনে কবির খান তার দলের পক্ষে কাজ করে। দলটি অন্যান্য দলের চেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে জয়লাভ করে এবং সরকার গঠন করে।

১। উদ্দীপকের 'ক' রাষ্ট্রে কোন ধরনের দলীয় ব্যবস্থা বিদ্যমান?

(ক) একদলীয় (খ) দ্বি-দলীয়
(গ) নির্দলীয় (ঘ) বহুদলীয়

২। উদ্দীপকের কবির খান কী ধরনের দলের সদস্য?

(ক) চাপসৃষ্টিকারী দল (খ) আঞ্চলিক দল
(গ) রাজনৈতিক দল (ঘ) সাংস্কৃতিক দল

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন ৩নং প্রশ্নের উত্তর দিন ঃ

ড. সরোয়ার হোসেন একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। বিশেষ জ্ঞান, উচ্চতর শিক্ষা ও দক্ষতার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি অনেক সুখ্যাতি ও সম্মান অর্জন করেছেন। এই ধারাবাহিকতাতে তাঁর মধ্যে এক ধরনের নেতৃত্বের বিকাশ ঘটেছে।

৩। ড. সরোয়ার হোসেনের নেতৃত্ব কোন প্রকৃতির?

(ক) সম্মোহনী (খ) প্রশাসনিক
(গ) রাজনৈতিক (ঘ) বিশেষজ্ঞসুলভ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন ৪নং ও ৫নং প্রশ্নের উত্তর দিন ঃ

মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান একটি রাজনৈতিক দলের সদস্য। তিনি তার দল থেকে মনোনয়ন নিয়ে জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে চান। দলের নীতি, আদর্শ ও কর্মসূচির পক্ষে জনমত গড়ে তুলতে তিনি কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি তার অনুগত কর্মীদের দেশ-প্রেম ও জাতীয় স্বার্থে অনুপ্রাণিত হতে উদ্বুদ্ধ করেন।

৪। উদ্দীপকের উল্লেখিত দলটি কোন ধরনের–

(ক) চাপসৃষ্টিকারী দল (খ) রাজনৈতিক দল
(গ) উপদল (ঘ) স্বার্থান্বেষী দল

৫। উদ্দীপকের উল্লেখিত সংগঠনটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে গুরুত্বপূর্ণ কেননা এর মাধ্যমে–

(ক) ব্যক্তিস্বার্থ সংরক্ষিত হয় (খ) বিদেশী স্বার্থ রক্ষা হয়
(গ) জনমত সংগঠিত হয় (ঘ) নির্বাচন ভন্ডুল হয়

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। আধুনিক যুগকে বলা হয় প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের যুগ। জনগণ ভোটের মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচন করে এবং পরোক্ষভাবে শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করে। এ জন্য প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রকে দলীয় সরকার ব্যবস্থাও বলা হয়। মিজানুর রহমান "ক" রাজনৈতিক দলের একজন নেতা। তিনি অত্যন্ত সৎ, দক্ষ, অভিজ্ঞ, পরিশ্রমী, ত্যাগী ও দায়িত্বশীল নেতা হিসেবে সবার কাছে সুপরিচিত। তিনি সব সময় তার নির্বাচনী এলাকার জনগণের পাশে থাকেন। জনগণও তাকে খুব পছন্দ করে এবং ভোট দিয়ে জয়ী করে। তিনি জনগণ ও সরকারের সেতু বন্ধন হিসেবে কাজ করেন এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

(ক) নেতৃত্ব কী?
(খ) রাজনৈতিক দল কাকে বলে?
(গ) উদ্দীপকে মিজানুর রহমানের বৈশিষ্ট্যের আলোকে একজন নেতার প্রয়োজনীয় গুণাবলি আলোচনা করুন।
(ঘ) সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্বের ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন।

২। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় জনগণ তাদের অধিকার সম্পর্কে খুব বেশি সচেতন। কিন্তু একক প্রচেষ্টায় যে তা সব সময় লাভ করা যায় না সে সম্পর্কেও তারা অবগত। ফলে প্রত্যেকেই তাদের নিজ-নিজ অবস্থান থেকে বিভিন্ন সংগঠনের সাথে যুক্ত হয় আবার কিছু সংগঠন গড়েও তোলেন। এর মধ্যে আবার কিছু সংগঠনের প্রধান লক্ষ্য নির্বাচিত হয়ে জনকল্যাণ সাধন করা আর কিছু সংগঠনের লক্ষ্য হচ্ছে নির্দিষ্ট একটি গোষ্ঠীর স্বার্থ হাসিল করা।

(ক) রাজনৈতিক দল সম্পর্কে এডমন্ড বার্কের প্রদত্ত সংজ্ঞাটি তুলে ধরুন।

(খ) চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী বলতে কী বোঝায়?

(গ) উদ্দীপকের আলোকে উল্লিখিত সংগঠনের সাথে আপনার পাঠ্য বইয়ের কোন সংগঠনের মিল আছে? ব্যাখ্যা করুন।

(ঘ) উদ্দীপকের আলোকে রাজনৈতিক ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.১ ঃ ১। খ ২। ক ৩। ঘ ৪। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.২ ঃ ১। গ ২। গ ৩। ঘ ৪। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৩ ঃ ১। খ ২। খ ৩। গ ৪। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৪ ঃ ১। খ ২। গ ৩। ঘ ৪। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৫ ঃ ১। ক ২। ক ৩। ক ৪। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৬ ঃ ১। ঘ ২। ঘ ৩। খ ৪। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৭ ঃ ১। ক ২। ঘ ৩। খ ৪। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৮ ঃ ১। খ ২। গ ৩। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৯ ঃ ১। গ ২। খ ৩। ঘ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন ঃ ১। ঘ ২। গ ৩। ঘ ৪। খ ৫। গ

সরকারের অঙ্গসমূহ (Organs of Government)

ইউনিট ৯

সরকার রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এবং এটি রাষ্ট্রের মস্তিষ্ক নামে পরিচিত। সরকারের সাধারণত আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ নামে তিনটি বিভাগ থাকে। আইন বিভাগ আইন প্রণয়ন করে, শাসন বিভাগ আইনকে প্রয়োগ করে এবং বিচার বিভাগ বিচারিক কার্য সম্পাদন করে। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় সরকারের তিনটি বিভাগের কর্ম-দক্ষতার উপর সরকারের সাফল্য নির্ভর করে। এই ইউনিটে সরকারের এই তিনটি বিষয়ে কার্যাবলীসহ নানাবিধ প্রাসঙ্গিক বিষয় আলোচনা করা হয়েছে।

এই ইউনিটের পাঠসমূহ-

পাঠ-৯.১ ঃ সরকারের অঙ্গ	পাঠ-৯.৯ঃ বিচার বিভাগের গঠন ও কার্যাবলি
পাঠ-৯.২ ঃ আইনসভার ধারণা ও কার্যাবলি	পাঠ-৯.১০ঃ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় বিচার বিভাগের ভূমিকা
পাঠ-৯.৩ ঃ এক কক্ষ বিশিষ্ট আইন সভা	পাঠ-৯.১১ঃ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা
পাঠ-৯.৪ ঃ দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইন সভা	পাঠ-৯.১২ঃ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি
পাঠ-৯.৫ ঃ গণতন্ত্রে আইন সভার ভূমিকা	পাঠ-৯.১৩ঃ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির সুবিধা ও অসুবিধা
পাঠ-৯.৬ঃ আইন সভার ক্ষমতা হ্রাসের কারণ	পাঠ-৯.১৪ঃ ক্ষমতা ভারসাম্য নীতি
পাঠ-৯.৭ঃ শাসন বিভাগের গঠন ও কার্যাবলি	পাঠ-৯.১৫ঃ বাংলাদেশে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রয়োগ
পাঠ-৯.৮ঃ শাসন বিভাগের ক্ষমতা বৃদ্ধি	

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ**

পাঠ-৯.১ সরকারের অঙ্গ (Organs of Government)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- সরকারের অঙ্গসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	সরকার, আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ, বিচার বিভাগ, আইনের শাসন, সার্বভৌম।

সরকারের অঙ্গসমূহ

রাষ্ট্র একটি বিমূর্ত ধারণা। রাষ্ট্রকে বাস্তবে দেখা যায় না। রাষ্ট্রকে উপলব্ধি করা যায় এর অন্যতম উপাদান সরকারের মাধ্যমে। রাষ্ট্রের অন্য তিনটি উপাদান হচ্ছে নাগরিক, ভূখন্ড ও সার্বভৌমত্ব। রাষ্ট্র তার সার্বভৌম ক্ষমতা সরকারের মাধ্যমে প্রয়োগ করে। আর সরকার গঠিত হয় জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে। সরকার ব্যতীত কোন রাষ্ট্র কল্পনা করা যায় না। সরকার সংবিধান প্রণয়নের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি বা কৌশল তৈরি করে। সরকার রাষ্ট্র পরিচালনা, জনগণের

নিরাপত্তা প্রদান, জনগণের অধিকার রক্ষা, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা, জনকল্যাণ সাধন, ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণসহ রাষ্ট্রের সামগ্রিক কল্যাণ সাধন করে থাকে। তাই সরকারকে বাদ দিয়ে রাষ্ট্রের কথা চিন্তাই করা যায় না। এরিস্টটল সরকারের কার্যাবলিকে যে তিনভাবে ভাগ করেছেন তা হল– সিদ্ধান্তমূলক, শাসন সংক্রান্ত ও বিচার সংক্রান্ত। এ তিন ধরণের কার্যসম্পাদনের জন্য সরকারের তিন প্রকার ক্ষমতাও রয়েছে। এগুলো হচ্ছে আইন বিষয়ক ক্ষমতা, শাসন বিষয়ক ক্ষমতা ও বিচার বিষয়ক ক্ষমতা। প্রতিটি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সরকার নিজস্ব তিনটি বিভাগের সাহায্যে যাবতীয় কার্য সম্পাদন করে। সরকারের এ তিনটি বিভাগ বা অঙ্গসমূহ হল–

(i) আইন বিভাগ (The Legislative)
(ii) শাসন বিভাগ (The Executive)
(iii) বিচার বিভাগ (The Judiciary)

সরকারের যে বিভাগ আইন প্রণয়ন, পরিবর্তন ও সংশোধন করে তাকে আইন বিভাগ বলে। আইন বিভাগ কর্তৃক প্রণীত আইনকে যে বিভাগ বাস্তবায়িত করে সে বিভাগকে শাসন বিভাগ বা নির্বাহী বিভাগ বলে। রাষ্ট্রের সকল ধরনের প্রশাসনিক কাজকর্ম শাসন বিভাগ দ্বারা সম্পাদিত হয়। সরকারের যে বিভাগ বিচারিক কার্য সম্পাদন করে তাকে বিচার বিভাগ বলে। অন্যভাবে বলা যায়, সরকারের যে বিভাগ দেশে প্রচলিত আইন অনুযায়ী অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করে এবং জনগণের অধিকার রক্ষা করে তাকে বিচার বিভাগ বলে। বিচার বিভাগ স্বাধীন, নিরপেক্ষ থাকলে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। সংবিধান সমুন্নত রাখা বিচার বিভাগের অন্যতম দায়িত্ব।

সংসদীয় শাসন ব্যবস্থাতে আইন সভাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক দলের হাতেই রাষ্ট্রের নির্বাহী বিভাগের ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে। বিচার বিভাগ উভয় বিভাগের নিয়ন্ত্রনের বাইরে থেকে স্বাধীনভাবে কাজ করে। পক্ষান্তরে, রাষ্ট্রপ্রধান শাসিত ব্যবস্থাতে ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতি চালু থাকে। এই নীতি মোতাবেক, প্রত্যেকটি বিভাগ যার যার অবস্থান থেকে স্বাধীনভাবে কাজ করে। আবার তিনটি বিভাগ যাতে করে স্বাধীনভাবে কাজ করতে যেয়ে স্বেচ্ছাচারী না হয়ে উঠতে পারে, সেজন্য রাষ্ট্রপ্রধান শাসিত ব্যবস্থাতে ক্ষমতার ভারসাম্য নীতি চালু থাকে। এ নীতি চালু থাকলে সরকারের কোন একটি বিভাগ স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠতে চাইলে, অন্য দুই বিভাগের মাধ্যমে এর রাশ টেনে ধরার ব্যবস্থা থাকে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি**) /শিক্ষার্থীর কাজ**	সরকারের অঙ্গগুলোর নাম লিখুন।

সার-সংক্ষেপ

চারটি উপাদান নিয়ে রাষ্ট্র গঠিত হয়। রাষ্ট্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান হল সরকার। সরকার ব্যতীত রাষ্ট্র পরিচালনা করা অসম্ভব। সরকারকে রাষ্ট্রের মুখপাত্র বলা হয়। সরকারের মাধ্যমে রাষ্ট্রের ইচ্ছা-অনিচ্ছা প্রকাশিত হয়। সরকারের অঙ্গ তিনটি। যথা– আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ। সরকার এ তিনটি বিভাগের মাধ্যমে তার সকল কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে। আইন বিভাগ আইন প্রণয়ন করে। শাসন বিভাগ সে আইন বাস্তবায়ন করে এবং বিচার বিভাগ বিচারিক কার্য-সম্পাদন ও সংবিধানের ব্যাখ্যা প্রদান করে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সরকারের বিভাগ কয়টি?

(ক) ২টি (খ) ৩টি
(গ) ৪টি (ঘ) ৫টি

২। রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করে কিসের মাধ্যমে–
(ক) রাজনৈতিক দল (খ) আইন বিভাগ
(গ) সরকার (ঘ) চাপসৃষ্টিকারী দল

৩। সরকারের যে বিভাগ আইন প্রণয়ন, পরিবর্তন ও সংশোধন করে তাকে কি বলে?
(ক) আইন বিভাগ (খ) শাসন বিভাগ
(গ) বিচার বিভাগ (ঘ) নির্বাচকমন্ডলী

৪। রাষ্ট্রে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়–
(i) বিচার বিভাগ স্বাধীন থাকলে
(ii) বিচার বিভাগের উপর হস্তক্ষেপ থাকলে
(iii) বিচার বিভাগ নিরপেক্ষ থাকলে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) i ও ii
(গ) ii ও iii (ঘ) i ও iii

পাঠ-৯.২ আইনসভার ধারণা ও কার্যাবলি
(Concepts and Functions of the Legislature)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- আইনসভা সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- আইনসভার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- আইনসভার কার্যাবলি আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	আইনসভা, জনপ্রতিনিধি, আইন প্রণয়ন, সংবিধান রচনা, রাজনৈতিক চেতনা, রাজনৈতিক বৈধকরণ, রাজনৈতিক মতৈক্য।

আইনসভা

সরকারের যে বিভাগ আইন প্রণয়ন, পরিবর্তন ও সংশোধন করে তাকে আইন বিভাগ বলে। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় বিশেষ করে সংসদীয় গণতন্ত্রে আইন বিভাগের গুরুত্ব অপরিসীম। আইন বিভাগ কর্তৃক প্রণীত আইনের মাধ্যমে একটি দেশের শাসনকার্য পরিচালিত হয়। আইনসভার সদস্যগণ হলেন জনসাধারণ কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি। অধ্যাপক জে ডব্লিউ গার্নার (J.W. Garner) বলেন, "সরকারের যে সকল বিভাগের মাধ্যমে রাষ্ট্রের ইচ্ছা প্রকাশিত ও কার্যকরী হয় তন্মধ্যে নিঃসন্দেহে আইন বিভাগের স্থান সর্বোচ্চ।" ইংল্যান্ডের সংবিধান বিশেষজ্ঞ ওয়াল্টার বেইজট আইনসভা সম্পর্কে বলেন, "এটা হল জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠানের মহান চালিকা শক্তি, যেখানে সকল সমস্যার সমাধান হয় এবং সর্বক্ষেত্রে জনগণের প্রাধান্য থাকে।" আইনসভায় জনমতের যেমন প্রতিফলন হয় তেমনি জনগণের আশা-আকাঙ্খাও নির্বাচিত প্রতিনিধিরা তুলে ধরেন। সরকারের সকল কাজে আইনসভার অনুমোদন প্রয়োজন হয়। আইনসভার অনুমোদন ছাড়া সরকার আর্থিক কাজ সম্পন্ন করতে পারে না। আইন বিভাগ শাসন বিভাগকে সংগঠন করে, সংসদীয় গণতন্ত্রে মন্ত্রিসভা গঠন করে এবং মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুতও করে থাকে। আইনসভা দেশের সংবিধান প্রণয়ন ও তা বাতিল বা সংশোধন করতে পারে। সুতরাং আইনসভার মর্যাদা ও গুরুত্ব সীমাহীন।

আইনসভার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

বর্তমানে প্রত্যেকটি দেশে সরকারের অন্যতম একটি বিভাগ হচ্ছে আইনসভা। আইন প্রণয়ণে আইনসভা কার্যকরি ভূমিকা পালন করে। কিন্তু প্রাচীনকালে সরকারের এ আইনসভার কোন অস্তিত্ব ছিল না। তখন রাজতন্ত্রের রাজা কিংবা অভিজাততন্ত্রের অভিজাত ব্যক্তিবর্গই আইন প্রণয়ন ও কার্যকর করতেন। প্রাচীন গ্রীক নগররাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিশেষ করে এথেন্সে রাষ্ট্র পরিচালনা প্রধান হিসেবে কাজ করত এসেম্বলি। এই এসেম্বলি কিছু মাত্রাতে আজকের দিনের আইনসভা হিসেবে কাজ করত। তবে আধুনিক আইনসভা জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিতদের দ্বারা গঠিত হয়। পক্ষান্তরে, এ্যাসেম্বলির জন্য নির্বাচনের কোন বিধান ছিল না। প্রাচীন জার্মানীর টিউটিনদের (Teutons) শাসন ব্যবস্থার মধ্যে কিছুটা প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায়। ব্রিটিশ পার্লামেন্টকে বলা হয় আইনসভার জননী। অধ্যাপক মুনরো (Professor Munro) বলেন, "The British Parliament is the mother of all Parliaments." শুরুর দিকে এই আইনসভাও সাধারণ নাগরিকদের জন্য উন্মুক্ত ছিল না। ১৬৮৮ সালে গৌরবময় বিপ্লবের পরে ইংল্যান্ডে একচ্ছত্র রাজতন্ত্রের অবসান হয়ে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র চালু হয়। তখন থেকেই ইংল্যান্ডের আইনসভা তথা পার্লামেন্ট জনপ্রতিনিধিত্বমূলক হতে শুরু করে।

আইনসভার ক্ষমতা ও কার্যাবলি

আইনসভার ক্ষমতা ও কার্যাবলিকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা– (ক) প্রত্যক্ষ কার্যাবলি ও (খ) পরোক্ষ কার্যাবলি।

(ক) প্রত্যক্ষ কার্যাবলি ঃ

১। **আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ঃ** আইন প্রণয়ন করাই হল আইন বিভাগের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ। দেশের সংবিধানের সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে এবং জনমতের গতি-প্রকৃতির দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে আইনসভা নতুন আইন প্রণয়ন করে। পুরাতন আইন সংশোধন এবং অপ্রয়োজনীয় আইন বাতিল করতে পারে। বর্তমানকালে আইনসভাই আইনের সর্বপ্রকার উৎস। আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইন দ্বারাই শাসন বিভাগ শাসন কার্য পরিচালনা করে এবং বিচারবিভাগ বিচারকার্য করে থাকে।

২। **সংবিধান প্রণয়ন ও সংশোধন সংক্রান্ত ঃ** আইনসভার একটি উল্লেখযোগ্য ক্ষমতা ও কাজ হচ্ছে দেশের মৌলিক আইন অর্থাৎ সংবিধান প্রবর্তন ও সংশোধন করা। কোন কোন রাষ্ট্রে আইন বিভাগ সংবিধানের চূড়ান্ত ব্যাখ্যাকর্তা হিসেবে কাজ করে। আবার কোন কোন দেশের আইনসভা সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে গণপরিষদের (Constituent Assembly) দায়িত্ব পালন করে। স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৭২ সালে বাংলাদেশে যে সংবিধান প্রণীত হয়েছিল তা গণপরিষদ কর্তৃক প্রণীত হয়। পাশাপাশি আইনসভা সংবিধানের যে কোন ধারা বা অনুচ্ছেদ পরিবর্তন কিংবা সংশোধন করতে পারে।

৩। **বিচার সংক্রান্ত ঃ** অনেক সময় আইন বিভাগ বিচার সংক্রান্ত কার্যাবলিও সম্পাদন করে। আইনসভা এর সদস্যদের আচার-আচরণের বিচার, আইনসভা কর্তৃক নির্বাচিত উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আনীত গুরুতর অভিযোগের বিচার, নির্বাচন সংক্রান্ত বিরোধের বিচার ইত্যাদি আইনসভার বিচার সংক্রান্ত কার্যাবলির অন্তর্গত। উদাহরণস্বরূপ, গুরুতর কোন অভিযোগ প্রমাণিত হলে, নির্দিষ্ট কার্যকাল শেষ হবার আগেই অভিশংসনের (Impeachment) মাধ্যমে মার্কিন রাষ্ট্রপতিকে অপসারিত করতে পারে সে দেশের আইনসভা। আবার ব্রিটেনে ২০০৯ সালে সুপ্রিম কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্ব পর্যন্ত, শত-শত বছর ধরে পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ লর্ড সভা সে দেশের সর্বোচ্চ আপিল আদালত হিসেবে কাজ করে।

৪। **শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ ঃ** আইনসভার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করা। আইনসভার এরূপ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে শাসন বিভাগের স্বেচ্ছাচারিতা রোধ করা সম্ভব হয়। তবে শাসনব্যবস্থার প্রকৃতি অনুসারে বিভিন্ন দেশে এরূপ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে মাত্রাগত পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

৫। **অর্থ-সংক্রান্ত ঃ** গণতন্ত্রে সরকারি অর্থ যেহেতু জনগণের তাই এ অর্থের যাতে অপচয় না হয় সেজন্য অর্থ সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপারে গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হয়। আইন বিভাগ বিগত বছরের সরকারি আয়-ব্যয়ের পর্যালোচনা, পরবর্তী বছরের জন্য ব্যয় বরাদ্দকরণের মত কাজের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে কার্যকর করে তোলে। আইনসভার অনুমতি ছাড়া নতুন কর (Tax) ধার্য কিংবা পুরাতন কর ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস করা যায় না।

৬। **শাসন সংক্রান্ত ঃ** আইনসভাকে শাসন সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজও সম্পাদন করতে হয়। সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় এমনকি রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থায়ও আইনসভা বিভিন্ন কমিটির মাধ্যমে শাসন সংক্রান্ত কার্যসম্পাদন করে। আইনসভা অনেক সময় উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী নিয়োগ দান করে। সন্ধি বা চুক্তি অনুমোদন করা, যুদ্ধ ঘোষণা করা প্রভৃতি আইনসভার শাসন সংক্রান্ত কার্য।

৭। **নির্বাচন সংক্রান্ত ঃ** আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আইনসভাকে নির্বাচন সংক্রান্ত কতকগুলো কাজ সম্পাদন করতে হয়। বাংলাদেশের আইনসভার সদস্যদের ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। সুইজারল্যান্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ (Federal Council)-এর সদস্যদের নির্বাচিত করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে কোনও প্রার্থী নির্বাচক সংস্থার (Electoral College) সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন লাভ করতে না পারলে, প্রাপ্ত ভোটের ভিত্তিতে প্রথম তিনজন প্রার্থীর মধ্যে যে কোন একজনকে প্রতিনিধি সভা (House of Representatives) রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করতে পারে। ভারতে রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে আইনসভা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৮। **সংযোগসাধন সংক্রান্ত ঃ** দেশের বিভিন্ন এলাকার প্রতিনিধিরা নিজ-নিজ অঞ্চলের জনগণের অভাব-অভিযোগ ও সমস্যাবলি সম্পর্কে আইনসভায় আলোচনা করেন। এসব আলোচনার ভিত্তিতে সরকার প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

উপরোক্ত কার্যাবলি সম্পন্ন করা ছাড়াও, আইনসভা নানা ধরনের তদন্ত, বিচারকদের পদচ্যুতি, সরকারের গঠনমূলক সমালোচনাসহ নানাবিধ দায়িত্ব পালন করে।

(খ) পরোক্ষ কার্যাবলি ঃ আইনসভার পরোক্ষ কার্যাবলিসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১। **রাজনৈতিক বৈধকরণ ঃ** আইনসভা সব ধরনের সরকারের প্রণীত আদেশ, বিধিমালা বা নীতিসমূহকে বৈধতার ছাড়পত্র দিয়ে থাকে। এমনকি চরম কর্তৃত্ববাদী সর্বাত্মক শাসন ব্যবস্থায়ও আইনসভা সরকারের কার্যাবলি বৈধ করার একমাত্র মাধ্যম।

২। **রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ঃ** আইনসভার নির্বাচন সাধারণ জনগণকে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের কাজে উদ্বুদ্ধকরণের প্রধানতম মাধ্যম। এ নির্বাচন নির্বাচকমন্ডলী ও প্রার্থীদের মধ্যে যোগাযোগের পথ তৈরি হয় এবং শাসনকার্যে জনগণের অংশগ্রহণে উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি করে।

৩। **রাজনৈতিক মতৈক্য সৃষ্টি ঃ** আইনসভার বিতর্ক ও আলাপ-আলোচনা জাতীয় মতৈক্য সৃষ্টি এবং বিরোধ মীমাংসার ফলপ্রসূ মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। মতবিরোধের বিষয়গুলো নিয়ে আইনসভাতে খোলামেলা আলোচনার মধ্য দিয়ে পরিস্থিতির উত্তরণ ঘটতে পারে।

৪। **বিরোধ দূরীকরণ ঃ** আইনসভা রাজনৈতিক ব্যবস্থায় তীব্র মতাদর্শগত বিরোধ দূরীকরণে ব্যাপক মতৈক্য প্রতিষ্ঠা করতে না পারলেও, জাতীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পারস্পরিক বিরোধ দূর করতে পারে।

৫। **রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ সংক্রান্ত ঃ** গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আইনসভার সদস্যগণ বিভিন্ন বিষয়ে মতামত প্রদান করেন। অনেক সময় তারা ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে একই বিষয় নিয়ে আলোচনা, বিতর্ক ইত্যাদি করেন। সংবাদপত্র, বেতার, টেলিভিশন ইত্যাদির মাধ্যমে সেসব আলোচনা প্রচারিত হওয়ার ফলে জনগণের রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি পায়। জনগণ সরকারি ক্রিয়াকলাপের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখতে পারে।

সার্বিক বিবেচনা থেকে একথা বলা যায় যে, সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে প্রত্যেকটিই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হলেও, আইন বিভাগ এমন কতগুলো দায়িত্ব পালন করে যেগুলো গুরুত্বের বিচারে অন্য দুই বিভাগের তুলনায় এগিয়ে থাকে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	আইন সভার প্রধান প্রধান কার্যাবলি উল্লেখ করুন।

সার-সংক্ষেপ

সরকারের যে বিভাগ আইন প্রণয়ন, পরিবর্তন ও সংশোধন করে তাকে আইন বিভাগ বলে। আইনসভা এক-কক্ষ বিশিষ্ট ও দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট হতে পারে। দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভায় দুটি কক্ষ– নিম্নকক্ষ ও উচ্চকক্ষ নিয়ে গঠিত হয়। নিম্নকক্ষকে বলা হয় জনপ্রতিনিধিত্ব কক্ষ। উচ্চকক্ষকে বলা হয় দ্বিতীয় কক্ষ। দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভায় নিম্নকক্ষের সদস্যগণ প্রত্যক্ষভোটে নির্বাচিত হয়। আইনসভা আইন প্রণয়ন, শাসন সংক্রান্ত, বিচার সংক্রান্ত, অর্থ-সংক্রান্ত, নির্বাচনসহ বহুবিধ কার্য সম্পাদন করে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। "সরকারের যে সকল বিভাগের মাধ্যমে রাষ্ট্রের ইচ্ছা প্রকাশিত ও কার্যকরী হয় তন্মধ্যে নি:সন্দেহে আইন বিভাগের স্থান সর্বোচ্চ"– মন্তব্যটি কে করেছেন?

(ক) জে ডব্লিউ গার্নার (খ) মিশেল ফুঁকো
(গ) ওয়ালটার বেইজট (ঘ) আন্তোনিও গ্রামসি

২। "British Parliament is the mother of all Parliaments" – কে বলেছেন?

(ক) ওয়ালটার বেইজট (খ) অধ্যাপক মুনরো
(গ) আর জি গেটেল (ঘ) জে ডব্লিউ গার্নার

৩। আইনসভার ক্ষমতা ও কার্যাবলিকে মোটামুটি কয়ভাবে ভাগ করা যায়?

(ক) ২ (খ) ৩
(গ) ৪ (ঘ) ৫

৪। বাংলাদেশের সংবিধান প্রণীত হয় কত সালে?

(ক) ১৯৭০ (খ) ১৯৭১
(গ) ১৯৭২ (ঘ) ১৯৭৩

৫। ব্রিটেনের পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষের নাম কি?

(ক) সিনেট (খ) লর্ডসভা
(গ) কমন্সসভা (ঘ) প্রতিনিধিসভা

পাঠ-৯.৩ এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা (Unicameral Legislature)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- আইনসভার গঠন সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে পারবেন।
- এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার সুবিধাগুলো জানতে পারবেন।
- এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার অসুবিধাগুলো বুঝবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	নির্বাচন পদ্ধতি, উচ্চ কক্ষ, নিম্ন কক্ষ, জাতীয় স্বার্থ, ক্ষুদ্র রাষ্ট্র, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন।

আইনসভার গঠন

আইন প্রণয়নের সর্বোচ্চ সংস্থা হচ্ছে আইনসভা। আইন সভা কর্তৃক প্রণীত আইন দ্বারা দেশ শাসিত হয়। পৃথিবীর সব দেশের আইনসভার গঠন এক ধরনের নয়। সরকারের গঠন কাঠামো, সদস্য সংখ্যা, সদস্যপদের যোগ্যতা-অযোগ্যতা, নির্বাচন পদ্ধতি, কার্যকালের মেয়াদ প্রভৃতি বিষয়ে বিভিন্ন দেশের আইনসভার সংগঠনের মধ্যে বিভিন্ন পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। তবে গঠন কাঠামোর দিক থেকে বর্তমান সময়ের আইনসভাগুলো প্রধানত দুই প্রকার। যথা– এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা ও দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা। একটি কক্ষ নিয়ে গঠিত আইনসভাকে এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা বলে। এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গঠিত হয়। উদাহরনস্বরূপ, বাংলাদেশে এককক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা চালু আছে। দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা দুটি কক্ষ, অর্থাৎ নিম্নকক্ষ এবং উচ্চকক্ষ নিয়ে গঠিত হয়। জনগনের দ্বারা নির্বাচিত কক্ষটি নিম্নকক্ষ (Lower House) বা জনপ্রিয় কক্ষ (Popular House) নামে পরিচিত। উচ্চকক্ষ (Upper House) কে দ্বিতীয় কক্ষ (Second Chamber) বলা হয়। নিম্নকক্ষের সদস্যরা জনগণের ভোটে নির্বাচিত এবং ক্ষমতার দিক থেকে এই কক্ষটি অধিক শক্তিশালী। পক্ষান্তরে, উচ্চকক্ষের সদস্যরা বেশির ভাগ দেশে মনোনীত এবং এই কক্ষের ভূমিকা মূলত উপদেশমূলক। তবে এর কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, যুক্তরাষ্ট্র আইনসভার উচ্চকক্ষ, অর্থাৎ সিনেট সদস্যরা ভোটে নির্বাচিত এবং নিম্নকক্ষ অর্থাৎ হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভের তুলনায় এর ক্ষমতা অনেক ক্ষেত্রে বেশি বলে মনে করা হয়।

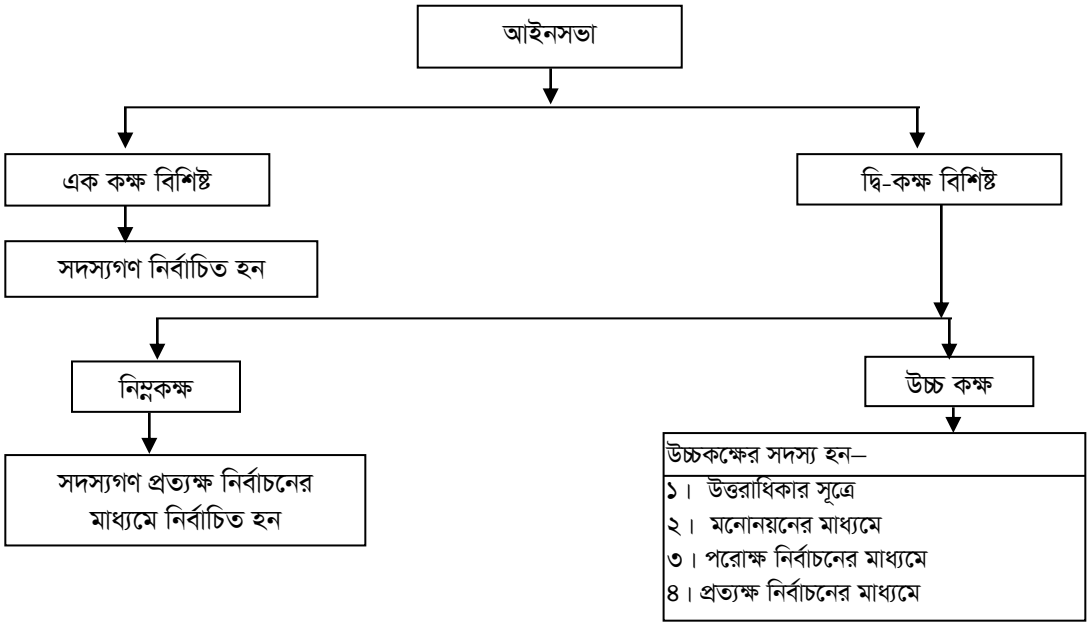

চিত্র ঃ আইনসভার গঠন

এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা

সরকারের যে তিনটি বিভাগ রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম বিভাগ হচ্ছে আইন বিভাগ বা আইনসভা। সাংগঠনিক দিক থেকে আইনসভাকে দু'টি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা– এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা ও দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা। যেসব আইনসভায় জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত একটি মাত্র কক্ষ বা পরিষদ থাকে সেগুলোকে এক-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা বলে। সাধারণ নির্বাচন বা সার্বজনীন প্রাপ্ত বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে এক-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বাংলাদেশ, চীন, কিউবা, সাইপ্রাস, ডেনমার্ক, মিশর, ফিনল্যান্ড, গ্রীস, ইন্দোনেশিয়া, ইসরাইল, নেপাল, নিউজিল্যান্ড প্রভৃতি দেশের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। সাধারণত এককেন্দ্রিক সরকার (Unitary government) ব্যবস্থা প্রচলিত থাকা দেশগুলোতে এক কক্ষবিশিষ্ট আইন সভা দেখা যায়।

এক-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার সুবিধাসমূহ

রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের অনেকেই এককক্ষ আইনসভার পক্ষে যুক্তি তুলে ধরেছেন। জনগণের সরাসরি সম্মতি, দ্রুততা, কর্মপদ্ধতিতে কম জটিলতাসহ নানাবিধ কারণে এককক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা অনেকের কাছে বেশি আকর্ষণীয়। নিম্নে এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার কিছু সুবিধা উল্লেখ করা হলঃ

১। **গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ঃ** এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গঠিত হয়। এখানে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়। এই কক্ষের মধ্য দিয়েই জনগণ পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রের শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করে। নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক দল সরকার গঠন করে এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ দল বিরোধীদলে থেকে সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা করে।

২। **সহজ-সরল পদ্ধতি ঃ** এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভাকে বলা যায় একটি সহজ-সরল পদ্ধতি। এটি জনগণের কাছে সহজে বোধগম্য। এর গঠন পদ্ধতিও সরল। এখানে একটি মাত্র কক্ষ থাকবে এবং সে কক্ষের সদস্যরা জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবে।

৩। **সহজ নির্বাচন পদ্ধতি ঃ** এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার নির্বাচন অনেকটা সহজ পদ্ধতিতে হয়ে থাকে। এখানে একই সময়ে সারাদেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে জটিল কোন হিসাব নিকাশ নেই। সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন প্রাপ্ত রাজনৈতিক দল সরকার গঠন করবে।

৪। **দ্রুত সিদ্ধান্ত ঃ** এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভায় রাষ্ট্রের যে কোন জরুরি প্রয়োজনে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। এখানে একটি কক্ষের অনুমতি হলেই যে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব।

৫। **অধিক দায়িত্বশীল ঃ** এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা অধিক দায়িত্বশীল। জনপ্রতিনিধিরা সরাসরি নির্বাচিত বিধায় জনগণের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলো পূরণে তাদেরকে সচেষ্ট থাকতে হয়। অন্য কোন কক্ষের উপর দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়ার সুযোগ এখানে নেই। এ জন্য এক-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার সদস্যরা অধিক দায়িত্বশীল ও কর্তব্যপরায়ণ হয়ে থাকে।

৬। **আইন প্রণয়নে সুবিধা ঃ** এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভায় জনগণের চাহিদামত সময়োপযোগী আইন দ্রুত প্রণয়ন করা যায়। যেহেতু আইন পাশ করার জন্য অন্য কোন কক্ষের উপর নির্ভরশীল নয় সেজন্য যে কোন জরুরি প্রয়োজনে জনগণের কল্যাণার্থে দ্রুত আইন প্রণয়ন করা সম্ভব।

পরিশেষে বলা যায় যে, পৃথিবীর অনেক দেশেই বর্তমানে এককক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা চালু আছে। দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার তুলনায় কম ব্যয়, কম সময়ক্ষেপণ ও সরাসরি নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিত্বের মত বৈশিষ্ট্যের কারণে এক কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা সারা বিশ্বে বেশ জনপ্রিয়।

এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার অসুবিধা

পৃথিবীর অনেক রাষ্ট্রে এক-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা প্রচলিত থাকলেও এর কিছু ত্রুটি বা অসুবিধা রয়েছে যার ফলে এর জনপ্রিয়তাকে ম্লান করেছে। নিম্নে এক-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার বিপক্ষে যুক্তিসমূহ তুলে ধরা হল ঃ

১। **অর্থবহ আলোচনার সুযোগ কম ঃ** এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভায় কোন একটি প্রসঙ্গে বিস্তারিত ও অর্থবহ আলোচনার সুযোগ কিছুটা কম থাকে। বিশেষ করে কোন একটি আইন সভাতে কোন একটি দলের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলে, বিরোধী দলীয় মতামতগুলো সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠতার চাপে অনেকটাই ম্লান হয়ে যায়। বিশেষত, অপরিণত গণতন্ত্রের দেশগুলোতে এ সমস্যা প্রকট হয়। এ ধরনের পরিস্থিতি অনেক সময়ই দলীয় বিবেচনায় জাতীয় সিদ্ধান্ত গৃহীত হতে দেখা যায়।

২। **মেধাবী ব্যক্তির শাসন থেকে বঞ্চিত ঃ** জনপ্রিয়তা হচ্ছে এক কক্ষ আইনসভার সদস্য হবার প্রধান শর্ত। এক্ষেত্রে মেধা ও দক্ষতার মত বিষয়গুলি প্রধান বিবেচ্য হয় না। এমতাবস্থায়, আইনসভাতে একটি মাত্র কক্ষ থাকলে, সেখানে নির্বাচনে ব্যর্থ বা অনিচ্ছুক অথচ দক্ষ মেধাবী ব্যক্তিদের সেবা থেকে রাষ্ট্র বঞ্চিত হয়।

৩। **জাতীয় স্বার্থ বিরোধী আইন ঃ** এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভাতে বিশেষ কোন পরিস্থিতিতে জাতীয় স্বার্থ বিরোধী আইন প্রণয়নের আশঙ্কা থাকে। দলীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে জাতীয় স্বার্থকে বঞ্চিত করার ঝুঁকি এক-কক্ষ বিশিষ্ট আইন সভাতে থাকে। এছাড়া সাময়িক আবেগ-অনুভূতি কিংবা শক্তিশালী কোন স্বার্থ গোষ্ঠীর চাপে জাতীয় স্বার্থ বিরোধী আইন প্রণীত হবার আশঙ্কা থাকে।

৪। **অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতা ঃ** এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার জনপ্রতিনিধিরা অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতার অধিকারী হন। আইন প্রণয়নে অন্য কোন কর্তৃপক্ষের কাছে তাদের দায়বদ্ধ থাকতে হয় না। এছাড়াও পার্লামেন্টারি ব্যবস্থাতে আইন বিভাগ শাসন বিভাগের সাথে অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকে।

৫। **যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনে অনুপযোগী ঃ** এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থার জন্য উপযোগী নয়। বিভিন্ন রাজ্য বা প্রদেশের স্বার্থ এক কক্ষ ব্যবস্থাতে সমানভাবে রক্ষিত হয় না।

৬। **পুনর্বিচেনার অভাব ঃ** এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভায় কোন আইন প্রণীত হলে তা পুনর্বিবেচনার সুযোগ থাকে না। কিন্তু দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভায় নিম্নকক্ষে আইন প্রণীত হলে উচ্চকক্ষে সেই আইন পুনর্বিবেচনার সুযোগ থাকে। এক কক্ষ ব্যবস্থাতে পুনর্বিবেচনার সুযোগ না থাকায়, সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের স্বার্থে আইন প্রণয়নের আশঙ্কা থাকে।

পরিশেষে বলা যায় যে, নানা-ত্রুটি বিচ্যুতি থাকলেও, জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবার বিধান থাকার কারণে

এক কক্ষ ব্যবস্থার মধ্যেই গণতন্ত্রের প্রধান শর্তটি সংরক্ষিত হয়।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	এক কক্ষ বিশিষ্ট আইন সভার সুবিধাগুলো কি কি?

সার-সংক্ষেপ

সরকারের যে তিনটি বিভাগ রয়েছে তার মধ্যে আইনসভা হচ্ছে অন্যতম। গঠন অনুযায়ী আইন সভা এক-কক্ষ ও দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট হতে পারে। যেসব আইনসভায় জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত একটি মাত্র কক্ষ থাকে তাকে এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা বলে। সাধারণত নির্বাচন ও সার্বজনীন প্রাপ্ত বয়স্ক ভোটারদের মাধ্যমে এক-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা গঠিত হয়। পৃথিবীর অনেক দেশে এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা রয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম হল– বাংলাদেশ, চীন, কিউবা, ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, ইসরাইল, নিউজিল্যান্ড ও নেপাল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। আইন প্রণয়নের সর্বোচ্চ সংস্থার নাম কি?
(ক) সুপ্রীম কোর্ট (খ) শাসন বিভাগ
(গ) আইন বিভাগ (ঘ) রাজনৈতিক দল

২। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষের নাম কি?
(ক) লর্ড সভা (খ) কমন্স সভা
(গ) সিনেট (ঘ) প্রতিনিধি সভা

৩। আইনসভাকে কয়টি ভাগে ভাগ করা যায়?
(ক) ২টি (খ) ৪টি
(গ) ৬টি (ঘ) ৮টি

৪। উচ্চকক্ষের সদস্য হন–
(i) উত্তরাধিকার সূত্রে;
(ii) মনোনয়নের মাধ্যমে
(iii) কোন কোন দেশে জনগণের ভোটে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) i ও ii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৫। এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা রয়েছে–
(i) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে
(ii) যুক্তরাজ্যে
(iii) ডেনমার্কে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii (গ) i ও ii (ঘ) iii

পাঠ-৯.৪ দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা (Bicameral Legislature)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- উচ্চকক্ষের গঠন বর্ণনা করতে পারবেন।
- দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার সুবিধাগুলো বলতে পারবেন।
- দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার অসুবিধাগুলো বুঝতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	সিনেট, প্রতিনিধিসভা, রাজনৈতিক শিক্ষা, জাতীয় ঐতিহ্য, শ্রেণিস্বার্থ, প্রগতি।

দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা

দুটি কক্ষ বা পরিষদ নিয়ে যখন আইনসভা গঠিত হয় তখন তাকে দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা বলে। এরূপ আইনসভার প্রথম কক্ষকে 'নিম্নকক্ষ' এবং দ্বিতীয় কক্ষকে 'উচ্চকক্ষ' বলে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, কানাডা, ফ্রান্স, ভারতসহ পৃথিবীর অনেক রাষ্ট্রে দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা রয়েছে।

নিম্ন কক্ষের গঠন

আইনসভার নিম্ন কক্ষ কত জন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে তার কোন নির্ধারিত সংখ্যা নেই। প্রত্যেক রাষ্ট্রের নিম্ন কক্ষের সদস্য সংখ্যার তারতম্য রয়েছে বা থাকতে পারে। যেমন- যুক্তরাষ্ট্রের নিম্ন কক্ষ তথা প্রতিনিধিসভার সদস্য সংখ্যা ৪৩৫, ব্রিটেনের কমন্সসভার সদস্যসংখ্যা ৬৫২। তবে পৃথিবীর প্রতিটি রাষ্ট্রের নিম্ন কক্ষই প্রতিনিধিত্বমূলক। সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নিম্ন কক্ষ গঠিত হয়। জনপ্রতিনিধিত্বমূলক হওয়ার কারণে সাধারনত নিম্ন কক্ষ উচ্চ কক্ষ অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী।

নিম্নকক্ষের সদস্যসংখ্যা ও কার্যকাল রাষ্ট্রভেদে ভিন্ন হতে পারে। যেমন- অস্ট্রেলিয়ার পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ অর্থাৎ হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভসের কার্যকাল ৩ বছর। পক্ষান্তরে, ব্রিটেনের কমন্স সভার কার্যকাল ৫ বছর।

উচ্চ কক্ষের গঠন

পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের আইনসভার উচ্চকক্ষের কত জন সদস্য হবে তার কোন নিয়ম নেই। যেমন, মার্কিন সিনেটের সদস্য সংখ্যা ১০০ জন কিন্তু ব্রিটেনের লর্ডসভার সদস্য সংখ্যা ৮১৫ জন। আবার উচ্চ কক্ষসমূহের কার্যকালও এক নয়। মার্কিন সিনেটের কার্যকাল ছয় বছর। প্রতি দুই বছর পর এর এক তৃতীয়াংশ সদস্য অবসরে যান। অন্যদিকে, ব্রিটেনের লর্ডসভার সঠিক কোন কার্যকাল নেই। লর্ডসভার সদস্যরা আজীবনের জন্য সদস্যপদ লাভ করেন। রাষ্ট্রভেদে উচ্চকক্ষের গঠনপ্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন ধরনের হয়। যেমন-

(i) কোন কোন রাষ্ট্রে ধর্মসূত্রে উচ্চকক্ষের সদস্যপদ দেয়া হয়। যেমন, ব্রিটেনের লর্ডসভাতে চার্চ অব ইংল্যান্ডের প্রতিনিধি হিসেবে বিশপ পদবিধারী ২৬ জন ধর্মগুরু স্থান পেয়ে থাকেন।

(ii) কোন কোন রাষ্ট্রে আইনসভার উচ্চকক্ষ প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত হয়। যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৫০টি অঙ্গরাজ্য থেকে ২ জন করে মোট ১০০ জন সিনেট সদস্য নির্বাচিত হন।

(iii) কোন কোন রাষ্ট্রে আইনসভার উচ্চকক্ষ মনোনীত সদস্য কর্তৃক গঠিত হয়। যেমন, কানাডার সিনেট।

(iv) কোন কোন রাষ্ট্রে আইনসভার উচ্চকক্ষ পরোক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত হয়। যেমন, ফ্রান্সের সিনেট।

দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার সুবিধা

পৃথিবীর বহু রাষ্ট্রে দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করে আয়তনে বৃহৎ রাষ্ট্রে দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার জনপ্রিয়তা বেশি লক্ষ্য করা যায়। নিম্নে দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার সুবিধাসমূহ তুলে ধরা হল-

১। সুচিন্তিত আইন প্রণয়ন: দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভায় যথেষ্ট বিচার বিবেচনার সাথে জাতীয় স্বার্থের অনুকূল আইন প্রণীত হয়। এক-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভায় কখনো কখনো আকস্মিক আবেগের বশে অবিবেচনাপ্রসূত হঠকারী ও জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী আইন পাশ হয়ে যাবার আশঙ্কা থাকে। এ ব্যবস্থায় পুনর্বিবেচনার কোন সুযোগ থাকে না। দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভায় এরূপ আশঙ্কা থেকে মুক্ত। দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভায় প্রতিটি বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার-বিশ্লেষণের সুযোগ পাওয়া যায়। এতে বিলটির কোন দোষ-ত্রুটি থাকলে তা ধরা পড়ে এবং সংশোধন করা হয়।

২। স্বৈরাচার রোধ: দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভায় স্বৈরাচার রোধ হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে লর্ড অ্যাকটন (Lord Acton) বলেন, "দ্বিতীয় কক্ষ হল স্বাধীনতার একটি অপরিহার্য নিরাপত্তা, একটিমাত্র কক্ষ নিয়ে আইনসভা গঠিত হলে তা স্বৈরাচারী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।" দ্বিতীয় কক্ষের উপস্থিতি এককক্ষের স্বৈরাচার রোধ করতে পারে।

৩। নিম্ন কক্ষের সহায়ক: বর্তমান জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে আইনসভার কাজের চাপ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। একটিমাত্র সভার পক্ষে এ সকল কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা কঠিন। আইনসভার দু'টি কক্ষ বা পরিষদ থাকলে, গুরুত্বপূর্ণ ও বিতর্কমূলক বিলগুলো বিচার বিবেচনার জন্য নিম্ন কক্ষ প্রয়োজনীয় সময় পেতে পারে। অধ্যাপক অ্যালেন আর বল (Alan R Ball) এ প্রসঙ্গে বলেন- "Certainly the second chamber can assist the lower house with the legislative programme initiating and amending bills"

৪। বিদগ্ধ ব্যক্তিদের মনোনয়ন: প্রত্যেক দেশেই এমন অনেক জ্ঞানী-গুণী ও বিদগ্ধ ব্যক্তি থাকেন যারা প্রত্যক্ষ নির্বাচনের বিড়ম্বনা ও জটিলতার মধ্যে জড়িয়ে পড়তে রাজি থাকেন না। উচ্চকক্ষে পরোক্ষ নির্বাচন বা মনোনয়নের দ্বারা দেশের এইসব পন্ডিত ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের আইনসভায় স্থান করে দেওয়া যায়। এতে দেশ শ্রেষ্ঠ জ্ঞান-বুদ্ধির মানুষদের সেবা লাভ করতে পারে। এর ফলে আইনসভায় জনমতের উন্নততর প্রতিফলন ঘটে।

৫। জনমতের সুষ্ঠু প্রতিফলন: দ্বি-কক্ষ ব্যবস্থায় জনমতের সুষ্ঠু প্রতিফলন ঘটে। আইনসভার দুটি কক্ষ ভিন্ন সময়ে নির্বাচিত হলে প্রবহমান জনমত যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়। দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট ব্যবস্থায় পরিবর্তনশীল জনমতের গতি-প্রকৃতি অনুসন্ধান ও পরিমাপ করা যায়।

৬। রাজনৈতিক শিক্ষা বিস্তার: উচ্চকক্ষ জনগনের রাজনৈতিক শিক্ষা বিস্তারে সাহায্য করে। উচ্চকক্ষে প্রতিটি বিলকে পুনরায় বিচার বিশ্লেষণ করে দেখা হয়। আইনসভায় বিভিন্ন আলোচনা ও বিতর্ক বেতার, টেলিভিশন, সংবাদপত্র এবং সামাজিক যোগাযোগের বিভিন্ন মাধ্যমে জনগনের কাছে পৌঁছায়। এতে তাদের রাজনৈতিক শিক্ষার প্রসার ঘটে।

৭। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় উপযোগী: দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় অপরিহার্য বিবেচনা করা হয়। আইনসভা দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট হলে, নিম্নকক্ষে জাতীয় পর্যায়ের প্রতিনিধিত্বের পাশাপাশি উচ্চকক্ষে সকল প্রদেশ বা রাজ্যের প্রতিনিধি প্রেরণ করা সম্ভব হয়। এতে করে আকার-আয়তন বা জনসংখ্যার কম-বেশিজনিত কারণে কোন রাজ্য বা প্রদেশ বাড়তি সুবিধা বা অসুবিধা ভোগ করে না।

৮। জাতীয় ঐতিহ্য সংরক্ষণ: বহুজাতি এবং আয়তনে বৃহৎ রাষ্ট্রের জন্য দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা উপযোগী। দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট ব্যবস্থাতে একটি রাষ্ট্রে বাসকারী সকল ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্যের প্রতিনিধি আইন সভাতে স্থান পাবার সম্ভাবনা থাকে। সংখ্যায় কম হলেও, মনোনয়ন পদ্ধতি ব্যবহার করে আইনসভার উচ্চকক্ষে এদের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা যায়।

পরিশেষে বলা যায়, বৃহদায়ন বহুজাতি গোষ্ঠীর মানুষ বাসকারী একটি রাষ্ট্রের জন্য দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার বিকল্প নেই। এর মাধ্যমে আইনসভার কাজের চাপ প্রশমন এবং জাতীয় স্বার্থ রক্ষিত হয়। জে এ আর ম্যারিয়ট (J.A.R Marriot) বলেন, "Experience has been in favour of two chambers, and it is not wise to disregard the lessons of history".

দ্বি কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার অসুবিধা

রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার নানাবিধ অসুবিধা নানা সময়ে চিহ্নিত করেছেন। নিম্নে দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার কিছু অসুবিধা উল্লেখ করা হল-

১। অনাবশ্যক ও ক্ষতিকর: অনেকের মতে, দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা অনাবশ্যক এবং ক্ষতিকর। এ প্রসঙ্গে আবে সিঁয়ে মনে করেন, দ্বিতীয় কক্ষ যদি প্রথম কক্ষকে অনুসরণ করে তবে এটা অনাবশ্যক। আর যদি তা প্রথম কক্ষকে অনুসরণ না করে তবে তা অনিষ্টকর।

২। অনিয়ন্ত্রিত: নিম্নকক্ষের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে উচ্চকক্ষের ভূমিকা পালন প্রসঙ্গটিকে অনেকে অতিরঞ্জিত মনে করেন। বিশেষ করে বর্তমান যুগে জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত নিম্নকক্ষের ইচ্ছাকে উচ্চ কক্ষ আদৌ কতটুকু প্রতিরোধ করতে পারে সে ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। এছাড়া নিম্নকক্ষের জনপ্রতিনিধিদের উপর উচ্চকক্ষের মনোনীত সদস্যগণ নিয়ন্ত্রণ আরোপের বিধানকেও অনেকে গণতন্ত্র সম্মত নয় বলে মনে করেন।

৩। অগণতান্ত্রিক গঠন পদ্ধতি: অনেক দেশের দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার গঠনপদ্ধতি অগণতান্ত্রিক। গণতন্ত্রের আদর্শ অনুসারে আইনসভা জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হওয়াটাই সঙ্গত। কিন্তু অনেক দেশেই দ্বিতীয় কক্ষ সাধারণত বিত্তবান, মনোনীত ও রক্ষণশীল ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত হয়।

৪। দায়িত্ব বিভক্ত: দু'টি পরিষদ নিয়ে গঠিত হলে আইনসভার দায়িত্ব বিভক্ত হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় আইন প্রণয়নের সঠিক দায়িত্ব নির্ধারণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইন সভাতে, দুটি কক্ষ অর্থাৎ হাউজ অব রিপ্রেজেনটেটিভ ও সিনেটের আইন পাস করাকে কেন্দ্র করে কখনো কখনো বিরোধ দেখা দেয়।

৫। শ্রেণিস্বার্থ প্রাধান্য: দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভায় কোন কোন দেশে উচ্চ শ্রেণির স্বার্থ প্রাধান্য পেয়ে যেতে পারে। ইতিহাসের একটি পর্ব পর্যন্ত উচ্চকক্ষে জনগণের সামাগ্রিক কল্যাণের পরিবর্তে উচ্চ শ্রেণির স্বার্থরক্ষার আগ্রহই বেশি প্রকাশ পেতো। এজন্য দ্বিতীয় কক্ষকে অনেকে প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণিস্বার্থ সংরক্ষণের দুর্গ হিসেবে সমালোচনা করতেন।

৬। সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষা: নানাবিধ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যও দ্বিতীয় পরিষদ অনাবশ্যক। কারণ সংবিধানেই বিভিন্ন উপায়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা যায়। সুতরাং সদিচ্ছা থাকলে এক কক্ষ বিশিষ্ট আইন সভাতেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষা করা যায়।

৭। আইন প্রণয়নে বিলম্ব: দ্বিতীয় কক্ষ আইন প্রণয়নকে বিলম্বিত করে। দু'টি কক্ষের মধ্যে বিরোধ বাধলে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে অচলাবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। এর ফলে প্রশাসন ব্যবস্থায় ধীরগতি চলে আসে এবং রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম বিঘ্নিত হয়। জরুরী অবস্থায় আইন প্রণয়ন বিলম্বিত হলে তা থেকে রাষ্ট্রীয় সংকটের সৃষ্টি হতে পারে।

৮। ব্যয়বহুল এবং অপচয়মূলক: দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা ব্যয়বহুল এবং অপচয়মূলক। দু'টি পরিষদ থাকলে অতিরিক্ত সরকারি অর্থ ব্যয় হবে একথা বলাই বাহুল্য। আর দ্বিতীয় কক্ষ যদি সর্বজনের পরিবর্তে উচ্চশ্রেণি বা কেবলমাত্র সরকারি দলের স্বার্থ রক্ষা করে তবে এই ব্যয় অপচয় ব্যতীত কিছুই নয়।

পরিশেষে এ কথা বলা যায় যে, দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইন সভা প্রদেশ বা রাজ্যের স্বার্থ সংরক্ষণের দিক থেকে ফলপ্রসূ। তবে, দ্বিকক্ষ আইন সভার সদস্য বাছাই পদ্ধতিতে এখনো অবধি কোন কোন দেশে অগণতান্ত্রিক বা প্রশ্ন সাপেক্ষ নিয়ম বলবৎ আছে। এছাড়া, গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতি উপস্থিত না থাকলে, উচ্চকক্ষ দ্বারা নিম্নকক্ষকে নিয়ন্ত্রণে রাখার বিষয়টিও অসম্ভব।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি**) /শিক্ষার্থীর কাজ**	দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইন সভার অসুবিধাগুলো উল্লেখ করুন।

সার-সংক্ষেপ

আইনসভা দুই ধরনের হতে পারে। যথা, এককক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা ও দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইন সভা। দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা উচ্চকক্ষ ও নিম্নকক্ষের সমন্বয়ে গঠিত হয়। নিম্নকক্ষের সদস্যগণ জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়। এ জন্য নিম্ন কক্ষকে প্রতিনিধিত্ব কক্ষ বলা হয়। দ্বিতীয় কক্ষের মনোনয়ন ও নির্বাচন উভয় পদ্ধতিই অনুসরণ করা হয়। দুই ধরনের আইন সভার ক্ষেত্রেই একাধারে কতগুলো সুবিধা ও অসুবিধা পরিলক্ষিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। অস্ট্রেলিয়ার পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষের কার্যকাল কত বছর?
ক) ৩ বছর খ) ৪ বছর
গ) ৫ বছর ঘ) ৬ বছর

২। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কার্যকাল কত বছর?
ক) ৩ বছর খ) ৪ বছর
গ) ৫ বছর ঘ) ৬ বছর

৩। মার্কিন সিনেটের সদস্য সংখ্যা কত?
ক) ৫০ জন খ) ৭৫ জন
গ) ১০০ জন ঘ) ১২৫ জন

৪। দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা রয়েছে–
i) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ii) বাংলাদেশ iii) নিউজিল্যান্ড
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i খ) ii
গ) iii ঘ) i, ii, iii

৫। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য কয়টি?
ক) ৩০টি খ) ৪০টি
গ) ৫০টি ঘ) ৬০টি

পাঠ-৯.৫ গণতন্ত্রে আইনসভার ভূমিকা
(Role of Legislature in Democracy)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- গণতন্ত্রে আইনসভার ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	ভোট, আইন, নির্বাচন, রাজনৈতিক চেতনা, জনমত।

গণতন্ত্রে আইনসভার ভূমিকা

আইনসভা সরকারের তিনটি অঙ্গের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। বস্তুত: সংবিধান প্রণয়ন কিংবা আইন প্রণয়নের মত দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে বলতে গেলে আইন সভা থেকেই একটি রাষ্ট্রের কার্যক্রম সূচনা হয়। জনগনের ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা আইনসভার সদস্য হন। যার জন্য আইনসভাকে গণতন্ত্রের প্রতীক বলা হয়। গণতন্ত্রের সাফল্য এবং বিকাশে আইনসভার ভূমিকা অসামান্য। নিম্নে গণতন্ত্রে আইনসভার ভূমিকা আলোচনা করা হল:

১। **আইন প্রণয়ন:** গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় আইনসভা মুখ্য ভূমিকা পালন করে। দেশ পরিচালনার সকল বিধি-বিধান ও আইন-কানুন আইনসভা কর্তৃক গৃহীত হয়। স্বাধীন দেশের সংবিধান প্রণয়ন, এবং পরবর্তীতে জাতীয় স্বার্থের সাথে সঙ্গতি রেখে সংবিধান সংশোধন, পরিমার্জন, সংযোজন, বিয়োজন আইনসভাই করে থাকে।

২। **সরকার ও জনগনের মধ্যে সেতুবন্ধন:** গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় আইনসভা সরকার ও জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে। আইনসভার সদস্যরা বিভিন্ন সভা-সমাবেশ কিংবা বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে জনগণের খুব কাছে এসে তাদের বক্তব্য শুনতে পারেন। জনগণের সে বক্তব্য বা দাবি আইনসভার সদস্যরা আইনসভায় উপস্থাপনের মাধ্যমে এ সেতুবন্ধন সৃষ্টি হয় যা গণতন্ত্রে রজন্য কল্যাণকর।

৩। **শাসনকার্যে অংশগ্রহণের সুযোগ:** আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনগণ রাষ্ট্রের শাসনকার্যে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়ে থাকে। শাসনকার্যে অংশগ্রহণের সর্বপ্রধান স্থান হচ্ছে আইনসভা। একজন ব্যক্তি নেতৃত্বের গুনাবলী, মেধা, জনকল্যাণ ও জনসংযোগের বলে, কোন একটি রাজনৈতিক দলের হয়ে কিংবা নির্দলীয়ভাবে নির্বাচনের মাধ্যমে আইন সভাতে স্থান করে নিতে পারেন। আর আইন সভার কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়েই তিনি সর্বোচ্চ মাত্রাতে শাসনকার্যে অংশ নেন।

৪। **নির্বাচন:** বিভিন্ন গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় আইনসভা নির্বাচন সংক্রান্ত কতকগুলো কাজ সম্পাদন করে থাকে। যেমন- সুইজারল্যান্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ এর সদস্যদের নির্বাচিত করে। ভারতে রাষ্ট্রপ্রধান ও উপ-রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনে আইনসভা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৫। **জনমত গঠন:** আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইনসভা জনমত গঠন সংক্রান্ত কাজ করে থাকে। আইনসভার সদস্যরা সংসদে যে বক্তব্য-বিবৃতি প্রদান করেন তা সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়ে বক্তব্যের পক্ষে-বিপক্ষে জনমত গঠিত হয়। এই জনমতের ভিত্তিতে ক্ষমতার পালা বদলের দিক ঠিক হয়।

৬। **রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ:** গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় আইনসভার সদস্যগণ বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্য ও মতামত প্রদান করেন। এগুলো বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে প্রচারিত হলে জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ সাধিত হয়। এর ফলে জনগণ সরকারি কার্যকলাপের উপর সদাসতর্ক দৃষ্টি রাখতে সক্ষম হয়।

৭। **রাজনৈতিক নিয়োগ:** আইনসভা ভবিষ্যতের রাজনৈতিক নেতা ও প্রশিক্ষক নিয়োগে সাহায্য করে। আইনসভার সদস্য হিসেবে অভিজ্ঞতা অর্জনের পর আইন সভার সদস্যদের অনেকেই প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন হতে দেখা যায়।

৮। **রাজনৈতিক অংশগ্রহণ:** গনতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় আইনসভার নির্বাচন জনগণকে রাজনেতিক অংশগ্রহণের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করে। এ ধরনের নির্বাচনের ফলে প্রার্থী ও নির্বাচকমন্ডলীর মধ্যে গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত রাখার মানসিকতা সৃষ্টি হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, আইনসভা প্রতিটি গণতান্ত্রিক দেশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আইন প্রণয়নের কারণে সরকারের অন্য দুই বিভাগ থেকে এ বিভাগের মর্যাদা অধিকতর। আইনসভাকে অনেকে তাই 'জাতীয় মঞ্চ' বলে অভিহিত করেন।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	বাংলাদেশের আইন সভা গণতন্ত্র রক্ষায় কতটুকু সার্থক? যুক্তি দিন।

সার-সংক্ষেপ

আধুনিক গণতন্ত্র প্রতিনিধিত্বমূলক বিধায়, এ শাসন ব্যবস্থায় আইনসভার গুরুত্ব অধিক পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। বস্তুত: আইন সভাতে আইন প্রনয়ণের মধ্য দিয়েই বলতে গেলে একটি রাষ্ট্রের কাজ শুরু হয়। আইন পাস ছাড়াও, আইন সভাতেই যাবতীয় জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক সাপেক্ষে দিক নির্দেশনা ঠিক হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সরকার ও জনগনের মধ্যে সেতু বন্ধন হিসেবে কাজ করে কোন বিভাগ?
ক) শাসন বিভাগ খ) আইন বিভাগ
গ) বিচার বিভাগ ঘ) নির্বাচন কমিশন

২। গণতন্ত্রের প্রতীক বলা হয় কোন সংস্থাকে?
ক) আইনসভা খ) বিচার বিভাগ
গ) শাসন বিভাগ ঘ) নির্বাচকমণ্ডলী

৩। 'জাতীয় মঞ্চ' বলা হয় কোন বিভাগকে?
ক) শাসন বিভাগ খ) বিচার বিভাগ
গ) আইন বিভাগ ঘ) উপরের সবগুলো

পাঠ-৯.৬ আইনসভার ক্ষমতা হ্রাসের কারণ
(Causes of Limiting Power of the Legislature)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- আইনসভার ক্ষমতা হ্রাসের কারণ আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	সার্বভৌমত্ব, অর্পিত ক্ষমতা প্রসূত আইন, সামরিক বাহিনী, বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা, গণ-সংযোগ।

আইনসভার ক্ষমতা হ্রাসের কারণ

আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় শাসন বিভাগের প্রাধান্য বৃদ্ধি এবং এর পাশাপাশি আইনসভার ক্ষমতা হ্রাস একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। একটি সময় পর্যন্ত সংবিধান বিশেষজ্ঞদের আলোচনার প্রধান বিষয় ছিল আইনসভার সার্বভৌমত্ব। সে সময় অধিকাংশ দেশের সাংবিধানিক ব্যবস্থায় আইনসভার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু বর্তমানে অধিকাংশ দেশের শাসন ব্যবস্থাতেই শাসন বিভাগের ক্ষমতার বিস্তার এবং আইনসভার ক্ষমতা ও প্রভাবের অবসান পরিলক্ষিত হচ্ছে।

অধ্যাপক কে সি হোয়ার (Professor. K.C. Wheare) এর মতে "দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় সকল ক্ষেত্রেই আইনসভার ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে"। লর্ড ব্রাইস (Lord Bryec) তাঁর 'Modern Democracies' শীর্ষক গ্রন্থে বিভিন্ন দেশের সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা পর্যালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আইনসভার ক্ষমতা হ্রাসের কারণ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। নিম্নে আইনসভার ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি হ্রাসের সাধারণ কারণ আলোচনা করা হল।

১। **জনকল্যাণমূলক দায়িত্বের সম্প্রসারণ:** বর্তমান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনকল্যাণমূলক কর্মকান্ডের বেশিরভাগ শাসন বিভাগই সম্পাদন করে। সমাজকল্যাণমূলক কাজ-কর্মের বিপুল দায়িত্বের সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখে আইনসভা এ ক্রমবর্ধমান দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারে না। সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় শাসন বিভাগ নীতিনির্ধারণ এবং তা কার্যকর করে। ফলে শাসনবিভাগের সাথে জনসাধারণের ব্যক্তিগত ও দৈনন্দিন জীবনের গভীর সংযোগ স্থাপিত হয়। স্বাভাবিকভাবেই জনগন আইনসভার পরিবর্তে শাসন বিভাগের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এর ফলে শাসন বিভাগের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং আইনসভার ক্ষমতা হ্রাস পায়।

২। **জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির জটিলতা বৃদ্ধি:** বিংশ শতকের প্রথমার্ধে দু'টি বিশ্বযুদ্ধ, বিংশ শতাব্দীর ঠান্ডা লড়াই, সাম্প্রতিককালে মৌলবাদ, জাতিগত সংঘাতসহ নিত্য-নতুন সংকট ও আশংকা এবং অর্থনীতি অত্যন্ত জটিল হয়ে পড়ার বাস্তবতাতে, শাসন বিভাগের দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পরিস্থিতির জটিলতা ও জটিল পরিস্থিতির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ফলশ্রুতিতে পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনার ক্ষেত্রে শাসন বিভাগের ভূমিকা প্রধান হয়ে উঠেছে। সামরিক ও প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে গোপনীয়তা রক্ষা করা দরকার। আইনসভার সদস্যদের খোলামেলা আলোচনায় তা আবার সম্ভব হয় না। স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র সংক্রান্ত বিষয়ে নতুন-নতুন সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। সর্বোপরি জাতীয় সংকট ও জরুরি অবস্থায় আইনসভা অনেক সময় তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে না পারায় এর ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে।

৩। **দলীয় ব্যবস্থার কঠোরতা:** বর্তমানে সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় আইনসভা কার্যত ক্ষমতাসীন দলের ইচ্ছামাফিক কাজ করে। রাজনৈতিক দল ব্যবস্থার বিস্তার, সুসংগঠিত দলীয় ব্যবস্থা ও দলীয় নিয়মানুবর্তিতার বদৌলতে মন্ত্রিসভা আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থনের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকে। আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সরকার গঠন করে। সংখ্যারগরিষ্ঠ দলের নেতারাই সরকারে স্থান লাভ করেন। সরকারের স্থায়িত্ব আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থনের

উপর নির্ভরশীল। তাই সরকারি দল দলীয় নির্দেশ ও শৃঙ্খলার ব্যাপারে সতর্ক ও কঠোর হয়। আইনসভার ভিতরে শাসকদলের সদস্যরা দলীয় নির্দেশ অনুসারে কথা বলেন ও কাজ করেন। দলের বাইরে গেলে পরবর্তীতে দলীয় মনোনয়ন পাওয়ার বিষয়ে অনিশ্চয়তা থাকে। দলীয় নির্দেশ মান্য করা অথবা অনিশ্চিত রাজনৈতিক ভবিষ্যৎকে বরণ করা এ দুয়ের মধ্যে আইনসভার সদস্যরা সাধারণত প্রথমটিকেই গ্রহণ করেন। ফলশ্রুতিতে, বর্তমানে অনেক দেশে আইনসভা শাসন-বিভাগীয় নির্দেশ অনুমোদনের একটি সংস্থায় পরিণত হয়েছে।

৪। **আইন প্রণয়ন ও আর্থিক বিষয়ে ক্ষমতা হ্রাস:** বর্তমানে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে আইনসভার ভূমিকা অনেক ক্ষেত্রেই অনুষ্ঠানসর্বস্ব হয়ে উঠেছে। এখন শাসন-বিভাগই অধিকাংশ আইনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। আইনসভায় উত্থাপিত বিলের মধ্যে অধিকাংশই সরকারি বিল। এছাড়া অর্থসংক্রান্ত বিষয়ের উপর আধুনিক আইনসভার নিয়ন্ত্রণ দুর্বল হয়ে গেছে। কেননা, আইনসভার সাধারণ সদস্যরা বাজেট প্রস্তাব বা অর্থ বিল উত্থাপন করেন না। মন্ত্রীরাই এ কাজ করেন। আর্থিক বিষয়ের জটিলতা, প্রয়োজনীয় বিশেষজ্ঞ-জ্ঞানের অভাব এবং সময়ের স্বল্পতার জন্যও অনেক সময় বাজেট প্রস্তাব নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার অবকাশ থাকে না।

৫। **অর্পিত ক্ষমতাপ্রসূত আইন:** আধুনিক জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহুবিধ আইনের প্রয়োজন হয়। আইনের জটিলতা, সদস্যদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অভাব সর্বোপরি সময়ের অভাবের জন্য আইনসভা আইন প্রণয়নের কিছু ক্ষমতা বাধ্য হয়ে শাসন বিভাগের হাতে অর্পন করে। ফলে শাসন বিভাগকে কিছু কিছু আইন প্রণয়ন করতে হয়। একে অর্পিত ক্ষমতাপ্রসূত আইন (Delegated legislation) বলে। এর ফলে আইন বিভাগের উপর শাসন বিভাগের প্রভাব বেড়ে চলেছে।

৬। **সদস্যদের অদক্ষতা:** আজকের যুগে একটি আইনসভাকে অতীত আমলের তুলনায় অনেক বেশি জটিল ও দক্ষতা দাবিকারী সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। এসব সমস্যার সমাধান কেবলমাত্র আন্তরিকতা বা সাধারণ জ্ঞান দ্বারা সমাধান করা সম্ভব হয় না। এজন্য একটি নির্দিষ্ট মাত্রার বিশেষায়িত জ্ঞান প্রয়োজন। উন্নয়নশীল অনেক দেশেই আইন সভার সদস্যদের অদক্ষতা একটি বড় সমস্যা হয়ে উঠেছে। এহেন বাস্তবতাতে শাসন বিভাগের দক্ষতাসম্পন্ন আমলাদের ভূমিকা শাসনকার্য পরিচালনাতে বড় হয়ে উঠেছে।

৭। **চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর গুরুত্ব:** আইনসভা সরকার ও জনসাধারণের মধ্যে সংযোগ সাধনের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী (Pressure Groups) ও সংগঠন জনগণের স্বার্থ ও সমস্যাদি সম্পর্কে সরাসরি শাসন বিভাগে সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়। সরকারি নীতিকে প্রভাবিত করার এবং সরকারের সাথে জনগণের সংযোগ সাধনের মাধ্যম হিসেবে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীসমূহের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলশ্রুতিতে আইন সভার গুরুত্ব কমছে।

৮। **সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপ:** তৃতীয় বিশ্বের অনেক উন্নয়শীল রাষ্ট্রে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার সুযোগে সামরিক বাহিনী শাসন ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করে। তখন আইনসভা স্থবির হয়ে পড়ে। সামরিক সরকারের মাধ্যমে তখন দেশ পরিচালিত হয় এবং আইনসভার ভূমিকা বিলুপ্ত হয়। এ ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব হলে, আইন সভা স্বাভাবিকভাবেই গুরুত্ব হারাতে থাকে।

পরিশেষে বলা যায়, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ইদানীংকালে সারা বিশ্বেই নির্বাহী বিভাগের ক্ষমতা বাড়ছে। আইন সভাকে নানান ক্ষেত্রেই অতীত আমলের তুলনায় কিছুটা হলেও কম ভূমিকা পালন করতে দেখা যাচ্ছে। তথাপি, সংবিধান ও আইন প্রণয়নের ক্ষমতা থাকার কারণে এ বিভাগটি এখন অবধি অনেকের দৃষ্টিতে সরকারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি**) /শিক্ষার্থীর কাজ**	আইন সভার ক্ষমতা দিনে দিনে হ্রাস পাচ্ছে- আপনি কি এই মতের সাথে একমত? ব্যাখ্যা করুন।

সার-সংক্ষেপ

আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় শাসন বিভাগের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আইনসভার ক্ষমতা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। নানাবিধ বাস্তবতায় জনগণের সাথে আইনসভার সদস্যদের সম্পৃক্ততা কমে যাচ্ছে। অন্যদিকে, শাসন বিভাগের সদস্যদের সাথে নানা কারণে জনগনের সংযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বহুমুখী জটিলতার যুগে আইনসভার সদস্যরা অনেক সময় যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হচ্ছে। আইনসভার সদস্যদের অনেকের দক্ষতার অভাবও আইনসভার ক্ষমতা হ্রাসের জন্য অন্যতম প্রধান কারণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। "Modern Democracies" নামক গ্রন্থের লেখক কে?
ক) কে সি হোয়ার খ) লর্ড ব্রাইস
গ) হ্যারল্ড লাসওয়েল ঘ) অ্যালান বল

২। 'দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় সকল ক্ষেত্রেই আইনসভার ক্ষতা হ্রাস পেয়েছে।' – উক্তিটি কে করেছেন?
ক) ম্যাকাইভার খ) হ্যারল্ড লাস্কি
গ) কে সি হোয়ার ঘ) জন লক

৩। আইনসভার ক্ষমতা হ্রাসের কারণে কোন বিভাগের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে?
ক) শাসন বিভাগ খ) বিচার বিভাগ
গ) নির্বাচন কমিশন ঘ) নির্বাচকমণ্ডলী

৪। আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইনকে সংবিধান বর্হিভূত বলে বাতিল ঘোষণা করতে পারে কে?
ক) শাসন বিভাগ খ) সচিবালয়
গ) দুর্নীতি দমন কমিশন ঘ) সুপ্রীম কোর্ট

পাঠ-৯.৭ শাসন বিভাগের গঠন ও কার্যাবলি
(Composition and Functions of the Executive)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- শাসন বিভাগের গঠন সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- শাসন বিভাগের কার্যাবলি সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	প্রতিরক্ষা দপ্তর, ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ, অর্থদপ্তর, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, আমলা।

শাসন বিভাগের গঠন

আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে শাসন বিভাগের প্রাধান্য বেড়ে চলার লক্ষণ সুস্পষ্ট। ব্যাপক অর্থে শাসন বিভাগ বলতে রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহী (Chief Executive) থেকে শুরু করে প্রশাসনিক কাজে নিযুক্ত সাধারণ কর্মচারী পর্যন্ত সকলকেই বোঝায়। শাসন বিভাগের দুইটি অংশ আছে ঃ (ক) রাজনৈতিক অংশ এবং (খ) অ-রাজনৈতিক অংশ।

(ক) রাজনৈতিক অংশ: শাসন বিভাগের যেসব ব্যক্তি জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হন তাঁদেরকে শাসন বিভাগের রাজনৈতিক অংশ বলা হয়। নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্বাচনের ফলাফলের ভিত্তিতে এরা শাসন বিভাগে যোগ দেন। কার্যকাল অতিক্রান্ত হওয়ার পর এদের পুনরায় নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হতে হয়। শাসন বিভাগের রাজনৈতিক অংশকে সরকারের নীতি-নির্ধারণের ব্যাপারে চূড়ান্তভাবে দায়িত্বশীল থাকতে হয়। এ দায়িত্ব সাংবিধানিকভাবে আইনসভার কাছে এবং চূড়ান্ত বিচারে নির্বাচকমন্ডলীর কাছে। এ দায়িত্বের প্রকৃতি হল প্রত্যক্ষ। উদাহরণ হিসেবে বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভার সদস্যদের কথা বলা যায়।

(খ) অ-রাজনৈতিক অংশ: অপরদিকে সরকারের স্থায়ী কর্মচারীদের শাসন বিভাগের স্থায়ী বা অ-রাজনৈতিক অংশ বলা হয়। এরা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে গুণগত যোগ্যতার ভিত্তিতে স্থায়ীভাবে শাসন বিভাগে যোগ দেন। এদের নিযুক্তির ব্যাপারে নির্বাচনী রাজনীতির কোন সম্পর্ক নেই। স্থায়ী সরকারি কর্মচারীদের 'আমলা' নামেও অভিহিত করা হয়। শাসন বিভাগের রাজনৈতিক অংশ প্রশাসনিক নীতি-নির্ধারণ করেন এবং তার বাস্তবায়নের দিকে নজর রাখেন। আর সরকারের আমলা বা স্থায়ী কর্মচারীরা নীতিগুলোকে বাস্তবে রূপায়িত করেন।

শাসন বিভাগের কার্যাবলি

জাতি-রাষ্ট্র (Nation-state) প্রতিষ্ঠার শুরুর দিকে মনে করা হত যে, বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশরক্ষা এবং অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখাই হল শাসন বিভাগের কাজ। কিন্তু সময়ের পরিক্রমায়, নির্দিষ্টভাবে বললে, বিংশ শতাব্দীতে এসে, রাষ্ট্রের কার্যক্ষেত্রের পরিধি বিপুলভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে। নানাবিধ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা বেড়ে চললেও, এই একবিংশ শতাব্দীতেও রাষ্ট্রের নানাবিধ ভূমিকা প্রতিনিয়তই বৃদ্ধি পাচ্ছে। রাষ্ট্রের কার্যাবলি বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে স্বাভাবিকভাবেই শাসন বিভাগের কর্মপরিধি বিস্তৃতি লাভ করেছে। আধুনিক রাষ্ট্রের শাসন বিভাগ যেসব কাজ সম্পাদন করে সেগুলোর মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হল-

১। **অভ্যন্তরীণ শাসনকার্য পরিচালনা:** আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইন শাসন বিভাগ কার্যকর করে। আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গকারীকে বিচারালয়ের সম্মুখে উপস্থিত করা, বিচারালয়ের রায় অনুসারে অপরাধীকে শাস্তিদানের ব্যবস্থা করা প্রভৃতির

মাধ্যমে শাসন বিভাগ দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করে। তাছাড়া অধঃস্তন সরকারি কর্মচারীদের নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি এবং পদচ্যুতি বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ, জরুরি অবস্থার মোকাবেলা করার জন্য অর্ডিন্যান্স জারি প্রভৃতি শাসন বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

২। **পররাষ্ট্র সংক্রান্ত:** বর্তমানে কোন রাষ্ট্রই নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ বলে দাবি করতে পারে না। তাই রাষ্ট্রসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ করা একান্ত প্রয়োজন। শাসন বিভাগের প্রধানই বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক রক্ষা করেন। নিজ রাষ্ট্রের কূটনৈতিক অন্য রাষ্ট্রে প্রেরণ, অন্য রাষ্ট্রের কূটনৈতিক প্রতিনিধি গ্রহণ, রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদন; কোন রাষ্ট্রের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করা হবে কিংবা কোন রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা প্রয়োজন ইত্যাদি নির্ধারণ করা শাসন বিভাগের পররাষ্ট্র সম্পর্কিত কার্যাবলির অন্তর্ভূক্ত। এসব কাজের দায়িত্ব পররাষ্ট্র দপ্তরের উপর অর্পিত হয়।

৩। **প্রতিরক্ষা কার্যাবলি:** দেশের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা রক্ষার গুরুদায়িত্ব শাসন বিভাগের ওপরে ন্যস্ত থাকে। সাধারণভাবে সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসেবে রাষ্ট্রপ্রধান সৈন্যবাহিনীর গঠন, পরিচালনা, যুদ্ধ পরিচালনা বিষয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ এবং দেশ রক্ষার প্রয়োজনে বেসামরিক শক্তিকে কাজে লাগানো প্রভৃতি কার্য সম্পাদন করে। রাষ্ট্রপ্রধান প্রয়োজনবোধে সামরিক আইনও জারি করতে পারেন। যুদ্ধ ও প্রতিরক্ষার দায়িত্ব প্রতিরক্ষা দপ্তরের (Defence Department) উপর ন্যস্ত থাকে।

৪। **আইন সংক্রান্ত কার্যাবলি:** সংসদীয় ব্যবস্থাতে আইন ও শাসন বিভাগের নেতৃত্বে সাধারণত একই ব্যক্তি থাকে বিধায়, আইন বিভাগের উপরে শাসন বিভাগের স্বাভাবিকভাবেই এক ধরনের হস্তক্ষেপ চলে আসে। অন্যদিকে, রাষ্ট্রপ্রধান শাসিত ব্যবস্থাতে রাষ্ট্রপ্রধানের সম্মতি ছাড়া আইন বিভাগের আইন প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন হতে পারে না। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি চালু থাকলেও, আজকের দিনে রাষ্ট্রপ্রধান শাসিত ব্যবস্থাতে আইন সভার উপরে রাষ্ট্রপ্রধানের অনেকখানি প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

৫। **বিচার সংক্রান্ত কার্যাবলি:** রাষ্ট্রপ্রধান শাসিত ব্যবস্থায় শাসন বিভাগ প্রধান বিচারপতিদের নিয়োগ করেন। বিচার বিভাগ কর্তৃক দন্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে ক্ষমা প্রদর্শন, শাস্তির পরিমাণ হ্রাস প্রভৃতি বিচার সংক্রান্ত কার্যাবলি রাষ্ট্রপ্রধান সম্পাদন করেন। তাছাড়া শাসন বিভাগের কোন কর্মচারীর অন্যায় আচরণ কিংবা দুর্নীতির বিচার ও শাস্তি দান, কোন সরকারি কর্মচারীকে অন্যায়ভাবে পদচ্যুত করা হয়েছে কিনা তার বিচার শাসন বিভাগ করে থাকে। এরূপ বিচারকে শাসন বিভাগীয় বিচার বলা হয় ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ভারতসহ পৃথিবীর অনেক দেশে এরূপ শাসন বিভাগীয় বিচার ব্যবস্থা প্রবর্তিত আছে।

৬। **অর্থ সংক্রান্ত কার্যাবলি:** সরকারের যাবতীয় কার্য সম্পাদনের জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন। এই বিপুল অর্থ সংগ্রহের দায়িত্ব প্রধানত শাসন বিভাগের। অবশ্য আইন বিভাগের অনুমোদন না পেলে শাসন বিভাগ অর্থ ব্যয় করতে পারে না। কর সংগ্রহ ও ব্যয় বরাদ্দ করা ছাড়াও শাসন বিভাগকে সরকারি কোষাগারের হিসাব পরীক্ষা করতে হয়। অর্থদপ্তর (Finance Department) এর হাতে এ ক্ষমতা অর্পিত থাকে।

৭। **জনকল্যাণমূলক কার্যাবলি:** আধুনিক রাষ্ট্রে জনস্বাস্থ্য, জনশিক্ষা, কৃষি, শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন প্রভৃতি জনকল্যাণকর কার্যাদি শাসন বিভাগই সম্পাদন করে।

৮। **নীতি নির্ধারণ সংক্রান্ত কাজ:** স্বরাষ্ট্র এবং পররাষ্ট্র সংক্রান্ত কাজকর্ম পরিচালনার জন্য সরকারের সুনির্দিষ্ট নীতি থাকতে হয়। সরকারের শাসন বিভাগ এ নীতি নির্ধারণ করে। ব্রিটেন, ভারত, বাংলাদেশ প্রভৃতি সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার দেশে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ক্যাবিনেট এ নীতি প্রণয়ন করে তাকে। অপরদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত রাষ্ট্রপ্রধান শাসিত শাসন ব্যবস্থায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারি নীতি নির্ধারণ ও প্রয়োগের দাযিত্ব এবং ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত থাকে।

৯। **আইন বলবৎকরণ সংক্রান্ত কাজ:** শাসন বিভাগের অন্যতম মুখ্য কাজ আইন বলবৎ করা। সব ধরনের সরকারেই আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইনকে শাসন বিভাগ সঠিকভাবে বলবৎ করে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে

সরকারের তিনটি বিভাগের ক্ষমতা ও কার্যাবলিকে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইনকে শাসন বিভাগ বিশ্বস্ততার সাথে কার্যকরীভাবে প্রয়োগ করবে।

পরিশেষে বলা যায় যে, বর্তমানে রাষ্ট্রের কার্যাবলি উত্তরোত্তর বিপুলভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে শাসন বিভাগ ক্রমশ: ক্ষমতাশালী হয়ে উঠার একটি প্রবণতা লক্ষণীয়। বিশেষ করে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় আইন বিভাগের প্রাধান্যের পরিবর্তে শাসন বিভাগের ক্ষমতা বৃদ্ধি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। রাষ্ট্রপ্রধান শাসিত শাসনব্যবস্থাতেও দলীয় শাসনের মাধ্যমে শাসন বিভাগ আইন বিভাগকে বহুল পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করতে সমর্থ হচ্ছে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	শাসন বিভাগের অপরিহার্য কাজ গুলো কি কি?

সার-সংক্ষেপ

শাসন বিভাগ আইন বিভাগ কর্তৃক প্রণীত আইনকে বাস্তবায়ন করে। আইনের মাধ্যমেই রাষ্ট্রের ইচ্ছা প্রকাশ পায়। আর এ আইনকে কার্যকর করে শাসন বিভাগ। রাষ্ট্রের সকল ধরনের প্রশাসনিক কার্যাবলি শাসন বিভাগ সম্পাদন করে। শাসন বিভাগের দুইটি অংশ রয়েছে। যথা– রাজনৈতিক অংশ এবং অ-রাজনৈতিক অংশ। শাসন বিভাগ আইন সংক্রান্ত, বিচার সংক্রান্ত, পররাষ্ট্র সংক্রান্ত, অর্থ-সংক্রান্ত, প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত, অভ্যন্তরীণ শাসনকার্য পরিচালনা সংক্রান্তসহ বহুবিধ কার্য সম্পাদন করে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। শাসন বিভাগের কয়টি অংশ আছে?
ক) ২টি খ) ৪টি
গ) ৬টি ঘ) ৮টি

২। অধ্যাদেশ (Ordinance) জারি করতে পারেন কে?
ক) প্রধানমন্ত্রী খ) রাষ্ট্রপ্রধান
গ) স্পীকার ঘ) প্রধান বিচারক

৩। পার্লামেন্টের অধিবেশন আহবান করেন কে?
ক) প্রধানমন্ত্রী খ) স্পীকার
গ) রাষ্ট্রপ্রধান ঘ) প্রধান বিচারপতি

৪। রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন ব্যবস্থা দেখা যায় কোন দেশে?
ক) বাংলাদেশ খ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
গ) ভারত ঘ) ব্রিটেন

পাঠ-৯.৮ শাসন বিভাগের ক্ষমতা বৃদ্ধি (Growth of Power of the Executive)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- শাসন বিভাগের ক্ষমতা বৃদ্ধির কারণ উপস্থাপন করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	অর্থনৈতিক সংকট, যুদ্ধ, জাতির মুখপাত্র, সুযোগ্য নেতৃত্ব, সংসদীয় সরকার।

শাসন বিভাগের ক্ষমতা বৃদ্ধির কারণ

সরকারের তিনটি বিভাগ রয়েছে; আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ। রাষ্ট্র একটি বিমূর্ত ধারণা। রাষ্ট্রের সকল সিদ্ধান্ত সরকার তার তিনটি বিভাগের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করে তাকে। তবে সাম্প্রতিক কালে সরকারি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে শাসন বিভাগের ক্ষমতা অন্য দুই বিভাগের চেয়ে বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে শাসন বিভাগের ক্ষমতা বৃদ্ধির নানাবিধ কারণ রয়েছে যা নিম্নে উল্লেখ করা হল:

১। **রাষ্ট্রের কাজের পরিধি বৃদ্ধি:** বর্তমান আধুনিক জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে কাজের পরিধি ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, দেশরক্ষা ও রাজস্ব আদায়ের মত সনাতনী কাজের বাইরে বর্তমান কালের প্রতিটি রাষ্ট্রকে বিপুল মাত্রাতে উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হতে হয়। আর এসব দায়িত্ব সম্পাদনের ক্ষেত্রে শাসন বিভাগ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এর মানে হচ্ছে রাষ্ট্রের বা সরকারের কাজ বৃদ্ধি পাওয়ার অর্থ হল বাস্তবে শাসন বিভাগের কাজ তথা ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়া।

২। **আইন প্রণয়নে জটিলতা:** বর্তমানে নানাবিধ কারণে আইন প্রণয়নে ব্যাপকতা ও জটিলতা বেড়ে যাবার কারণে, অনেক সময় আইনসভা তার কাজ করতে সমস্যার সম্মুখীন হয়। এমত বাস্তবতায় অনেক সময় আইনসভা নিজে উদ্যোগী হয়ে আইন প্রণয়নের অনেকটুকু কাজ শাসন বিভাগের হাতে তুলে দিচ্ছে। এর ফলে শাসন বিভাগের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৩। **অর্থনৈতিক সংকট ও সমস্যা:** রাষ্ট্রের নানাবিধ অর্থনৈতিক সংকট ও সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে সরকারের অন্য দুই বিভাগ থেকে শাসন বিভাগ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। যার জন্য শাসন বিভাগের সাথে সাধারণ জনগণের সংশ্লিষ্ট হওয়ার সুযোগ বেশি সৃষ্টি হয়। এছাড়া রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সংকট মুহূর্তে শাসন বিভাগ দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।

৪। **যুদ্ধ ও আন্তর্জাতিক সমস্যা:** আধুনিক বিশ্ব নানা ধরনের যুদ্ধ ও আন্তর্জাতিক সমস্যায় জর্জরিত। এ ধরনের সমস্যার সমাধান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সাধারণত শাসন বিভাগেই মূল ভূমিকা পালন করে। এছাড়াও প্রতিটি রাষ্ট্রে প্রতিরক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকে শাসন বিভাগ। দেশরক্ষার ক্ষেত্রে মূল দায়িত্ব হাতে থাকায় স্বাভাবিক ভাবেই শাসন বিভাগের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

৫। **হস্তান্তরিত আইনের প্রাধান্য:** সাম্প্রতিক কালে আইন প্রনয়ণ জটিল, সময় সাপেক্ষ ও বিশেষজ্ঞজ্ঞানের দাবীদার হয়ে উঠায় এক প্রকার বাধ্য হয়ে শাসন বিভাগের হাতে আইন প্রনয়ণের অনেকটুকু অংশ হস্তান্তর করে। আইন বিভাগ কর্তৃক দায়িত্ব হস্তান্তরের আধিক্যের কারণেও আইন সভার ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে এবং শাসন বিভাগের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৬। **শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণের অভাব:** তত্ত্বগতভাবে আইনসভা শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করার কথা। কিন্তু দলব্যবস্থা ভিত্তিক সরকারের এ যুগে বাস্তবে শাসন বিভাগের পরিকল্পনা অনুযায়ী আইনসভার কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এর ফলে শাসন বিভাগই শেষাবধি ক্ষমতা চর্চায় এগিয়ে যায়।

৭। **জাতির মুখপাত্র ও প্রতিনিধি:** দেশের প্রধান নির্বাহী কর্তা সমগ্র জাতির মুখপাত্র ও প্রতিনিধি হিসেবে দৃশ্যমান ভূমিকা পালন করেন। পরিচালনার ক্ষেত্রে ও সর্বোচ্চ নির্বাহীর ভূমিকাই প্রধান হয়ে উঠে। স্বাভাবিকভাবেই সরকারের কাজকর্ম

পরিচালনায় সর্বোচ্চ নির্বাহীর ভাবমূর্তি বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে এবং এর মধ্য দিয়ে শাসন বিভাগের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

৮। **তথ্য প্রাপ্তির সুবিধা:** সরকারি কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত শাসন বিভাগের কাছেই থাকে। এসব তথ্য উপাত্ত ব্যবহার করে শাসন বিভাগ জনগণের জন্য যেসব অত্যাবশ্যকীয় কাজ করে তাতে তার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির সাথে ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়।

সবশেষে বলা যায়, বর্তমান কালের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থাগুলিতে নানাবিধ কারণে আইনসভার ঐতিহ্যগত প্রাধান্য কিছুটা হলেও হ্রাস পাচ্ছে। পক্ষান্তরে, সরকারি কর্মকান্ডের পরিধি বেড়ে যাওয়া এবং পরিস্থির দাবী অনুযায়ী দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারার ক্ষমতা থাকার বদৌলতে, আজকের দিনে সরকারি কার্যক্রম পরিচালনাতে শাসন বিভাগের প্রভাব বেড়ে চলেছে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	শাসন বিভাগের ক্ষমতা বৃদ্ধির কয়েকটি কারণ লিখুন।

সার-সংক্ষেপ

সাম্প্রতিককালে শাসন বিভাগের কার্যাবলি অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে শাসন বিভাগের ক্ষমতাও বেড়েছে। রাষ্ট্রপতিশাসিত এবং সংসদীয় উভয় ধরনের শাসন ব্যবস্থাতেই শাসন বিভাগের কর্তৃত্ব ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত। শাসন বিভাগ রাষ্ট্রের জনকল্যাণমূলক ও প্রতিরক্ষামূলক কার্য সম্পাদন করে থাকে। শাসন বিভাগ রাষ্ট্রের সামগ্রিক নাগরিকের সাথে সম্পৃক্ত থেকে জনকল্যাণমূলক কাজ করে। মূলত আধুনিক জনকল্যাণমূলক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে শাসন বিভাগের দ্রুততা ও দক্ষতার কারণে ক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সরকারের কোন বিভাগটি জনগনের সাথে বেশি সম্পৃক্ত হতে পারে ?
ক) আইন বিভাগ খ) শাসন বিভাগ
গ) বিচার বিভাগ ঘ) নির্বাচন কমিশন

২। অর্থনৈতিক সঙ্কটময় সময়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারে কোন বিভাগ ?
ক) আইন বিভাগ খ) শাসন বিভাগ
গ) বিচার বিভাগ ঘ) দাতা সংস্থা

৩। প্রতিরক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকে কোন বিভাগ?
ক) আইন বিভাগ খ) বিচার বিভাগ
গ) শাসন বিভাগ ঘ) জন প্রশাসন বিভাগ

৪। মানুষের মৌলিক অধিকার খর্ব হয় কখন?
ক) নির্বাচনের পর খ) সংবিধান প্রণয়ন হলে
গ) ভোটের মাধ্যমে ঘ) সংবিধান স্থগিত হলে

পাঠ-৯.৯ বিচার বিভাগের গঠন ও কার্যাবলি
(Composition and Functions of the Judiciary)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- বিচার বিভাগের গঠন বর্ণনা করতে পারবেন।
- বিচার বিভাগের কার্যাবলি আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	আইনের অনুশাসন, উচ্চ আদালত, দন্ড বিভাগ, মামলা-মোকদ্দমা, বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা।

বিচার বিভাগের গঠন

বিচার বিভাগ সরকারের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বিচার বিভাগ রাষ্ট্রীয় আইন গুলো ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ করে। এছাড়াও বিবাদ মীমাংসা করা হচ্ছে বিচার বিভাগের অন্যতম কাজ। আইন সভার কোন সিদ্ধান্ত সংবিধান সম্মত হয়েছে কিনা, সে ব্যাপারেও বিচার বিভাগ বক্তব্য রাখতে পারে। সরকারের নির্বাহী বিভাগের সিদ্ধান্তের ব্যাপারেও বিচার বিভাগ বক্তব্য রাখতে পারে। নিম্নে বিচার বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো উল্লেখ করা হল:

১। **নিম্নস্তর আদালত:** যে আদালতে নাগরিকদের অধিকার, অপরাধ, বিরোধ সংক্রান্ত মামলা সম্পন্ন হয় তাকে নিম্নস্তর আদালত বা অধঃস্তন আদালত বলে। নিম্নস্তরের আদালতকে অপরাধের প্রকৃতি অনুসারে দু'টি ভাগে ভাগ করা হয়। যথা: ফৌজদারি আদালত ও দেওয়ানি আদালত। জনগণের বিভিন্ন প্রকার অপরাধ সংক্রান্ত মামলার বিচার করা হয় ফৌজদারি আদালতে এবং নাগরিকদের সম্পত্তি সংক্রান্ত বিভিন্ন মামলার বিচার করা হয় দেওয়ানি আদালতে।

২। **মধ্যস্তরের আদালত:** মধ্যস্তরের আদালতে মূলত নিম্ন আদালতে প্রদত্ত রায়ের পুনর্বিবেচনার জন্য আপিল করা হয়। এসব আদালতে কখনো কখনো গুরুত্বপূর্ণ মামলার প্রথম শুনানী ও বিচার করা হয়। এ স্তরে ফৌজদারি ও দেওয়ানি আদালত কার্যকর থাকে। মধ্যস্তরের দেওয়ানি মামলার জন্য বাংলাদেশে "জেলা জজ আদালত" এবং ফৌজদারি মামলা নিষ্পত্তির জন্য "দায়রা জজ আদালত" রয়েছে। এছাড়া রয়েছে অতিরিক্ত জেলা জজ বা অতিরিক্ত দায়রা জজ আদালত বর্তমানে বাংলাদেশে দায়রা জজ আদালতের সমপর্যায়ের "নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আদালত" নামে একটি বিশেষ আদালত গঠন করা হয়েছে।

৩। **উচ্চ আদালত:** উচ্চ আদালত হল দেশের সর্বোচ্চ আদালত। উচ্চ আদালতের প্রধান বা মূল কাজ হল মধ্যস্তরের আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপিলের শুনানি গ্রহণ ও বিচার করা। এছাড়া উচ্চ আদালত রাষ্ট্রের সাংবিধানিক প্রশ্ন জড়িত বিভিন্ন মামলার শুনানি গ্রহণ ও বিচারকার্য সম্পাদন করে। উচ্চ আদালতের দুটি বিভাগ থাকে। যথা: হাইকোর্ট বিভাগ ও আপিল বিভাগ।

বিচার বিভাগের কার্যাবলি

বিচার বিভাগ সরকারের প্রধান তিনটি বিভাগের একটি। তবে সরকারের অন্য দুইটি বিভাগ জনপ্রতিনিধি নির্ভর হলেও, বিচার বিভাগের ক্ষেত্রে তা ঘটে না। বিচার বিভাগ যে কোন রাষ্ট্রে ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণের প্রধান কাঠামো। এই বিভাগটি তত্ত্বগতভাবে রাজনৈতিক দল ব্যবস্থার উর্ধ্বে থেকে সর্বোচ্চ নিরপেক্ষতার ভিত্তি কাজ করে। অ্যালান বলের মতে, রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিচার বিভাগের কার্যাবলির পরিমাণ বিশেষীকরণের মাত্রার (degree of specialization) উপর নির্ভরশীল। নিম্নে বিচার বিভাগের কার্যাবলি আলোচনা করা হল:

১। **বিচার সংক্রান্ত কাজঃ** বিচার বিভাগের প্রধান কাজ হল দেশের প্রচলিত আইন ও সংবিধান অনুযায়ী নিরপেক্ষভাবে বিচারিক কার্য সম্পাদন করা। এ জন্য বিচার বিভাগ রাষ্ট্রের প্রচলিত আইনকে বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে অপরাধীর দন্ডবিধান করে। আদালতে যে সকল মামলা-মোকদ্দমা দায়ের করা হয় সে সমস্ত মামলার বাদী-বিবাদীর সাক্ষ্য গ্রহণের পর আইনানুযায়ী নিরপেক্ষভাবে বিচারের রায় ঘোষণা করা বিচার বিভাগের অন্যতম কাজ। বিচার বিভাগ নির্ভীক, নির্লোভ ও নিরপেক্ষভাবে আইনগত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিচার করে অপরাধীর শাস্তি প্রদান ও নিরপরাধীকে মুক্তি প্রদানের মাধ্যমে রাষ্ট্রে ন্যায় বিচার ও আইনের অনুশাসন প্রতিষ্ঠা করে।

২। **আইনের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত কাজঃ** বিচার বিভাগ আইনসভা প্রণীত আইনের ব্যাখ্যা প্রদান এবং যথাযথভাবে তা প্রয়োগের ব্যবস্থা করে। বিচার বিভাগ যদি কোন আইনকে কিংবা আইনের ভাষাকে অস্পষ্ট বা পরস্পর বিরোধী বলে মনে করে তাহলে বিচারপতিগণ আইন প্রণেতাদের ধ্যান-ধারণা বিশ্লেষনের মাধ্যমে আইনের ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

৩। **আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজঃ** অনেক সময় বিচার কার্য সম্পাদন করতে গিয়ে প্রচলিত আইন যথেষ্ট নয় বলে বিচারপতিরা মনে করতে পারেন। সেক্ষেত্রে বিচারাধীন কোন মামলার রায় দানকালে তারা আইনের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। আইনের এই ব্যাখ্যা পরবর্তী সময়ে নজির হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এভাবে বিচারকগণ প্রচলিত আইনের ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে নতুন আইনের সৃষ্টি করেন। এসব আইনকে 'বিচারক প্রণীত আইন' (Judgmande laws) বলা হয়।

৪। **ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাঃ** ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা বিচার বিভাগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আদালতের সম্মুখে আনীত যেকোন বিরোধের নিষ্পত্তি করতে গিয়ে বিচারপতিদের বাস্তব ঘটনাবলি সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করতে হয়। এই উদ্দেশ্যে নথিপত্র, সাক্ষ্য-প্রমাণ ইত্যাদির সাহায্য গ্রহণ করা হয়। দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয় প্রকার মামলাতেই বিচার বিভাগকে সত্যানুসন্ধানের মাধ্যমে অপরাধীর শাস্তি বিধান করে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার পবিত্র কর্তব্য পালন করতে হয়।

৫। **বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা ও সংবিধানের ব্যাখ্যাঃ** আইনসভা প্রণীত কোন আইন কিংবা শাসন বিভাগের কোন আদেশ যখন সংবিধানের বিরোধী হয় তখন সেই আইন বা আদেশকে বাতিল করে দেওয়ার যে ক্ষমতা বিচার বিভাগের হাতে থাকে তাকে বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা (Judicial Review) বলা হয়। সংবিধান বিরোধী আইন বা নির্দেশ বাতিল করে দিয়ে বিচার বিভাগ সংবিধানের পবিত্রতা ও শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষার গুরুদায়িত্ব পালন করে। তাছাড়া অনেক সময় বিচার বিভাগ সংবিধানের ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে কোন বিরোধ নিষ্পত্তি কিংবা কোন আইনের বৈধতা বিচার করতে পারে।

৬। **পরামর্শ দানের ক্ষমতাঃ** কোন কোন দেশে বিচার বিভাগ শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগকে পরামর্শদান করে থাকে। ভারতবর্ষের সুপ্রীম কোর্ট সাংবিধানিক বিষয়ে রাষ্ট্রপ্রধানকে পরামর্শ দিতে পারে। তবে তিনি সুপ্রিম কোর্ট প্রদত্ত পরামর্শ গ্রহণ করতে বাধ্য নন।

৭। **শাসন সংক্রান্ত কাজঃ** বিচার বিভাগ বিচারিক কার্য ছাড়াও কিছু শাসন সংক্রান্ত কাজ করে থাকে। বিচার বিভাগ নিজ বিভাগের কর্মচারীদের নিয়োগ দান করেন। নাবালকের সম্পত্তি তত্ত্বাবধান ও দেখাশোনা করেন এবং তাদের অভিভাবক নিযুক্ত করেন। আইন ব্যবসায়ীদের লাইসেন্স প্রদান করে, দেউলিয়া প্রতিষ্ঠানের পক্ষে আদায়কারী ভূমিকা পালনের মত কাজগুলি বিচার বিভাগ করে থাকে।

৮। **নাগরিকদের অধিকার সংরক্ষণ সংক্রান্ত কাজঃ** আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিচার বিভাগ নাগরিকদের অধিকার ও স্বাধীনতার রক্ষাকর্তা হিসেবে কাজ করে। যে দেশে লিখিত সংবিধান রয়েছে সেখানে আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগকে সংবিধানের গন্ডির মধ্যে থেকে কাজ করতে হয় সরকার যদি সংবিধানে লিপিবদ্ধ নাগরিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করে তাহলে বিচার বিভাগ সেই অধিকার পুন:প্রতিষ্ঠার কাজে অগ্রসর হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, বিচার বিভাগের ভূমিকা রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। বিচার বিভাগ দেশে ন্যায়বিচার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। বিচার বিভাগের নিরপেক্ষ ভূমিকার উপর নাগরিকের অধিকারের নিশ্চয়তা নির্ভর করে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি**) /শিক্ষার্থীর কাজ**	বাংলাদেশের বিচার বিভাগের কাঠামো উল্লেখ করুন।

সার-সংক্ষেপ

সরকারের যে বিভাগ বিচারিক কার্য-সম্পাদন করে তাকে বিচার বিভাগ বলে। অন্যভাবে বলা যায়, সরকারের যে বিভাগ দেশে প্রচলিত আইন অনুযায়ী অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করে এবং জনগণের অধিকার রক্ষা করে তাকে বিচার বিভাগ বলে। প্রায় সব দেশের বিচার বিভাগের সাংগঠনিক রূপের সাদৃশ্য রয়েছে। বিচার বিভাগ সাধারণত তিনটি স্তরে গঠিত হয়। যথা– নিম্নস্তর আদালত, মধ্যস্তরের আদালত ও উচ্চ আদালত। বিচার বিভাগ আইনের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ, সংবিধানের ব্যাখ্যা ও সংরক্ষণ, নাগরিক অধিকার সংরক্ষণসহ গণতন্ত্রের স্বরূপ সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৯

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। নিম্নস্তরের আদালতকে অপরাধের প্রকৃতি অনুসারে কয়ভাগে ভাগ করা হয়?

ক) ২ খ) ৪

গ) ৬ ঘ) ৮

২। নাগরিকের অধিকার ও স্বাধীনতার রক্ষাকর্তা হিসেবে কাজ করে কোন বিভাগ?

ক) আইন বিভাগ খ) বিচার বিভাগ

গ) শাসন বিভাগ ঘ) সংস্থাপন মন্ত্রণালয়

৩। বিচার বিভাগের কাজ হল–

i. আইনের ব্যাখ্যা প্রদান ii. অপরাধীন শাস্তি প্রদান iii. সংবিধান প্রণয়ন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

পাঠ-৯.১০ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় বিচার বিভাগের ভূমিকা
(Role of the Judiciary to Establish Rule of Law)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় বিচার বিভাগের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	ন্যায়বিচার, সংবিধানের প্রাধান্য, মৌলিক অধিকার, সাম্য, ব্যক্তিস্বাধীনতা, বাক্ স্বাধীনতা।

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় বিচার বিভাগের ভূমিকা

আইনের শাসনের অর্থ হল আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান। শাসক-শাসিত, ধনী-গরিব, জাতি, ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষ আইনের অধীনে থাকবে। আইনের উর্ধ্বে কেউ নয়। যেখানে আইনের শাসন নেই সেখানে স্বাধীনতা থাকতে পারে না। এ ভি ডাইসি (A.V. Diecy) মনে করেন আইনের শাসনের অর্থ হল–

(i) আইনের দৃষ্টিতে সকলে সমান
(ii) সকলের জন্য একই ধরনের আইন থাকবে;
(iii) কাউকে বিনা অপরাধে গ্রেফতার করা যাবে না;
(iv) কাউকে বিনা বিচারে আটক রাখা যাবে না এবং
(v) অভিযুক্তকারীর আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ থাকবে।

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় বিচার বিভাগের ভূমিকা অপরিসীম। নিম্নে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় বিচার বিভাগের ভূমিকা আলোচনা করা হল:

১। **ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা:** আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার প্রধান ভিত্তি হল ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা। বিচার বিভাগের স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারিক কার্য সম্পাদন সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা তথা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় বিচার বিভাগের ভূমিকাই প্রধান।

২। **সংবিধানের প্রাধান্য রক্ষা:** বিচার বিভাগের অন্যতম কাজ হল সংবিধানের ব্যাখ্যা দেওয়া। এজন্য সংবিধানের রক্ষক ও অভিভাবক বলা হয় বিচার বিভাগকে। সংবিধান রক্ষার মাধ্যমে জনগণের অধিকার নিশ্চিত হয় এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা পায়।

৩। **মৌলিক অধিকার রক্ষা:** মৌলিক অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে বিচার বিভাগের ভূমিকা অনস্বীকার্য। কোন ব্যক্তির যদি মৌলিক অধিকার খর্ব হয় এবং তিনি যদি আইনের আশ্রয় নেন তাহলে বিচার বিভাগ তাঁর মৌলিক অধিকার রক্ষা করার জন্য পদক্ষেপ নিয়ে থাকে। এভাবে বিচার বিভাগ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা পালন করে।

৪। **সাম্য প্রতিষ্ঠা:** বিচার বিভাগ সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল মানুষ আইনের দৃষ্টিতে সমান। বিচার বিভাগ সমাজে সকলের জন্য একই বিচারের মানদন্ড নিশ্চিত করে আইনগত সাম্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করে।

৫। **ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষা:** ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষায় বিচার বিভাগ অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করে। সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি যাতে তার চিন্তা, কর্ম, চলাফেরা স্বাধীনভাবে করতে পারে বিচার বিভাগ তা নিশ্চিত করে আইনের শাসন রক্ষা করে থাকে।

৬। **বাক্ স্বাধীনতা রক্ষা:** বাক্ স্বাধীনতা ও চিন্তার বহিঃপ্রকাশ নাগরিকের মৌলিক অধিকার। বাক্ স্বাধীনতা রক্ষা বিচার বিভাগের অন্যতম দায়িত্ব। বিচার বিভাগ নাগরিকের বাক্ স্বাধীনতা রক্ষার মাধ্যমে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করে।

৭। **অপরাধীকে শাস্তি প্রদান:** বিচার বিভাগ সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে অপরাধীকে শাস্তি প্রদান এবং নিরপরাধ ব্যক্তিকে মুক্তি দিয়ে থাকে। এর মাধ্যমে সমাজে অপরাধ প্রবণতা হ্রাস পায় এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা পায়।

৮। **স্বেচ্ছাচারিতা রোধ:** আইন ও শাসন বিভাগের স্বেচ্ছাচারিতা রোধে বিচার বিভাগ অনন্য ভূমিকা পালন করে। অনেক সময় আইন বিভাগ কর্তৃক প্রণীত আইন এবং শাসন বিভাগের কার্যক্রম, বিচার বিভাগ "তার বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষমতা ব্যবহারের" মাধ্যমে বাতিল করে সমাজে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করে।

৯। **বিরোধ নিষ্পত্তি:** রাষ্ট্রে বিরাজমান বিভিন্ন ধরনের বিরোধ বিচার বিভাগ মীমাংসা করে দেয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে ক্ষমতার বন্টন নিয়ে কখনো-কখনো বিরোধ সৃষ্টি হয়। সাংবিধানিক উপায়ে এ ধরনের বিরোধ নিষ্পত্তি করে বিচার বিভাগ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করে।

১০। **সংকট নিরসনে ভূমিকা:** সমাজে অনেক সময় বিভিন্ন ইস্যুতে সংকট সৃষ্টি হয়। এ ধরনের সংকট নিরসনে বিচার বিভাগ এগিয়ে আসে। বিচার বিভাগের বৈধ-অবৈধ ঘোষণার মাধ্যমে এ সংকট দূর হয় এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা পায়।

পরিশেষে বলা যায়, স্বাধীন, নিরপেক্ষ এবং দলীয় হস্তক্ষেপমুক্ত বিচার বিভাগের মাধ্যমেই সমাজে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় বিচার বিভাগ কিভাবে ভূমিকা রাখতে পারে?

সার-সংক্ষেপ

আইনের শাসনের অর্থ হল আইনের প্রাধান্য স্বীকার করা এবং আইন অনুযায়ী শাসন করা। আইনের শাসনকে বলা যায় নাগরিক স্বাধীনতার রক্ষাকবচ। অধ্যাপক ডাইসির আইনের শাসনের ব্যাখ্যা অনুসারে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে বিচার বিভাগ। বিচার বিভাগ প্রতিটি রাষ্ট্রে প্রচলিত রাষ্ট্রীয় আইন অনুসারে বিচার কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। বিচারকগণ আইনের ব্যাখ্যার মাধ্যমে নতুন আইন সৃষ্টি করেন এবং আইনের শাসনকে নিশ্চিত করে। বিচার বিভাগ নাগরিকের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ করে থাকে। বিচার বিভাগ আপিল ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমেও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখে। সংবিধান সমুন্নত রাখা বিচার বিভাগের অন্যতম একটি দায়িত্ব।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.১০

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। 'আইনের শাসন' মতবাদের প্রবক্তা কে?
ক) নিকোলো ম্যাকিয়াভেলি খ) টমাস হবস
গ) জন লক ঘ) এ ভি ডাইসি

২। সংবিধানের রক্ষক ও অভিভাবক বলা হয় কাকে?
ক) আইন বিভাগকে খ) বিচার বিভাগকে
গ) রাষ্ট্রপ্রধানকে ঘ) শাসন বিভাগকে

৩। নাগরিকের মৌলিক অধিকার রক্ষা করে কে?
ক) আইন বিভাগ খ) শাসন বিভাগ
গ) বিচার বিভাগ ঘ) দুর্নীতি দমন কমিশন

৪। আইনের শাসনের অর্থ হল–
i. আইনের দৃষ্টিতে সকলে সমান
ii. কাউকে বিনা অপরাধে আটক করা যাবে না
iii. সকলের জন্য একই ধরনের আইন থাকবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. i ও ii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

পাঠ-৯.১১ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা (Independence of Judiciary)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- বিচার বিভাগের স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার উপায় আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	আইনের শাসন, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, বিচার বিভাগের স্বতন্ত্রীকরণ, ন্যায়বিচার।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা

নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা ছাড়া গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা অসম্ভব। আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্যতম পূর্বশত হিসেবে বিচার ব্যবস্থা ও বিচারপতিদের নির্ভীকতা ও নিরপেক্ষতার কথা বলা হয়। নিরপেক্ষ ও নির্ভীক বিচার ব্যবস্থা, নাগরিক স্বাধীনতা, আইনের শাসন তথা গণতন্ত্রের স্বার্থে অপরিহার্য বিবেচিত হয়। ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ করার জন্যও নিরপেক্ষ ও শক্তিশালী বিচার বিভাগ দরকার হয়। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে বোঝায়, বিচার বিভাগ কোন ধরণের রাজনৈতিক, শাসন বিভাগীয় এবং আইন বিভাগীয় হস্তক্ষেপ ছাড়াই ন্যায়বিচার সম্পন্ন করতে পারবে। বিচারকেরা আদালতে উত্থাপিত স্বাক্ষ্য প্রমাণ ও যুক্তির ভিত্তিতে বিরোধের নিষ্পত্তি করবেন।

জেমস কেন্ট বলেন, "বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে বোঝায় এ বিভাগের নিরপেক্ষতা ও অন্য বিভাগের প্রভাব মুক্ত থাকা।"

বিচারপতি আলেকজান্ডার হ্যামিল্টন বলেন, "বিচার বিভাগের স্বাধীনতা হল সরকারের অন্য বিভাগের হস্তক্ষেপমুক্ত হয়ে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে বিচারের রায় ঘোষণা করা।"

হেনরি সিজউইক এর মতে, "সম্পূর্ণরূপে প্রভাবমুক্ত ও স্বাধীন থেকে ন্যায়পরায়ণতা ও সামাজিক বাস্তবতা অনুসারে নিরপেক্ষতার নীতি অনুযায়ী বিচার কাজ সম্পন্ন করাকেই বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলে।"

বস্তুত বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা পরস্পরের পরিপূরক। সরকারের মান যাচাইয়ের অন্যতম পন্থা হল বিচার বিভাগের দক্ষতা ও স্বাধীনতার মূল্যায়ন করা। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিচার বিভাগের স্বাধীনতার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। গণতন্ত্রকে সফল করার জন্য যে সকল পূর্বশর্ত রক্ষা করা প্রয়োজন বিচার বিভাগের স্বাধীনতা তার মধ্যে অন্যতম। কেননা, ব্যক্তিস্বাধীনতা সংরক্ষণ, আইন অমান্যকারীকে শাস্তি প্রদান, সংবিধানের ব্যাখ্যা ও শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষার মত গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো বিচার বিভাগ সম্পন্ন করে তাকে। এ প্রসঙ্গে লর্ড ব্রাইস বলেন, "সরকারের উৎকর্ষতা পরিমাপের জন্য বিচার ব্যবস্থার দক্ষতার চেয়ে উৎকৃষ্টতর কোন মাপকাঠি নেই।"

বিচার বিভাগের স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা

রাজনৈতিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতা রক্ষা তথা সর্বজনের জন্য ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠায় বিচার বিভাগের স্বাধীনতার গুরুত্ব অপরিসীম। নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা ছাড়া ন্যায়বিচার আশা করা যায় না। আবার স্বাধীনতা ছাড়া বিচার বিভাগ নিরপেক্ষভাবে বিচারকার্য সম্পাদন করতে পারে না। বস্তুতপক্ষে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা পরস্পরের পরিপূরক। বিচার বিভাগের উপর আইন বা শাসন বিভাগের কর্তৃত্ব কার্যকর হলে পক্ষপাতহীন ন্যায়বিচার ক্ষুন্ন হতে বাধ্য। তাই ন্যায়সঙ্গত ও নিরপেক্ষ বিচারের স্বার্থে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা অপরিহার্য। বস্তুত: গণতন্ত্রের সাফল্য বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিরপেক্ষতা

ও উৎকর্ষের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। রাষ্ট্রে জনগণের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য একটি নিরপেক্ষ ও স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা থাকা একান্ত প্রয়োজন।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার উপায়

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান পূর্বশর্ত। আইনের শাসন, সংবিধান রক্ষা এবং বাক্ স্বাধীনতাসহ জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারগুলো বিচার বিভাগের স্বাধীনতার উপরে বহুলাংশে নির্ভরশীল। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ছাড়া রাষ্ট্রের সামগ্রিক কল্যাণ সম্ভব নয়। নিম্নে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার উপায় তুলে ধরা হল:

১। **বিচারকদের যোগ্যতা:** সুষ্ঠুভাবে বিচারকার্য সম্পাদনের জন্য উপযুক্ত বিচারপতি একান্তভাবে দরকার। দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে সৎ, সাহসী ও যথার্থ আইনজ্ঞ ব্যক্তিগণ বিচারপতিদের পদে আসীন হলে, ন্যায় বিচারের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। বিচারপতি নিয়োগের ব্যাপারে প্রার্থীদের গুণগত যোগ্যতা সতর্কভাবে বিচার-বিবেচনা করা দরকার। বিচারপতিগণ অবশ্যই বিজ্ঞ, স্বাধীনচেতা ও নিরপেক্ষ হবেন। কোন রকম রাজনৈতিক বিচারে বা দলীয় আনুগত্যের কারণে বিচারপতিদের নিয়োগ করা সমীচীন নয়। এমন নিয়োগ দেয়া হলে ন্যায় বিচারের সম্ভাবনা নস্যাৎ হয়।

২। **বিচারক নিয়োগ:** বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বিচারকদের নিয়োগ পদ্ধতির উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। বিচারপতিদের সাধারণত তিনটি পদ্ধতিতে নিয়োগ করা যায়। (ক) জনগণের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচন (খ) আইনসভা কর্তৃক মনোনয়ন এবং (গ) শাসন বিভাগ কর্তৃক নিয়োগ।

   (ক) জনগণের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে বিচারক নিয়োগের পদ্ধতি বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি অঙ্গরাজ্য এবং সুইজারল্যান্ডের কয়েকটি ক্যান্টনে প্রচলিত আছে।

   (খ) আইনসভার দ্বারাও বিচারক নিয়োগ করা যায়। আইনসভার দ্বারা বিচারক নিয়োগ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি অঙ্গরাজ্যের এবং সুইজারল্যান্ডে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রচলিত আছে।

   (গ) বর্তমানে বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই শাসন বিভাগ কর্তৃক নির্দিষ্ট নিয়মের ভিত্তিতে বিচারক নিয়োগের পদ্ধতিটি প্রচলিত আছে। শাসন বিভাগ কর্তৃক বিচারক নিয়োগের তৃতীয় পদ্ধতিটিই বর্তমানে অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর মতে কাম্য বিবেচিত হয়।

৩। **বিচারকদের কার্যকাল:** বিচারকদের কার্যকালের স্থায়িত্বের উপর বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বিশেষভাবে নির্ভরশীল। কার্যকালের স্থায়িত্ব না থাকলে নিষ্ঠার সাথে বিচারকার্য সম্পাদন করা বিচারকদের পক্ষে সম্ভব হয় না। এছাড়াও বিচারকের কার্যকাল স্বল্পস্থায়ী হলে পদের অপব্যবহারের আশঙ্কা থাকে। বিচারকদের কার্যকাল স্থায়ী হলে তাঁরা নির্ভীক ও নিরপেক্ষভাবে ন্যায়বিচার করতে পারেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচারকরা অক্ষম হয়ে না পড়লে ৭০ বছর বয়স পর্যন্ত পদে বহাল থাকেন। ভারতের সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিরা ৬৫ বছর পর্যন্ত পদে আসীন থাকেন।

৪। **বিচারকদের অপসারণ:** বিচারকদের অপসারণ পদ্ধতির উপরও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নির্ভরশীল। নিয়ম লঙ্ঘন না করেও অপসারণের ভয় বা আশঙ্কা থাকলে বিচারকদের পক্ষে ন্যায়বিচার করা সম্ভব হয় না। তাই কোন বিচারককে যাতে সুনির্দিষ্ট কারণ ছাড়া পদচ্যুত হতে না হয় তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকা দরকার। বিচারপতিদের অপসারণ করার জন্য সাংবিধানিকভাবে বিশেষ বিধান থাকা আবশ্যক। এক্ষেত্রে আইনসভা কর্তৃক অভিশংসন প্রস্তাব (Impeachment motion) এবং সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল এর সুপারিশক্রমে রাষ্ট্রপ্রধানের আদেশে একজন বিচারপতিকে অপসারণ করা যেতে পারে।

৫। **বিচারকগণের বেতন ভাতা ও পদোন্নতি:** বিচার বিভাগের স্বাধীনতার সাথে বিচারকদের বেতন ভাতারও সম্পর্ক আছে। স্বল্প বেতনভোগী বিচারপতিদের দুর্নীতিপরায়ণ হওয়ার আশঙ্কা থাকে। শ্রেষ্ঠ যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিকে বিচারকপদে আকৃষ্ট করার জন্য বিচারপতিদের বেতন পর্যাপ্ত হওয়া দরকার। পর্যাপ্ত বেতন ও ভাতা না দিলে কোন অভিজ্ঞ আইনজীবী বা আইনজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তি বিচারক হিসেবে কাজ করতে রাজি হবেন না। তাছাড়া তাঁদের বেতন ও ভাতা পদমর্যাদা রক্ষার উপযোগী হওয়া বাঞ্ছনীয়। এছাড়াও বিচারকগণ যাতে যোগ্যতার শর্তাদি পূরণের পরেও পদোন্নতি নিয়ে হতাশায় না ভোগেন সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

৬। **বিচার বিভাগের স্বতন্ত্রীকরণ:** বিচার বিভাগের স্বাধীনতার জন্য আইন ও শাসন বিভাগ থেকে তার স্বতন্ত্রীকরণ অপরিহার্য। প্রাচীনকালে রাজা বা রাজকর্মচারীরাই আইন প্রণয়ন, শাসন ও বিচারকার্য সম্পাদন করতেন। আগে শাসনকার্য ও বিচারকার্যের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হত না। এ ব্যবস্থা স্বৈরাচারের সুযোগ করে দেয়। হ্যারল্ড লাস্কির মতানুসারে শাসকের হাতে বিচারের ভার ন্যস্ত থাকলে ন্যায়বিচার পাওয়া যায় না। এ রকম ক্ষেত্রে শাসন বিভাগ সহজেই স্বৈরাচারী হয়ে উঠতে পারে। বাংলাদেশে বিচার বিভাগ ২০০৭ সালের ১ নভেম্বর শাসন বিভাগ থেকে পৃথকীকরণ করা হয়।

৭। **বিচারকদের দৃষ্টিভঙ্গি:** বিচারপতিদের দৃষ্টিভঙ্গি ও শ্রেণিচেতনার উপর বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতা অনেকাংশে নির্ভরশীল। বিচারকদের সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থান, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত প্রেক্ষাপট, রাজনৈতিক চেতনা প্রভৃতির ছাপ তাঁদের পেশাগত দায়িত্বের উপরে পড়তে পারে। এই আশঙ্কা থেকে মুক্ত থাকার জন্য বিচারকরা কি ভাবে পেশাগত দায়িত্ব পালন করবেন তার একটি সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকতে হবে। নির্দেশনা লঙ্ঘিত হলে কি ধরনের শাস্তি হবে তাও সুস্পষ্টভাবে অবহিত করতে হবে।

৮। **জনগণ ও রাজনীতিবিদদের আগ্রহ:** বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য জনগণ এবং রাজনীতিবিদদের আগ্রহ ও ঐকান্তিক ইচ্ছা থাকতে হবে। সত্যিকার অর্থে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনবোধে জনগণকে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে চাপ প্রয়োগ ও আন্দোলন করতে হবে। এর জন্য বিভিন্নভাবে জনমত গড়ে তুলতে হবে।

৯। **জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস:** বিচারবিভাগের প্রতি জনগণের শ্রদ্ধা, আস্থা ও বিশ্বাস অক্ষুন্ন রাখা এবং তা বৃদ্ধি করার দায়িত্ব বিচারকগণেরই। বিচারকরা সৎ ও নিষ্ঠার সাথে কর্তব্য পালন করলে জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করতে পারেন। জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস অটুট থাকলে ক্ষমতাসীন শাসকগণ বিচারকদের অধিকার ও মর্যাদা ক্ষুন্ন হয় এমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সাহসী হবেন না।

পরিশেষে বলা যায় যে, উপরোক্ত বিষয়গুলো অনুসরণ করলে বিচার বিভাগকে স্বাধীন নিরপেক্ষ ও দুর্নীতিমুক্ত রাখা সম্ভব। তবে এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় যে, রাজনৈতিক নেতৃত্বের সুদৃঢ় অবস্থান ব্যতিরেকে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব নয়।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি**) /শিক্ষার্থীর কাজ**	বিচার বিভাগের স্বাধীনতা কিভাবে রক্ষা করা যায়?

সার-সংক্ষেপ

বিচার বিভাগ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার স্বরূপ ও প্রকৃতি নির্ধারণ করে। বিচারকদের দক্ষতা, যোগ্যতা, নিরপেক্ষতা এবং স্বাধীনতার ওপরই বিচার বিভাগের প্রকৃত স্বাধীনতা নির্ভরশীল। প্রকৃত অর্থে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার অর্থ হল কর্তব্য পালনে বিচারকদের স্বাধীনতা। বিচারকগণ যখন রায় প্রদানের ক্ষেত্রে সর্ব প্রকার সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব এবং সরকারি প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত থাকবেন তখনই বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষিত হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.১১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। "বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে বোঝায় এ বিভাগের নিরপেক্ষতা ও অন্য বিভাগের প্রভাবমুক্ত থাকা।"– কথাটি কে বলেছেন?

ক) আলেকজান্ডার হ্যামিল্টন খ) জেমন কেন্ট
গ) হেনরি সিজউইক ঘ) লর্ড ব্রাইস

২। 'সরকারের উৎকর্ষতা পরিমাপের জন্য বিচার ব্যবস্থার দক্ষতার চেয়ে উৎকৃষ্টতর কোন মাপকাঠি নেই।"– কার উক্তি?
ক) সিজউইক খ) আলেকজান্ডার হ্যামিল্টন
গ) জেমস কেন্ট ঘ) লর্ড ব্রাইস

৩। বিচারকদের সাধারনত কয়টি পদ্ধতিতে নিয়োগ করা যায়?
ক) ২ খ) ৩
গ) ৪ ঘ) ৫

৪। কোন দেশের বিচারপতিরা আইনসভার সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হন?
ক) ভারত খ) বাংলাদেশ
গ) বলিভিয়া ঘ) শ্রীলংকা

পাঠ-৯.১২ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি (Separation of Power)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির ধারণা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি, জনগনের স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার, অধিকার, স্বেচ্ছাচারিতা।

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির ধারণা

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির মূল অর্থ সরকারের সমগ্র কাজকে তিন ভাগে বিভক্ত করা এবং তিনটি স্বতন্ত্র বিভাগের সহায়তায় তা পরিচালনা করা। বিভাগগুলো হচ্ছে আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির মূল কথা হচ্ছে সরকারের এ তিনটি বিভাগের ক্ষমতা ও কার্যাবলি হবে আলাদা ও স্বতন্ত্র। প্রত্যেক বিভাগ নিজ-নিজ কার্যক্রমের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকবে। প্রত্যেকটি বিভাগের সংগঠনের প্রকৃতিও হবে স্বতন্ত্র। একটি বিভাগ অন্য কোন বিভাগের কাজের উপর হস্তক্ষেপ করবে না। এ নীতি অনুযায়ী আইন বিভাগ আইন প্রণয়ন করবে। শাসন বিভাগ আইনগুলোকে বাস্তবায়ন করবে এবং বিচার বিভাগ বিচারিক কার্য সম্পাদন করবে ও আইনের ব্যাখ্যা প্রদান করবে। বস্তুত গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার মূল ভিত্তিই হল ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি।

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির ধারণাটি বেশ পুরনো। বিভিন্ন সময়ে বহু রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। এ প্রসঙ্গে ফরাসি চিন্তাবিদ জ্যাঁ বডিন বলেন, "আইন প্রণয়ন ও বিচার বিভাগের ক্ষমতা এক ব্যক্তি বা কয়েকজন ব্যক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হলে তাঁরা কঠোর আইন প্রণয়ন করে তা নির্দয়ভাবে প্রয়োগ করবেন।" তাঁর কথায় একই সাথে বিচারক এবং আইন প্রণেতা হওয়ার অর্থ হচ্ছে ন্যায়বিচারের সাথে ক্ষমতার অধিকার এবং আইনের প্রতি আনুগত্যের সাথে স্বেচ্ছাচারিতার সংমিশ্রণ।"

ইংল্যান্ডের বিখ্যাত চিন্তাবিদ জন লক এ প্রসঙ্গে বলেন, "একই ব্যক্তি আইন রচনা এবং তা প্রয়োগ করলে ব্যক্তি স্বাধীনতা, সম্পত্তির অধিকার এবং নাগরিকদের জীবন বিপন্ন হতে পারে। তাই তিনি অধিকার রক্ষার স্বার্থে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ অপরিহার্য বলে মনে করেন।

ফরাসি রাষ্ট্রবিজ্ঞানী চার্লস মন্টেস্কু তাঁর বিখ্যাত "The Spirit of Laws" গ্রন্থে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনিই ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির মূল প্রবক্তা। তিনি বলেন, "যখন একই ব্যক্তি বা একই শাসক বর্গের হাতে আইন রচনা এবং শাসন করার ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয় তখন জনগনের স্বাধীনতা থাকতে পারে না, অথবা আইন ও শাসন ক্ষমতা যদি বিচার বিভাগ থেকে স্বতন্ত্র না হয় তাহলেও স্বাধীনতা থাকতে পারে না।"

মোট কথা সরকারের এ তিনটি বিভাগ স্বতন্ত্রভাবে কাজ করতে না পারলে স্বাধীনতা রক্ষিত হবে না। তিনটি ক্ষমতা আলাদা না থাকলে তা স্বৈরাশাসনের নামান্তর হবে। স্বাধীনভাবে কাজ করার নামে প্রত্যেকটি বিভাগ আলাদা-আলাদাভাবে স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠা ঠেকানোর জন্য যে নীতি প্রয়োগ করা হয় তার নাম 'নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য' (checks and balance) নীতি। এই নীতি অনুসারে সরকারের যে কোন একটি বিভাগের স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠা ঠেকানোর জন্য অন্য বিভাগের হাতে কিছু আইনগত ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি বলতে কি বোঝেন?

সার-সংক্ষেপ

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির ধারণাটি পুরোনো। মন্টেস্কু তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "The Spirit of Laws" গ্রন্থে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির মূল অর্থ– সরকারের সমগ্র কাজকে তিনভাবে বিভক্ত করা। প্রতিটি বিভাগ স্ব-স্ব ক্ষেত্রে কার্য পরিচালনার জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত। এ নীতি অনুসারে, আইন বিভাগ আইন প্রণয়ন করবে, শাসন বিভাগ আইনকে কার্যকর করবে এবং বিচার বিভাগ উক্ত আইনের ব্যাখ্যা প্রদান করবে। কোন বিভাগ অন্য কোন বিভাগের কাজের উপর হস্তক্ষেপ করবে না। প্রত্যেক বিভাগ স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে কাজ করবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.১২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রবক্তা কে?
ক) জ্যাঁ বডিন খ) জন লক
গ) চালর্স মন্টেস্কু ঘ) টমাস হবস

২। 'The Spirit of Laws' গ্রন্থের লেখক কে?
ক) নিকোলো ম্যাকিয়াভেলি খ) চালর্স মন্টেস্কু
গ) ই এম হোয়াইট ঘ) অ্যালান বল

৩। 'আইন প্রণয়ন ও বিচার বিভাগের ক্ষমতা এক ব্যক্তি বা কয়েকজন ব্যক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হলে তারা কঠোর আইন প্রণয়ন করে তা নির্দয়ভাবে প্রয়োগ করবেন।" –উক্তিটি কার?
ক) জ্যাঁ বডিন খ) জন লক
গ) চালর্স মন্টেস্কু ঘ) এফ আই গ্লাউড

৪। মন্টেস্কু কোন দেশের অধিবাসী?
ক) ইতালি খ) জাপান
গ) স্পেন ঘ) ফ্রান্স

পাঠ-৯.১৩ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির সুবিধা ও অসুবিধা
(Merits and Demerits of Separation of Power)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির সুবিধা বলতে পারবেন।
- ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির অসুবিধা বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	দক্ষতা বৃদ্ধি, ব্যক্তি অধিকার, ভারসাম্য নীতি, নাগরিক চেতনা, সংঘাত ও বিপ্লব, সংসদীয় ব্যবস্থা।

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির সুবিধা

সরকারের তিনটি বিভাগ আলাদাভাবে কার্য সম্পাদন করলে সরকারি কাজে গতিশীলতা আসে। এছাড়াও এই নীতির প্রয়োগ হলে একজন বা কয়েকজন ব্যক্তির স্বেচ্ছাচারের ঝুঁকি কমে। নিম্নে ক্ষমতা-স্বতন্ত্রীকরণ নীতির সুবিধা আলোচনা করা হল:

১। **গতিশীলতা বৃদ্ধি:** ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এ নীতি বাস্তবায়ন হলে প্রতিটি বিভাগ আলাদাভাবে কাজ করবে। কাজের পরিধি জানা থাকলে কাজগুলো দ্রুততার সাথে সম্পাদন করা সম্ভব। আর কোন বিভাগ যদি অন্য কোন বিভাগের কাজে হস্তক্ষেপ না করে সেক্ষেত্রে কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে।

২। **স্বেচ্ছাচারিতা রোধ:** সরকারের তিনটি বিভাগের সকল ক্ষমতা যদি একজন ব্যক্তি বা কয়েকজন ব্যক্তির হাতে থাকে তাহলে সে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ প্রচন্ড ক্ষমতাশালী হয়ে যায়। জেরেমি বেন্থাম এ প্রসঙ্গে বলেন, "যখন আইন বিভাগ, শাসন বিভাগের সাথে সংযুক্ত হয়ে কাজ করবে তখন জনগণের স্বাধীনতা থাকবে না, কারণ তখন আইন বিভাগ এমনভাবে আইন প্রণয়ন করে শাসন করবে যা হবে স্বৈরাচারী"। সরকারের এহেন স্বৈরাচার বা স্বেচ্ছাচারিতা রোধে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির গুরুত্ব রয়েছে।

৩। **ব্যক্তি অধিকার রক্ষা:** ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির আরেকটি সুবিধা হল এর মাধ্যমে ব্যক্তি অধিকার রক্ষা পায়। কোন শাসক যদি নিজেই আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করে থাকেন সেক্ষেত্রে নাগরিকের অধিকার খর্ব হওয়ার আশঙ্কা থাকে। কেননা সে শাসক নাগরিকের অধিকারের কথা না ভেবে নিজের ক্ষমতাকে কিভাবে আরো বেশি শক্তিশালী করা যায় সে বিষয়ে চিন্তা করেন। তাই ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির মাধ্যমে নাগরিক অধিকার রক্ষা পায়।

৪। **বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষা:** ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির মাধ্যমে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষা করা সম্ভব। আইন বিভাগ কিংবা শাসন বিভাগ যদি বিচার বিভাগের কাজের উপর হস্তক্ষেপ করে তাহলে বিচার বিভাগ স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে বিচারিক কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সমাধান করতে পারবে না। সে ক্ষেত্রে আইনের শাসন (Rule of Law) বাধাগ্রস্থ হবে। তাই বিচার বিভাগ স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে কাজ করার জন্য ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়।

৫। **বিশেষজ্ঞ সৃষ্টি:** ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির ফলে সরকারের তিনটি বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা তাদের কাজে দক্ষতা অর্জন করার মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠে। কেননা এ সমস্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা দীর্ঘদিন একই ধরনের কাজ করে থাকে। ফলে তাঁরা নিজ নিজ কাজে বিশেষজ্ঞ হয়ে যায়।

পরিশেষে বলা যায়, শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির সুবিধা ও গুরুত্ব অপরিসীম। তবে সরকারের কোন একটি বিভাগ যাতে অন্য দুই বিভাগ থেকে বেশি ক্ষমতাশালী না হয়ে যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির অসুবিধা

গণতান্ত্রিক সরকারের দক্ষতা বৃদ্ধি ও ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার জন্য ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির কার্যকারিতা অপরিহার্য হলেও এর আক্ষরিক বাস্তবায়ন সম্ভব ও কাঙ্খিত নয় বলেও অনেকে মনে করেন। ম্যাকাইভার বলেন, "মন্টেস্কু যে চরম ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের কথা বলেছেন তা অসম্ভব।" নিম্নে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির অসুবিধা আলোচনা করা হল:

১। **সরকার অখন্ড ও অবিচ্ছেদ্য:** সরকার একটি অখন্ড ও অবিচ্ছেদ্য সংগঠন, তাই একে সম্পূর্ণ আলাদা করা সম্ভব নয়। সরকারের তিনটি বিভাগ নানাবিধ বাস্তব কারণে একে অপরের সাথে সম্পৃক্ত থাকে। এই বিভাগগুলো একে অপর থেকে আলাদা হয়ে পড়লে সরকার পরিচালনা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। বস্তত: অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ যদি পরিপূর্ণ রূপে কার্যকর করা হয় তাহলে সংবিধানই অকার্যকর হয়ে পড়বে।

২। **শাসনযন্ত্রের অচলাবস্থা:** ক্ষমতার পূর্ণ স্বতন্ত্রীকরণ হলে এক বিভাগ অন্য কোন বিভাগের কাজে সহযোগিতা না করে নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী বিভাগীয় দায়িত্ব পালন করার ঝুঁকি থাকে। অধ্যাপক হ্যারল্ড লাস্কি এ প্রসঙ্গে বলেন, "সরকারের তিনটি বিভাগকে স্বতন্ত্র ও পৃথক করা হলে প্রতিটি বিভাগই তার দায়িত্ব এড়িয়ে অন্য বিভাগের উপর চাপানোর চেষ্টা করবে।" এর ফলে শাসনযন্ত্রের অচলাবস্থার সৃষ্টি হতে পারে।

৩। **রাষ্ট্র নিষ্প্রান:** রাষ্ট্র হচ্ছে মানুষের মত একটি জৈবিক প্রক্রিয়া। জে সি ব্লুন্টসলি তাই বলেন, "দেহ থেকে মস্তককে আলাদা করলে যেমন মানুষের প্রাণহানি ঘটে, তেমনি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করলে রাষ্ট্র নিষ্প্রান হয়ে পড়ে।" অর্থাৎ সরকারকে পুরোপুরি বিভাজন করলে সরকারের মূল বৈশিষ্ট্য বিলুপ্ত হয়ে যাবে। আর এর ফলে রাষ্ট্র নিষ্প্রাণ হয়ে পড়বে।

৪। **অপূর্ণাঙ্গ প্রয়োগ:** পৃথিবীর কোন রাষ্ট্রেই এখন পর্যন্ত ক্ষমতার পূর্ণ স্বতন্ত্রীকরণ কার্যকর হয়নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি প্রবর্তিত হলেও, সেখানে এটি পুরোপুরি কার্যকর হয়নি। সেখানে নিয়ন্ত্রন ও ভারসাম্যের নীতি প্রয়োগ হওয়ার ফলে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির পূর্ণ প্রয়োগ সম্ভব হয় নি।

৫। **দায়িত্বশীলতা বিলুপ্ত:** সরকারের তিন বিভাগ যদি স্বতন্ত্রভাবে কাজ করে এবং সর্বদা নিজেদের পরিধির মধ্যে অবস্থান করে, তাহলে তাদের দায়িত্বশীলতা বিলুপ্ত হবে, পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা বিনষ্ট হবে। এর ফলে শাসনকার্যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে।

৬। **শাসনকার্যের মান অবনত:** ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির ফলে শাসনকার্যের মান কমে যেতে পারে। আইন বিভাগ যদি কেবল নিজেদের ইচ্ছামাফিক আইন প্রণয়ন করে, সেক্ষেত্রে শাসন বিভাগের ক্ষমতা হ্রাস পায়। শাসন বিভাগের কাজ হল আইন বিভাগ থেকে প্রণীত আইন সমূহকে বাস্তবায়ন করা। শাসন বিভাগ যদি আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে অর্থপূর্ণ ভূমিকা রাখতে না পারে, সেক্ষেত্রে শাসন কার্যের মান অবনত হবে।

৭। **সংসদীয় ব্যবস্থার অনুপযোগী:** সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় সরকারের আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিরাজ করে। একজন মন্ত্রী যেমন শাসন বিভাগের সাথে সম্পর্কিত তেমনি আবার আইনসভার ও সদস্য। তাই সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি অনুপযোগী।

৮। **অনৈক্যের সৃষ্টি:** ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি পূর্ণ বাস্তবায়ন হলে প্রত্যেক বিভাগ নিঃসঙ্গ হয়ে পড়বে। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক ম্যাকাইভার বলেন, "ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতিকে কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হলে সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা ও অনৈক্যের সৃষ্টি হবে।"

পরিশেষে বলা যায়, ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির নানাবিধ অসুবিধা থাকলেও, গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার জন্য এই নীতির প্রয়োগ কাম্য, তবে স্বতন্ত্রীকরণের নামে যাতে নিয়ন্ত্রণহীন স্বেচ্ছাচারিতার নীতি প্রতিষ্ঠা না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি**) /শিক্ষার্থীর কাজ**	ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির পূর্ণ বাস্তবায়ন সম্ভব নয় কেন?

সার-সংক্ষেপ

ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রয়োজন বিচার বিভাগের স্বাধীনতা। আর ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের মাধ্যমেই বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষা পায়। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি চালু থাকলে, সরকারের একটি বিভাগের উপর আরেকটি বিভাগের হস্তক্ষেপের ঝুঁকি কমে যায়। তবে সরকারের কোন বিভাগ এককভাবে কাজ করলে সরকারের কাজের গতিশীলতা হ্রাস পায় এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগটির স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষা থাকে। বস্তুত: সারা বিশ্বের কোন রাষ্ট্রেই পূর্ণ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি বাস্তবায়ন করা যায় নি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.১৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ দ্বারা কোনটির স্বাধীনতা রক্ষা সম্ভব ?

ক) বিচার বিভাগ খ) প্রতিরক্ষা বিভাগ

গ) আইন বিভাগ ঘ) পররাষ্ট্র বিভাগ

২। "সরকারের তিনটি বিভাগকে স্বতন্ত্র ও পৃথক করা হলে প্রতিটি বিভাগই তার দায়িত্ব এড়িয়ে অন্য বিভাগের উপর চাপানোর চেষ্টা করবে।"– উক্তিটি কে করেছেন?

ক) টমাস হবস খ) জাঁ জাঁক রুশো

গ) হ্যারল্ড লাস্কি ঘ) জন লক

৩। মন্টেস্কুর ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি দ্বারা প্রভাবিত হন কোন দেশের সংবিধান প্রণেতারা?

ক) বাংলাদেশ খ) ভারত

গ) যুক্তরাষ্ট্র ঘ) ফ্রান্স

পাঠ-৯.১৪ ক্ষমতা ভারসাম্য নীতি (Principles of Checks and Balances)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- ক্ষমতার ভারসাম্য নীতি পর্যালোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	ব্যক্তিস্বাধীনতা, ভেটো, সুপ্রীম কোর্ট, নিয়ন্ত্রণ।

ক্ষমতা ভারসাম্য নীতি

সরকারের সুষ্ঠু কার্যক্রমের জন্য ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রয়োগ অনস্বীকার্য। আবার এই নীতির আক্ষরিক অনুশীলন, সরকারের তিনটি বিভাগকে স্বেচ্ছাচারী করে তোলার ঝুঁকি তৈরি করে। এই ঝুঁকি বিবেচনায় রেখে যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান প্রণেতারা সরকারের বিভাগগুলোর স্বৈরাচারী প্রবণতা রোধ, পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণ সংরক্ষণ এবং পারস্পরিক ভারসাম্য বজায় রাখার ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছিলেন। এ উদ্দেশ্য সামনে রেখেই নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতি প্রবর্তিত হয়। মার্কিন সংবিধানের বিভিন্ন অংশে নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতির উল্লেখ প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতি আলোচনা করা হল–

১। **আইন বিভাগের উপর নিয়ন্ত্রণ:** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আইন সভা অর্থাৎ কংগ্রেসের কার্যাবলি উপর নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতির প্রয়োগ করা হয়েছে। সংবিধান মোতাবেক মার্কিন রাষ্ট্রপ্রধান কংগ্রেসের অধিবেশন আহবান করতে পারেন। আইন প্রণয়নের যাবতীয় ক্ষমতা কংগ্রেসের হাতে ন্যস্ত আছে। কিন্তু রাষ্ট্রপ্রধান আইন প্রণয়নের অনুরোধ সম্বলিত বাণী কংগ্রেসে পাঠাতে পারেন। রাষ্ট্রপ্রধান এই বাণী কংগ্রেসকে আলোচনা করতে হয়। তবে কংগ্রেস রাষ্ট্রপ্রধানের বানীর বিষয়বস্তু প্রত্যাখান করতে পারে। আবার রাষ্ট্রপ্রধান স্বাক্ষর ছাড়া কংগ্রেস কর্তৃক পাস করা বিল আইনে পরিণত হয় না। কংগ্রেসে পাস হওয়া বিলকে 'ভেটো' প্রয়োগ করে রাষ্ট্রপ্রধান আটকে দিতে পারেন। আবার কংগ্রেস কর্তৃক প্রণীত আইনের বৈধতা বিচার করে দেখার ক্ষমতা আদালতের হাতে দেয়া আছে। বিচার্য আইনটি সংবিধান বিরোধী হলে আদালত অসাংবিধানিকতার দায়ে তা বাতিল করে দিতে পারে।

২। **শাসন বিভাগের উপর নিয়ন্ত্রণ:** মার্কিন শাসন বিভাগের চূড়ান্ত ক্ষমতা রাষ্ট্রপ্রধানের উপর ন্যস্ত আছে। রাষ্ট্রপ্রধান কিন্তু কংগ্রেস ও সুপ্রীম কোর্টের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত নন। রাষ্ট্রপ্রধানের কার্যকাল চার বছর কিন্তু এই মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই কংগ্রেস রাষ্ট্রপতিকে সুনির্দিষ্ট অভিযোগে নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে অভিশংসনের মাধ্যমে পদচ্যুত করতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শাসনকার্য পরিচালনার জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ দরকার হয় কিন্তু কংগ্রেস অনুমোদন না করলে সরকারি তহবিল থেকে অর্থ ব্যয়, কোন কর আরোপ বা বিলোপ করা যায় না। আইন প্রণয়নের ব্যাপারে যাবতীয় ক্ষমতা কংগ্রেসের হাতেই ন্যস্ত আছে।

৩। **বিচার বিভাগের উপর নিয়ন্ত্রণ:** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগও অন্য দুটি বিভাগের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত নয়। রাষ্ট্রপতি সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের নিযুক্ত করেন। এই নিযুক্তি সিনেটের অনুমোদন সাপেক্ষ। এই নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিচার বিবেচনার প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না। আবার কংগ্রেস সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতির সংখ্যা নির্ধারণ করতে পারে। তাছাড়া কংগ্রেস সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিষয়ক ক্ষমতা, জাতীয় আদালতসমূহের এখতিয়ার, বিভিন্ন অধঃস্তন জাতীয় আদালত গঠন ও বিলোপ প্রভৃতি বিষয়ে ক্ষমতা ভোগ করে। সর্বোপরি বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্ত রোধ এবং বিধি-নিষেধ আরোপের উদ্দেশ্যে কংগ্রেস আইন প্রণয়ন করতে পারে।

পরিশেষে বলা যায় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে যুগপৎ 'ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ' ও 'ক্ষমতা ভারসাম্যের' নীতিকে বিশেষ গুরুত্বসহকারে অনুসরণ করা হয়েছে। এর ফলে সরকারের তিনটি বিভাগের প্রত্যেকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে, আবার স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠা থেকে বিরত থাকে। এছাড়া এই দুই নীতির প্রয়োগের ফলে কোন বিভাগ এককভাবে প্রভাবশালী হওয়ার পরিবর্তে প্রত্যেক বিভাগের মধ্যে ভারসাম্য বিরাজ করে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	বাংলাদেশে কি ক্ষমতার ভারসাম্য নীতি'র প্রয়োগ রয়েছে?

সার-সংক্ষেপ

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি অনুযায়ী সরকারের তিনটি বিভাগ সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ করা হলে সরকারের বিভাগগুলো স্বৈরাচারী হয়ে উঠে। বাস্তবে এরূপ পৃথকীকরণ সম্ভব নয়। কেননা, সরকারের এক বিভাগের কাজের সাথে অন্য বিভাগের কাজের সম্পর্ক ও সহযোগিতা বিদ্যমান। সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য রক্ষার ব্যবস্থাকে ক্ষমতার ভারসাম্য নীতি বলা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে এরূপ ক্ষমতা ভারসাম্য নীতি কার্যকর রয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.১৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। 'ক্ষমতার ভারসাম্য নীতি' কোন দেশে বিদ্যমান?

ক) যুক্তরাষ্ট্র খ) ব্রিটেন
গ) কানাডা ঘ) ইতালি

২। মার্কিন আইনসভার নাম কি?

ক) পার্লামেন্ট খ) কংগ্রেস
গ) লোকসভা ঘ) নেসেট

৩। কংগ্রেস প্রনীত বিলকে 'ভেটো' প্রয়োগ করতে পারে কে?

ক) স্পিকার খ) নির্বাচনী সংস্থা
গ) প্রতিরক্ষামন্ত্রী ঘ) রাষ্ট্রপ্রধান

পাঠ-৯.১৫ বাংলাদেশে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি (Separation of Power in Bangladesh)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- বাংলাদেশে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	সংবিধান, মন্ত্রিপরিষদ, সংসদীয় সরকার, প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল, জুডিশিয়াল কাউন্সিল।

বাংলাদেশে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি

বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। বাংলাদেশে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার প্রচলিত থাকায় এখানে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি পুরোপুরিভাবে গৃহীত হয়নি। বাংলাদেশ সংবিধানে উল্লেখ আছে আইন বিভাগ আইন প্রণয়ন করবে, শাসন বিভাগ শাসন কার্য পরিচালনা করবে এবং বিচার বিভাগ আইনের ব্যাখ্যা ও বিচার কার্য পরিচালনা করবে। তবে এ বিভাগগুলোর মধ্যে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক বিদ্যমান। ১৯৯১ সালে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনের মাধ্যমে বাংলাদেশে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। এখানে আইনসভার সদস্যগণ মন্ত্রিসভা বা শাসন বিভাগেরও সদস্য। প্রধানমন্ত্রী হলেন সরকার প্রধান ও প্রকৃত নির্বাহী কর্তা। প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীই প্রয়োগ করেন। আবার তিনি জাতীয় সংসদেরও নেতা। সংসদীয় ব্যবস্থাধীন অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের মধ্যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। বাংলাদেশে বিচার বিভাগ ২০০৭ সালে পুর্নগঠিত হলেও তা এখনও পূর্নাঙ্গ স্বাধীনতা লাভ করতে পারেনি। কেননা, বাংলাদেশে প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ এখনও কিছু কিছু বিচার বিভাগীয় দায়িত্ব পালন করে থাকেন। এছাড়া রয়েছে প্রশাসনিক আইন, প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল, সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল প্রভৃতি।

বাংলাদেশে শাসন বিভাগ তার কাজের জন্য আইন বিভাগের নিকট দায়ী থাকেন। আইন বিভাগের আস্থা হারালে মন্ত্রিসভার পতন ঘটে। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে নিয়োগ দেন। আবার বিচার বিভাগ আইন বিভাগ কর্তৃক প্রণীত আইনকে বাতিল করতে পারে না; কেবল সংবিধান বিরোধী বা অবৈধ বলে ঘোষণা করতে পারে।

উপরোক্ত বাস্তবতায় বলা যায় যে, বাংলাদেশে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির তাত্ত্বিক প্রয়োগ নেই। অবশ্য শুধু বাংলাদেশে নয়, সংসদীয় ব্যবস্থাধীন কোন দেশেই এই নীতির পূর্ণ প্রয়োগ সম্ভব নয়।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি**) /শিক্ষার্থীর কাজ**	বাংলাদেশে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রয়োগ মূল্যায়ন করুন।

সার-সংক্ষেপ

বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক সরকার বিদ্যমান। সংসদীয় ব্যবস্থা প্রচলিত থাকায় তাত্ত্বিক অর্থে বাংলাদেশে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি কার্যকর নয়। বাংলাদেশ সংবিধান অনুযায়ী, আইন বিভাগ আইন প্রণয়ন করবে, শাসন বিভাগ আইনকে কার্যকর করবে এবং বিচার বিভাগ বিচারিক কার্য সম্পাদন করবে। তবে এ বিভাগগুলোর মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগিতামূলক সম্পর্ক বিদ্যমান। বাংলাদেশের আইনবিভাগ তার কাজের জন্য জনগণের নিকট দায়ী থাকে। শাসন বিভাগ তার কাজের জন্য আইন বিভাগের নিকট দায়বদ্ধ থাকে। আবার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে রাষ্ট্রপ্রধান নিয়োগ দান করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.১৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলাদেশ সংবিধানের কততম সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তিত হয়?
ক) দশম খ) একাদশ
গ) দ্বাদশ ঘ) ত্রয়োদশ

২। সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী কত সালে হয়েছিল?
ক) ১৯৯০ খ) ১৯৯১
গ) ১৯৯২ ঘ) ১৯৯৩

৩। বাংলাদেশের বিচার বিভাগ কত সালে স্বাধীন হয়?
ক) ২০০৩ খ) ২০০৫
গ) ২০০৭ ঘ) ২০০৯

৪। বাংলাদেশের সুপ্রীমকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে নিযুক্ত করেন কে?
ক) স্পীকার খ) প্রধানমন্ত্রী
গ) মন্ত্রীসভা ঘ) রাষ্ট্রপ্রধান

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১নং ও ২নং প্রশ্নের উত্তর দিন

শামসুল করিম বাংলাদেশের নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, ব্যক্তি স্বাধীনতা সংরক্ষণ প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত। তিনি বাংলাদেশের যে বিভাগে কাজ করেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সেই বিভাগই ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য রক্ষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে থাকে।

১। শামসুল করিম বাংলাদেশের কোন বিভাগে কাজ করেন?
ক) আইন বিভাগ খ) শাসন বিভাগ
গ) বিচার বিভাগ ঘ) প্রতিরক্ষা বিভাগ

২। "ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতি" বাস্তবায়িত হলে শামসুল করিম কি অর্জনে সক্ষম হবে?
ক) পূর্ণক্ষমতা খ) যথার্থ স্বাধীনতা
গ) অন্য বিভাগের উপর নিয়ন্ত্রণ ঘ) ভারসাম্য রক্ষার অধিকার

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩নং ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দিন

ক্ষমতার ভারসাম্য নীতি অনুযায়ী সরকারের প্রতিটি বিভাগ স্বাধীন হলেও, এদের প্রত্যেকে অন্যের স্বেচ্ছাচারিতায় বাধা দিতে পারে। এর ফলে কোন বিভাগ অতিমাত্রায় ক্ষমতাশালী হতে পারে না।

৩। নিচের কোন দেশে এরূপ ব্যবস্থা বিদ্যমান–
ক) বাংলাদেশ খ) ভারত
গ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঘ) ব্রিটেন

৪। এ ব্যবস্থার ভিত্তি কি?
ক) আইনের শাসন খ) বিচার বিভাগের স্বাধীনতা
গ) নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য ঘ) শাসন বিভাগের প্রাধান্য

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৫নং ও ৬নং প্রশ্নের উত্তর দিন

'ক' রাষ্ট্রে আইনের শাসন, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এবং সরকারের জবাবদিহিতা সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান। অপরদিকে 'খ' রাষ্ট্রের জনগণ এসব প্রতিষ্ঠার জন্য দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের পর 'খ' রাষ্ট্রে গণতন্ত্র চালু হলেও আইনসভার নিকট শাসন বিভাগের জবাবদিহিতা নেই।

৫। 'ক' রাষ্ট্রে কোন ধরনের সরকার বিদ্যমান?

ক) এককেন্দ্রিক খ) যুক্তরাষ্ট্রীয়

গ) সংসদীয় ঘ) রাষ্ট্রপতি শাসিত

৬। উদ্দীপকে বর্ণিত 'খ' রাষ্ট্রে সরকারের যে বিভাগের বৃদ্ধি পাচ্ছে, তা হল–

ক) আইন বিভাগ খ) শাসন বিভাগ

গ) বিচার বিভাগ ঘ) নির্বাচকমন্ডলী

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৭নং ও ৮নং প্রশ্নের উত্তর দিন

আজাদুল ইসলাম একজন সরকারি কর্মকর্তা। তিনি দুই বছর পূর্বে একখন্ড জমি ক্রয় করেন। কিন্তু এলাকার কতিপয় প্রভাবশালীর কারণে তিনি জমি দখল নিতে পারছেন না। কোন উপায় খুঁজে না পেয়ে আজাদুল ইসলাম আদালতের শরণাপন্ন হলেন।

৭। আজাদুল ইসলাম কোন আদালতের শরণাপন্ন হলেন?

ক) নিম্নস্তরের আদালত খ) মধ্যস্তরের আদালত

গ) উচ্চস্তরের আদালত ঘ) গ্রাম আদালত

৮। উক্ত আদালত যেসবের সমন্বয়ে গঠিত হয়–

i. ফৌজদারী আদালত ii. উচ্চ আদালত iii. দেওয়ানী আদালত

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন

'ক' রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান জনগনের ভোটে নির্বাচিত হন। রাষ্ট্র পরিচালনায় তিনি অসীম ক্ষমতার অধিকারী। তিনি আইনসভার নিকট জবাবদিহি করেন না। তাঁর মন্ত্রীসভার সদস্যদের তিনি নিজের ইচ্ছানুযায়ী বরখাস্ত করেন।

(ক) সরকার কি?

(খ) বিচার বিভাগ বলতে কি বোঝায়?

(গ) 'ক' রাষ্ট্রে কোন ধরনের সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান? ব্যাখ্যা করুন।

(ঘ) 'ক' রাষ্ট্রে বিদ্যমান সরকার পদ্ধতিকে আপনি কি উত্তম বলে মনে করেন? যুক্তি দেখান।

২। 'ক' রাষ্ট্র শাসন বিভাগ আইনসভার নিকট তার কাজের জবাবদিহি করে এবং একটি কেন্দ্র থেকে সারা দেশ শাসিত হয়। এর রাষ্ট্রপ্রধান জনগনের পরোক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। অন্যদিকে 'খ' রাষ্ট্রে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে সাংবিধানিক উপায়ে ক্ষমতা হস্তান্তর করে দেওয়া আছে। এর রাষ্ট্রপ্রধান জনগনের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন।

(ক) সরকারের অঙ্গ কয়টি ও কি কি?

(খ) আইনসভার দুটি কাজ লিখুন।

(গ) উদ্দীপকে উল্লিখিত দুই দেশের মধ্যে যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় তা ব্যাখ্যা করুন।

(ঘ) 'ক' রাষ্ট্রের সরকার ব্যবস্থা 'খ' রাষ্ট্রের সরকার ব্যবস্থা থেকে উত্তম। বিশ্লেষণ করুন।

৩। ক ও খ পড়াশুনার উদ্দেশ্যে ব্রিটেনে অবস্থান করছে। সেখানকার রাষ্ট্র পরিচালনা ব্যবস্থা তাদেরকে অভিভূত করে। ক এর দেশে সরকারের বিভাগগুলো স্বাধীন ও স্বতন্ত্র হলেও, খ এর দেশের প্রধান নির্বাহী আইন বিভাগ এমনকি বিচার বিভাগের উপরও প্রভাব বিস্তার করে।

(ক) বাংলাদেশের আইনসভার নাম কি?
(খ) বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা বলতে কী বুঝায়?
(গ) ক এর দেশে সরকারের বিভাগগুলো স্বাধীন ও স্বতন্ত্র হলেও কখনই জনস্বার্থের বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় না- আলোচনা করুন।
(ঘ) 'খ' এর দেশের প্রধান নির্বাহী এরূপ ক্ষমতা চর্চা অগণতান্ত্রিক-মূল্যায়ন করুন।

৪। ডেভিড টেইলর 'ক' রাষ্ট্রের ও উইল স্মিথ 'খ' রাষ্ট্রে বসবাস করে। ডেভিডের রাষ্ট্রের সরকার জনগনের ভোটে নির্বাচিত হন। উক্ত রাষ্ট্রের সরকার প্রধান ও মন্ত্রীসভার সদস্যগণ আইনসভার নিকট জবাবদিহি করেন না। অপর দিকে উইলের রাষ্ট্রের সরকার জনগণের ভোটে নির্বাচিত হন এবং সরকার প্রধান ও মন্ত্রীসভার সদস্যগণ তাদের কাজের জন্য আইনসভার কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য।

(ক) সরকার কাকে বলে?
(খ) শাসন বিভাগের দুটি কাজ লিখুন।
(গ) উদ্দীপকের আলোকে 'ক' রাষ্ট্রের সরকারের সাথে 'খ' রাষ্ট্রের সরকারের পার্থক্য উল্লেখ করুন।
(ঘ) ডেভিড ও উইলের দেশের দুটি সরকার ব্যবস্থার মধ্যে বাংলাদেশের জন্য আপনি কোন ধরনের সরকার ব্যবস্থাকে উত্তম বলে মনে করেন?

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.১ ঃ ১। খ ২। গ ৩। ক ৪। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.২ ঃ ১। ক ২। খ ৩। ক ৪। গ ৫। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৩ ঃ ১। গ ২। ক ৩। ক ৪। ঘ ৫। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৪ ঃ ১। ক ২। গ ৩। গ ৪। ক ৫। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৫ ঃ ১। খ ২। ক ৩। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৬ ঃ ১। খ ২। গ ৩। ক ৪। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৭ ঃ ১। ক ২। খ ৩। গ ৪। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৮ ঃ ১। খ ২। খ ৩। গ ৪। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৯ ঃ ১। ক ২। খ ৩। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.১০ ঃ ১। ঘ ২। খ ৩। গ ৪। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.১১ ঃ ১। খ ২। ঘ ৩। খ ৪। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.১২ ঃ ১। গ ২। খ ৩। ক ৪। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.১৩ ঃ ১। ক ২। গ ৩। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.১৪ ঃ ১। ক ২। খ ৩। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.১৫ ঃ ১। গ ২। খ ৩। গ ৪। ঘ
চূড়ান্ত মূল্যায়ন ঃ ১। গ ২। খ ৩। গ ৪। গ ৫। গ ৬। খ ৭। ক ৮। খ

জনমত ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি
(Public Opinion and Political Culture)

ইউনিট ১০

জনমত এবং গণতন্ত্র প্রায় সমার্থক। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় জনমতের ভিত্তিতেই সরকার পরিচালিত হয়। তবে সে জনমত কতটা গঠনমূলক ও কার্যকরী হবে এবং সরকার তার কতটুকু গ্রহণ করবে তা নির্ভর করে একটি দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির উপর। রাজনৈতিক সংস্কৃতি দীর্ঘ দিনের চর্চার মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয়। রাজনৈতিক চর্চার ধারা অনুযায়ী রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। সরকার কর্তৃক জনমত গ্রহণের ক্ষমতা রাজনৈতিক সংস্কৃতিভেদে ভিন্ন হয়ে থাকে। এ ইউনিটে জনমত, জনমতের বৈশিষ্ট্য, বাহন ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-১০.১ ঃ জনমতের ধারণা ও বৈশিষ্ট্য পাঠ-১০.২ ঃ জনমত গঠনের মাধ্যমসমূহ	পাঠ-১০.৩ ঃ জনমতের গুরুত্ব পাঠ-১০.৪ ঃ রাজনৈতিক সংস্কৃতির ধারণা ও বৈশিষ্ট্য

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ**

পাঠ-১০.১ জনমতের ধারণা ও বৈশিষ্ট্য
(Concept and Characteristics of Public Opinion)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- জনমত কি বুঝতে পারবেন।
- জনমতের সংজ্ঞা জানতে পারবেন।
- জনমতের বৈশিষ্ট্য নিরুপণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	জনমত, সংগঠিত, যুক্তিসংগত

জনমত

জনমত আধুনিক ও গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রাণস্বরূপ। আক্ষরিক অর্থে জনগণের মতামতই হল জনমত। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানে জনমত বলতে জনগণের সমষ্টিগত, সুসংগঠিত ও যুক্তিযুক্ত মতামতকেই বুঝায়। এই জনমতের প্রকাশ বিভিন্নভাবে ঘটতে পারে। বস্তুত: সরকার ও রাজনীতির ব্যাপারে জনসাধারণের সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গী বা বিশ্বাসই হচ্ছে জনমত। এই জনমতের নিরীখেই একটি গণতান্ত্রিক সরকারকে তার কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ, শিক্ষা ব্যবস্থা, রাজনৈতিক দলের কর্মকান্ড, সংবাদ মাধ্যম, সোশ্যাল মিডিয়া বর্তমান সময়ে জনমত গঠনে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill) এর ভাষায় "কোনো সুনির্দিষ্ট জাতীয় সমস্যার ওপর জনগণের সংগঠিত মতামতই হল জনমত"।

মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ভি ও কিই (V. O. Key) বলেন- "ব্যক্তিবর্গের মতই জনমত হিসেবে গণ্য হয়। এগুলোর গুরুত্ব স্বীকার করে নেয়াটা সরকার যুক্তিযুক্ত বলে মনে করে"।

মরিস জিন্সবার্গ (Morris Ginsberg) বলেন "জনমত হল বিভিন্ন জনের মতামতের পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়ার ফলে সৃষ্ট এক সামাজিক ফসল"।

জনমত প্রত্যয়টির ব্যবহার প্রথম কোথায় কিভাবে তা সঠিকভাবে বলা মুশকিল। তবে অনেক বিশেষজ্ঞই মনে করেন যে, শাসনকারী কর্তৃপক্ষের কর্মকান্ডের ব্যাপারে রাষ্ট্রের নাগরিকদের জনমত থাকাটা একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। সংগঠিত জনমত প্রথমত বিভিন্ন স্বৈরাচারী শাসকের বিরুদ্ধেই গঠিত হয়েছিল। এই জনমতের ভিত্তিতেই রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়েছে বলে অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মনে করে। যেমন টি এইচ গ্রীন বলেন, "পাশবিক শক্তি নয়, ইচ্ছাই রাষ্ট্রের ভিত্তি"। ফরাসি রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জাঁ জাঁক রুশো তার বিখ্যাত গ্রন্থ, দ্য সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট গ্রন্থে জনমত শব্দটির রাজনৈতিক ব্যবহার করেন। একে তিনি সাধারণ ইচ্ছা (General Will) হিসেবে অভিহিত করেন। এটি সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের কল্যাণের ইচ্ছা বা মতামতের প্রকাশ। রুশোর আগে ইংরেজ দার্শনিক জন লক, পরবর্তীতে জন স্টুয়ার্ট মিল, লর্ড ব্রাইস, আর জে গেটেল, ইয়ুর্গেন হেবারমাসের মতো রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা জনমত শব্দটির রাজনৈতিক উৎপত্তি ও প্রয়োগ বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। জনমত সৃষ্টির জন্য নির্দিষ্ট পরিবেশ পরিস্থিতি প্রয়োজন হয়। জনমত প্রকাশের ধরণও রাষ্ট্র ও সমাজভেদে ভিন্ন হতে পারে।

জনমতের বৈশিষ্ট্য

উল্লেখিত সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে জনমতের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য প্রতীয়মান হয়।

ক. জনমত হচ্ছে কোন একটি সরকারি বা রাজনৈতিক বিষয়ে জনগণের সমন্বিত মতামত। বিক্ষিপ্তভাবে কোন বিষয়ের উপর যতই শক্তিশালী যুক্তি দেখিয়ে মতামত দেওয়া হোক না কেন তা জনমত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে না।

খ. জনমতের সাথে জনকল্যাণ জড়িত। কোন একটি প্রসঙ্গে জনমঙ্গল জড়িত না থাকলে, কেবলমাত্র বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সমর্থনকে জনমত বলা যায় না।

গ. জনমত সামাজিক বা রাজনৈতিক বিষয়ের সুদৃঢ় ও যুক্তিনির্ভর মতামত। যেকোন বিষয়েই জনমত গঠন করা কষ্টসাধ্য। সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়, যেগুলোতে জনগণের অংশীদারিত্ব বেশি সেসব বিষয়েই জনমত গড়ে উঠতে দেখা যায়।

ঘ. জনমত সময়ের সৃষ্টি। একটি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে, কোন একটি বিষয়ে গড়ে ওঠা তার জনমত গুরুত্ব হারিয়ে ফেলতে পারে।

ঙ. জনমত পরিস্থিতি নির্ভর। সরকার বা রাজনৈতিক দলের কোন একটি অবস্থান বা নীতির ব্যাপারে নির্দিষ্ট একটি সময়ের প্রেক্ষাপটে জনমত তৈরি হয়।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	জনমত গঠনের একটি অভিজ্ঞতা বর্ণনা করুন।

সার-সংক্ষেপ

জনমত গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রাণস্বরূপ। জনমত সম্পর্কে টি এইচ গ্রীন ও জাঁ জ্যাঁক রুশোসহ অনেকে গুরুত্বপূর্ণ মতামত দিয়েছেন। শুরুর দিকের চিন্তাবিদরা রাষ্ট্র সৃষ্টি এবং টিকে থাকায় জনগণের ইচ্ছার কথা বলেছেন। আধুনিককালে জনমত উপেক্ষা করে কোন শাসক সরকার পরিচালনা করতে পারে না। এই জনমত জনকল্যাণকামী, সামষ্টিক, যৌক্তিক, সময় ও পরিস্থিতি নির্ভর একটি বিষয়। স্থান, কাল, পাত্রভেদে জনমত ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। জনমতের প্রতি দৃষ্টি রাখা প্রত্যেক শাসকেরই কর্তব্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। রুশো লিখিত বইয়ের নাম কি?

ক) General Will (খ) Leviathan

(গ) The Social Contract (ঘ) The Prince

২। "জনমত হল বিভিন্ন জনের মতামতের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার ফলে সৃষ্ট এক সামাজিক ফসল" - বলেছেন

ক) এইচ জে লাস্কি খ) স্টুয়ার্ট মিল

গ) জন লক ঘ) মরিস গিন্সবার্গ

৩। জনমতের সাথে কোনটি জড়িত?

ক) অপপ্রচার খ) জনমঙ্গল

গ) একনায়কত্ব ঘ) স্বৈরাচার

পাঠ-১০.২ জনমত গঠনের মাধ্যমসমূহ (Means of Forming Public Opinion)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- জনমত গঠনের মাধ্যমগুলো জানতে পারবেন।
- জনমত গঠনের মাধ্যমগুলোর ভূমিকা নিরূপণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	মিডিয়া, সামাজিক যোগাযোগ, মত বিনিময়, প্রচার, সুশাসন

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকার গঠন ও সরকারের স্থায়ীত্ব জনমতের উপর নির্ভরশীল। জনমতের জোরে ক্ষমতায় আসা দলকেও অনেক সময় জনমত বিরুদ্ধে চলে যাবার কারণে ক্ষমতা হারাতে হয়। সুষ্ঠু ও যৌক্তিক জনমত সরকারকে অর্থবহ করে তোলে অর্থাৎ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখে। জনমত গঠিত হবার কয়েকটি মাধ্যম নিচে আলোচনা করা হল:

সংবাদপত্র

সংবাদপত্র সমাজের দর্পণ স্বরুপ। সংবাদপত্রের মাধ্যমে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক খবর সম্পর্কে জনগণ জানতে পারে। সরকারি কোন সিদ্ধান্তের ভালো মন্দ জেনে জনগণ নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করতে পারে। সরকার ভালো কাজ করলে সংবাদপত্র জনগণের হয়ে সরকারের প্রশংসা করে, আর জনবিরোধী কার্যক্রম করলে তার প্রতিবাদ করে। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সরকারের পক্ষে-বিপক্ষে জনমত গড়ে উঠে। এভাবে সংবাদপত্র জনমত গঠন করে জনগণের অধিকার রক্ষা করে থাকে।

রেডিও-টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র

জনমত গঠনের অন্য এক প্রকার মাধ্যম হল রেডিও-টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র। এসব মাধ্যমগুলো জনগণের মাঝে খবর প্রচার ও বিনোদন পরিবেশনের পাশাপাশি বিভিন্ন সচেতনামূলক অনুষ্ঠান প্রচারের মাধ্যমে সামাজিক-রাজনৈতিক বিষয়ে জনমত গড়ে তোলে। উদাহরণস্বরূপ, পাকিস্তান আমলে জহির রায়হান, খান আতাউর রহমান প্রমুখ চিত্র পরিচালকরা পাকিস্তানী শাসকচক্রের বিরুদ্ধে তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিতবাহী চলচ্চিত্র নির্মাণ করে বাঙালী জাতীয়তাবাদের পক্ষে জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে ছিলেন।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম

বর্তমানে ফেইসবুক, স্কাইপ, টুইটারসহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম জনমত গঠনে বেশ ভূমিকা রাখে। যেকোন ঘটনা ফেইসবুক, টুইটারে মুহূর্তে দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্নভাবে মানুষকে সংযুক্ত করে এই ধারাটিই এক সময় বৃহৎ জনমতে রুপান্তরিত হয়। ২০১৫ এপ্রিলে সিলেটে শিশু রাজন হত্যার ঘটনার প্রতিবাদে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ভিত্তিক জনমত সংগঠিত হতে দেখা গেছে। রাজনকে নির্মমভাবে অত্যাচার করে হত্যার দৃশ্য ফেইসবুকের মাধ্যমে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং তার হত্যার বিচারের পক্ষে ব্যাপক জনমত গড়ে ওঠে। জনমতের চাপে প্রশাসন দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহন করে বলে অনেকে মনে করেন।

সভা-সমিতি

সভা-সমিতি জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সভা-সমিতিতে বিশেষ করে রাজনৈতিক সমাবেশে অংশগ্রহণ করে জনগণ দেশের বিদ্যমান বিভিন্ন অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারে। এর ফলে তাদের মধ্যে কোন বিষয় সম্পর্কে ধারণা তৈরি হয় যার ভিত্তিতে একটি পর্যায়ে এসে উক্ত বিষয়ে জনমত গড়ে উঠে। আজ থেকে দেড় দশক পূর্বেও সভা-সমিতিই ছিল প্রচার ও জনমত গঠনের প্রধান মাধ্যম। বর্তমানে মিডিয়া সে স্থান ক্রমাগত দখল করে নিচ্ছে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হল সচেনতা তৈরির সূতিকাগার। বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষকদের বক্তব্য থেকে শিক্ষার্থীরা তাদের পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কে নতুন নতুন বিষয় জানতে পারে। এভাবে তাদের মধ্যে একটি জনমত বা নিজ-নিজ কর্তব্য সম্পর্কে ধারণা জন্মে।

পরিবার

একজন ব্যক্তি পরিবারের মধ্যেই সবচেয়ে বেশি সময় কাটায়। এটি ব্যক্তির প্রধানতম আশ্রয়স্থল। ফলে পরিবার থেকে কোন একটি বিষয় জানলে, সে ব্যাপারে ব্যক্তির মধ্যে সহজাত বিশ্বাস জন্মে এবং তা অন্যদের সাথে বিনিময়ের সম্ভাবনা থাকে। এভাবে পরিবার থেকেও কোন একটি বিষয়ে জনমত গড়ে উঠে।

রাজনৈতিক দল

রাজনৈতিক দল প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ধরণের কর্মসূচি দিয়ে থাকে। বিশেষ করে নির্বাচনকালীন সভা-সমাবেশ, দলীয় ইশতেহার, পোস্টার ব্যানার ফেস্টুনসহ নানা মাধ্যমে নিজস্ব বক্তব্য প্রচার করতে থাকে। এর ফলে জনগণ দেশের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করে। বিষয়গুলো যুক্তিসংগত মনে হলে দলটির পক্ষে জনমত গড়ে উঠে।

আইন পরিষদ

আইন পরিষদের অধিবেশন থেকে অনেক বিষয়ে সঠিক তথ্য জানা যায়। সেখানে সংসদ সদস্যদের বক্তব্য থেকেও জনমত গড়ে উঠে।

সাহিত্য

সাহিত্যও জনমত গঠনে অনেক সময় ভূমিকা পালন করে। যেমন, রুশো, ভলটেয়ার প্রমুখের লেখনী দ্বারা ১৭৮৯ সালে ফরাসি বিপ্লব বিপুলভাবে প্রভাবিত হয়েছিল।

মোটকথা, জনমত গঠনের অনেকগুলো মাধ্যম রয়েছে। কোন একটিমাত্র মাধ্যমকে কেন্দ্র করে কোন বিষয়ে জনমত গড়ে উঠতে খুব একটা দেখা যায় না। বর্তমানে জনমত গঠনের ক্ষেত্রে ডিজিটাল মাধ্যমগুলো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি**)** **/শিক্ষার্থীর কাজ**	সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম কিভাবে জনমত গঠন করতে পারে? আলোচনা করুন।

সার-সংক্ষেপ

জনমত প্রত্যেক শাসন ব্যবস্থায়ই গুরুত্বপূর্ণ। জনমত নানাবিধভাবে গড়ে উঠে। আধুনিককালে জনমত গঠনের মাধ্যমে অনেক পরিবর্তন এসেছে। সংবাদপত্র, রেডিও-টেলিভিশন, সাহিত্য, পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মত মাধ্যমের সাথে, সাম্প্রতিক সময়ে যোগ হয়েছে ইন্টারনেট ভিত্তিক ফেইসবুক, টুইটারসহ আরও কয়েকটি মাধ্যম।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। জনমত গঠনের মাধ্যম হল-

i) চলচ্চিত্র ii) রেডিও টেলিভিশন

iii) সংবাদপত্র iv) ফেইসবুক

নিচের কোনটি সঠিক

ক) i ii খ) ii iii

গ) iii, iv ঘ) i, ii, iii ও iv

২। নিচের কোনটি একটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম?

ক) রেডিও খ) টেলিফোন

গ) ফেইসবুক ঘ) টেলিভিশন

পাঠ-১০.৩ জনমতের গুরুত্ব
(Importance of Public Opinion)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- জনমতের গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন

মুখ্য শব্দ (Key Words)	শাসন ব্যবস্থা, গণতন্ত্র, মূল্যায়ন, মানবাধিকার।

জনমতের গুরুত্ব

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় জনমত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় জনমত উপেক্ষা করে কোন শাসন ব্যবস্থাই শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারেনি। শাসন ব্যবস্থার ধরণ যেমনই হোক (উদাহরণস্বরূপ, সংসদীয়, রাষ্ট্রপতি শাসিত) না কেন, জনমতকে অগ্রাহ্য করে আজকের দিনে নির্বিঘ্নে ক্ষমতায় থাকা সম্ভব নয়। জনমতের স্বাধীনতা এবং রাষ্ট্র জনমতকে কোন দৃষ্টিতে মূল্যায়ন করে তার উপর আবার গণতন্ত্রের মাত্রা নির্ভর করে। জনমতের গুরুত্ব নিম্নে আলোচনা করা হল-

সরকার গঠন

আধুনিক গণতন্ত্র হল প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্র। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিই সরকার গঠন করে। তাছাড়া সকল ধরনের নির্বাচন হল জনমতের প্রতিফলন। জনগণ নির্বাচনে তাদের প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটিয়ে থাকে। তাই জনগণ ভোটাধিকার প্রয়োগ না করলে জনমতও পাওয়া যাবে না। আর জনমতবিহীন সরকারের আইনীভিত্তি থাকলেও নৈতিক ভিত্তি থাকে না। শুধু সরকার গঠন নয়, সরকারের স্থায়িত্বও জনমতের উপর নির্ভর করে।

জনগণকে সচেতন করা

বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে জনমত গড়ে উঠলে আপামর জনসাধারণ নিজেদের দায়িত্ব-কর্তব্য ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়। যেমন, দেশের কোন প্রান্তে যদি এসিড সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে উঠে, তবে তা সারাদেশের জনগণকে সজাগ হতে সাহায্য করে।

সরকারের মূল্যায়ন

সরকারি সিদ্ধান্ত ও কার্যক্রমের ভালো মন্দ নির্ধারণ করে জনগণ। কোন একটি সিদ্ধান্ত সরকারের নিকট ভালো মনে হলেও জনগণের নিকট তা গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। একটি সু-সরকার জনমত বিচেনায় নিয়ে প্রয়োজনবোধে পূর্ব-গৃহীত যেকোন সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসতে পারে।

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় জনগণের বড় ভূমিকা রয়েছে। কোথাও আইন লঙ্ঘিত হলে জনগণ তার প্রতিবাদ করে এবং ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার দাবি জানায়। এভাবে গঠিত জনমত আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারকে সহযোগিতা করে।

মানবাধিকার রক্ষা

সাংবিধানিক ও আইনী অধিকারগুলো রক্ষায় জনমতের গুরুত্ব অনেক। সচেতন জনসমাজ মানবাধিকার ক্ষুন্ন হলে তার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলে এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় সরকারের উপর চাপ তৈরি করে। আজকের দিনে জনমত গঠন হচ্ছে মানবাধিকার রক্ষায় সরকার বা রাষ্ট্রকে মনযোগী করার প্রধান উপায়।

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ

সামাজিক প্রতিরোধ হল শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার প্রধান হাতিয়ার। সমাজে অন্যায়-অত্যাচার এবং সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে উঠলে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় সরকারের কাজ অনেক সহজ হয়। সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে প্রবল জনমত গড়ে তোলার মাধ্যমে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

পরিশেষে বলা যায়, সরকার গঠন ও সরকারের টিকে থাকা জনমতের উপরই নির্ভর করে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি**)** **/শিক্ষার্থীর কাজ**	জনমতকে কেন গুরুত্ব দেয়া উচিত?

সার-সংক্ষেপ

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার জন্য জনমত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিককালে জনমতের উপর ভিত্তি করেই সরকার গঠিত হয় এবং টিকে থাকে। জনমত হচ্ছে সরকার বা একটি রাজনৈতিক দলের গ্রহণযোগ্যতার গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি। জনমত উপেক্ষা করে আজকের দিনে কোন সরকারের পক্ষে টিকে থাকা সম্ভব নয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ১ ও ২ নং প্রশ্নে উত্তর দিন

'ক' রাষ্ট্রে কয়েক বছর ধরে সামরিক শাসন বিদ্যমান। সামরিক শাসকরা এ সময় বেশ কয়েকটি জনস্বার্থ বিরোধী অধ্যাদেশ জারি করে। এর পরিণতিতে নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে প্রবল জনমত গড়ে উঠে। এক পর্যায়ে জনমতের চাপে সামরিক সরকার পদত্যাগ করে। 'ক' রাষ্ট্রে একটি সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই ধারাবাহিকতায় 'ক' রাষ্ট্রে একটি গণতান্ত্রিক সরকার গঠিত হয়।

১। 'ক' রাষ্ট্রে সামরিক শাসেন বিরুদ্ধে জনমত

ক) নিশ্চুপ ছিল খ) সরব ছিল

গ) সামরিক সরকারের নিকট নতি স্বীকার করেছিল

২। 'ক' রাষ্ট্রে সামরিক শাসনের পতনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে কোনটি?

ক) আমলাতন্ত্র খ) জনমত

গ) জাতিসংঘ ঘ) নির্বাচন

পাঠ-১০.৪ রাজনৈতিক সংস্কৃতির ধারণা ও বৈশিষ্ট্য
(Concepts and Characteristics of Political Culture)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- রাজনৈতিক সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা পাবেন।
- রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে সংজ্ঞায়িত করতে পারবেন।
- রাজনৈতিক সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবেন।
- রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রকারভেদ জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	রাজনৈতিক আর্দশ, রাজনৈতিক ব্যবস্থা, অনুভূতি, রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ড, রাজনীতি চর্চা।

রাজনৈতিক সংস্কৃতি

আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানে 'রাজনৈতিক সংস্কৃতি' একটি বহুল ব্যবহৃত প্রত্যয়। রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে বুঝায় এমন কতগুলো বিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গি, আবেগ এবং অনুশীলন যা একজন ব্যক্তির বা একটি জনসমষ্টির রাজনৈতিক আচরণকে গড়ে তোলে। রাজনৈতিক সংস্কৃতি একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থার রাজনৈতিক আদর্শ এবং কর্মপদ্ধতিকেও অন্তর্ভূক্ত করে। রাজনৈতিক সংস্কৃতির আধুনিক ধারণাটি গ্যাব্রিয়েল অ্যালমন্ড (G. A. Almond) এবং সিডনি ভার্বা (Sydney Verba) প্রথম গঠনমূলকভাবে Civic Culture নামক গ্রন্থে বিশ্লেষণ করেছেন।

অ্যালমন্ড এর মতে রাজনৈতিক সংস্কৃতি হল রাজনৈতিক ব্যবস্থার সদস্যদের রাজনীতি সম্পর্কে মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির বিন্যাস।

সিডনি ভার্বা বলেন, "পরীক্ষালব্ধ বিশ্বাস, প্রকাশযোগ্য প্রতীক এবং মূল্যবোধের সমষ্টিই হচ্ছে রাজনৈতিক সংস্কৃতি যা রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের পরিধি ব্যাখ্যা করে।"

রাজনৈতিক সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য

একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবেশ অর্থাৎ সকল উপাদানের সম্মিলিত বহিঃপ্রকাশ ঘটে রাজনৈতিক সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে। রাজনৈতিক সংস্কৃতি যেমন এর জনগণের বিশ্বাস, আচার-আচরণের অনুশীলনের সমষ্টি, রাজনৈতিক সংস্কৃতি তেমনি আবার জনগণের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণও করে। এসব বিবেচনায় রাজনৈতিক সংস্কৃতির নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি

একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার ক্রীড়নক, সংগঠক থেকে শুরু করে সাধারণ সদস্য পর্যন্ত সকলের বিশ্বাস অর্থাৎ অনুশীলনের একটি ছবি ফুটে রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে। রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই রাজনৈতিক সংস্কৃতির মান নির্ধারণ করা হয়। যেমন, রাজনৈতিক ব্যবস্থায় যদি সকলের অংশ থাকে, মত প্রকাশের সুযোগ-সুবিধা থাকে তবে তাকে উন্নত বা অংশগ্রহণমূলক রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলে। আর এসব সুযোগ না থাকলে তা নিম্নমানের রাজনৈতিক সংস্কৃতি হিসেবেই পরিগণিত হয়।

মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক ক্রিয়াকলাপ

প্রত্যেকের আচার-আচরণ দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যবোধের সমষ্টিগত বহিঃপ্রকাশ ঘটে রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে। এসব মনস্তাত্ত্বিক বিষয় পরিবর্তন সাপেক্ষে একটি রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তন ঘটা সম্ভব।

সমরূপতা ও ঐক্যমত

সাধারণত কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থার সমরূপতা ও ঐক্যমত্যের বহি:প্রকাশকেও সে ব্যবস্থার রাজনৈতিক সংস্কৃতি হিসেবে গণ্য করা হয়। অর্থাৎ একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার সদস্যরা সে ব্যবস্থাটি সম্পর্কে যে ধরনের মনোভাব পোষণ করে রাজনৈতিক সংস্কৃতিও সে ধরনের হয়।

অনুভূতিমূলক দৃষ্টিভঙ্গি

রাজনৈতিক পরিমন্ডল সম্পর্কে মানুষের অনুভূতিই আসলে রাজনৈতিক সংস্কৃতি।

রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রকারভেদ

বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ভিন্ন-ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে বিন্যাস করেছেন। গ্যাব্রিয়েল অ্যালমন্ড ও সিডনি ভার্বার মতে রাজনৈতিক সংস্কৃতি মূলত তিন ধরনের- (১) নিম্নমানের (Parochial) রাজনৈতিক সংস্কৃতি (২) অধীন (Subjective) রাজনৈতিক সংস্কৃতি (৩) অংশগ্রহণমূলক (Participatory) রাজনৈতিক সংস্কৃতি।

যে ব্যবস্থাতে নাগরিকেরা রাষ্ট্রের কর্মকান্ড সম্পর্কে তেমন কোন খবরাখবর রাখেন না; রাজনীতি সম্পর্কে আদৌ উৎসাহ বোধ করেন না এবং রাজনীতিতে অংশগ্রহনের পরিবেশ থাকে না, সে ধরনের ব্যবস্থাকে নিম্ন রাজনৈতিক সংস্কৃতি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

যে ব্যবস্থায় নাগরিকেরা রাজনীতি ও রাষ্ট্রের কর্মকান্ড সম্পর্কে অবহিত থাকা সত্ত্বেও এসব বিষয়ে অংশগ্রহণের সীমিত সুযোগ ভোগ করে, সে ধরনের ব্যবস্থাতে অধীন রাজনৈতিক সংস্কৃতি রয়েছে বলা যায়।

যে ব্যবস্থাতে নাগরিকেরা রাজনীতি ও রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করে এবং এসব বিষয়ে প্রভাব বিস্তারে সক্ষম, সে ধরনের ব্যবস্থাকে অংশগ্রহণমূলক রাজনৈতিক সংস্কৃতি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

অ্যারল্ড লিজপহার্টের মত পন্ডিত অবশ্য রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন। যথা: গণ (Mass) রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও এলিট (Elite) রাজনৈতিক সংস্কৃতি।

সর্বশেষে বলা যায়, রাজনৈতিক সংস্কৃতি একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থারই সার্বিক গুণের বহিঃপ্রকাশ। কোন দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি চিরকাল এক রকম থাকে না। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের মাধ্যমগুলোতে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সঞ্চার হলে, রাজনৈতিক সংস্কৃতির মান উন্নত হতে থাকে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি**)** **/শিক্ষার্থীর কাজ**	বাংলাদেশে কোন ধরনের রাজনৈতিক সংস্কৃতি বিরাজ করছে বলে আপনি মনে করেন?

সার-সংক্ষেপ

রাজনৈতিক সংস্কৃতি হচ্ছে রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে জনসাধারণের আচার-আচরণ, আবেগ, মূল্যবোধ, অনুশীলনের বহি:প্রকাশ। রাজনৈতিক সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে একটি রাষ্ট্রের সার্বিক অবস্থা বিচার করা যায়। রাজনৈতিক সংস্কৃতি হচ্ছে একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি। বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করেছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। অ্যালমন্ড ও ভার্বা এর বই কোনটি?

ক) Grammar of Politics খ) The Prince

গ) Democracy for the Few ঘ) The Civic Culture

২। লিজপহার্টের মতে রাজনৈতিক সংস্কৃতি প্রধানত কত প্রকার?

ক) এক খ) দুই
গ) তিন ঘ) চার

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন

সম্প্রতি পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ ভারতে একটি জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে সরকারি দল ও বিরোধী দলকে সংসদের বাহিরে একটি সভায় বসতে দেখা গেছে। সেখানে তারা আলোচনা সাপেক্ষে একত্রে পরিস্থিতি মোকাবিলা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

৩। পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ কোনটি?

ক) আমেরিকা খ) ভারত
গ) বাংলাদেশ ঘ) শ্রীলংকা

৪। উদ্দীপকের কার্যক্রম কোন ধরনের রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রকাশ?

ক) নিম্ন খ) মধ্যম
গ) অংশগ্রহণমূলক ঘ) কর্তৃত্বপরায়ণ

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.১ ঃ ১। গ ২। ঘ ৩। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.২ ঃ ১। ঘ ২। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.৩ ঃ ১। খ ২। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.৪ ঃ ১। ঘ ২। খ ৩। খ ৪। গ

আমলাতন্ত্র (Bureaucracy)

ইউনিট ১১

আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় আমলাতন্ত্র একটি অপরিহার্য উপাদান হিসেবে স্বীকৃত। রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কার্যে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত কর্মচারীরা হল শাসন বিভাগের অ-রাজনৈতিক অংশ। তাঁরা রাষ্ট্রকৃত্যক বা রাষ্ট্রভৃত্যক (Civil Servant) নামে পরিচিত। আদর্শ, দেশপ্রেম, কর্তব্য নিষ্ঠা ও জনসেবার মাধ্যমে আমলারা জনগণের বন্ধুত্বে পরিণত হতে পারেন। এই ইউনিটে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আমলাতন্ত্রের কার্যাবলি, আমলাতন্ত্রের জবাবদিহিতা এবং আমলাতন্ত্রের ভূমিকা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-১১.১ ঃ আমলাতন্ত্রের ধারণা ও বৈশিষ্ট্য পাঠ-১১.২ ঃ আমলাতন্ত্রের কার্যাবলি পাঠ-১১.৩ ঃ আমলাতন্ত্রের জবাবদিহিতা ও সুশাসন	পাঠ-১১.৪ ঃ বাংলাদেশে আমলাতন্ত্রের অতিবিকাশ পাঠ-১১.৫ ঃ আমলাতন্ত্রে লালফিতার দৌরাত্ম্য

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ**

পাঠ-১১.১ আমলাতন্ত্রের ধারণা ও বৈশিষ্ট্য (Concept and Characteristics of Bureaucracy)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- আমলাতন্ত্রের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- আমলাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	আমলাতন্ত্র, জাতীয় রাষ্ট্র, দপ্তর সরকার, পদসোপান, লালফিতার দৌরাত্ম্য, পেশাদারিত্ব।

আমলাতন্ত্রের ধারণা

বর্তমান অর্থে "আমলাতন্ত্র" শব্দটির ব্যবহার না থাকলেও, প্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন রাষ্ট্র ব্যবস্থাতে আমলাতন্ত্রের উপস্থিতির অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। আজ থেকে সাড়ে পাঁচ হাজার বছর আগে দক্ষিণ মেসোপটেমিয়া অঞ্চলের সুমেরিয় সভ্যতাতেও এক ধরনের আমলাতন্ত্রের উপস্থিতির নজির পাওয়া গেছে। প্রাচীন মিসরীয়, চীন ও রোমান সভ্যতাতেও আমলাতন্ত্র প্রচলিত ছিল। আধুনিক জাতি রাষ্ট্র ব্যবস্থা বিকাশের সময় থেকে বিশেষত অষ্টাদশ শতাব্দি থেকে বর্তমানে আমরা

যে অর্থে আমলাতন্ত্র বুঝে থাকি তার বিকাশ শুরু হয়। উনিশ শতাব্দী নাগাদ ইউরোপিয় দেশগুলোর রাষ্ট্র পরিচালনায় আমলাতন্ত্র বড় ভূমিকা নিতে শুরু করে। আমলাতন্ত্র বস্তুতঃ আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার একটি অপরিহার্য অঙ্গ। রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের স্থায়ী বা অরাজনৈতিক অংশই আমলাতন্ত্র বা সিভিল সার্ভিস (Civil Service) নাম পরিচিতি। গণতন্ত্রে নীতি নির্ধারণ করেন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং সেই নীতি বাস্তবায়ন করেন আমলারা বা প্রশাসনিক কর্মকর্তারা। রাষ্ট্রপ্রধান ও মন্ত্রিসভার নিচে শাসন বিভাগের যে সকল স্থায়ী কর্মচারী থাকেন তাদের আমলা বলা হয়।

আমলাতন্ত্রের ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Bureaucracy'। ইংরেজি 'Bureaucrary' শব্দটি এসেছে ফরাসি থেকে। ফরাসিতে শব্দটি এসেছে ফরাসি 'Bureau' এবং গ্রিক 'Kratos' শব্দের সমন্বয়ে। 'Bureau' শব্দের অর্থ ডেস্ক বা অফিস এবং 'Kratos' শব্দের অর্থ শাসন বা রাজনৈতিক ক্ষমতা। সুতরাং আমলাতন্ত্রের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে `Desk government' বা 'দাপ্তরিক সরকার'। আক্ষরিক অর্থে আমলাতন্ত্র বলতে বুঝায় আমলা বা প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের শাসন। বাস্তবে আমলারা পরস্পর সুশৃঙ্খলভাবে সংযুক্ত এবং রাজনৈতিকভাবে নিরপেক্ষ থেকে দায়িত্ব পালন করেন। জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবার সর্বপ্রথম 'Legal and rational Model' এর মাধ্যমে আমলাতন্ত্রকে উপস্থাপন করেন। ম্যাক্স ওয়েবারকে বলা হয় আদর্শ আমলাতন্ত্রের উদ্ভাবক। ম্যাক্স ওয়েবার ছাড়াও অনেক পন্ডিত আমলাতন্ত্রকে সংজ্ঞায়িত করেছেন।

জন ফিফনার ও রবার্ট প্রেসথাস বলেন, "আমলাতন্ত্র হচ্ছে বিভিন্ন ব্যক্তি ও তাদের কর্মকান্ডকে এমন এক পদ্ধতিতে সংগঠিত করা যা সুসংহতভাবে গোষ্ঠীর উদ্দেশ্য অর্জনে সক্ষম হয়।"

অধ্যাপক এস ই ফাইনার বলেন, "আমলাতন্ত্র একটি স্থায়ী, বেতনভুক্ত এবং দক্ষ চাকরিজীবী শ্রেণি।"

গ্যাব্রিয়েল অ্যালমন্ড ও জি পাওয়েল এর মতে, "আমলাতন্ত্র বলতে একটি ব্যাপক সংগঠনকে বুঝায়, যার মাধ্যমে শাসকবর্গ নিজেদের সিদ্ধান্তকে কার্যকর করার চেষ্টা করেন।"

পরিশেষে বলা যায়, আমলাতন্ত্র হচ্ছে স্থায়ী, বেতনভুক্ত, নিরপেক্ষ, দক্ষ ও পেশাদারী সংগঠন যার দ্বারা সরকারের নীতি ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হয়।

আমলাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য

আধুনিক সরকার ব্যবস্থায় আমলাতন্ত্র একটি অপরিহার্য সংগঠন। নিম্নে আমলাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হল:

১। **পদ সোপাননীতি:** আমলাতন্ত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পদসোপাননীতি। পদ সোপাননীতি অনুসারে বিভিন্ন পদের শ্রেণিবিন্যাস ও সংগঠন করা হয়। এ নীতি অনুসারে প্রত্যেক কর্মকর্তার উপর একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা থাকেন। ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার নির্দেশ অধস্তন কর্মকর্তা পালন করে থাকেন।

২। **স্থায়িত্ব:** আমলাতন্ত্র হচ্ছে একটি স্থায়ী ব্যবস্থা। আমলাতান্ত্রিক সংগঠনের কর্মচারীগণ একটি নির্দিষ্ট মেয়াদে কর্মে বহাল থাকেন। সরকার পরিবর্তন বা পতন হলেও আমলাদের পতন হয় না। এ জন্য আমলারা প্রশাসনের স্থায়ী অংশ।

৩। **সুনির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্র:** আমলাদের কর্মক্ষেত্র সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। তারা তাদের কাজের জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট জবাবদিহি করে থাকেন।

৪। **পেশাদারি ও বেতনভুক্ত:** আমলাতান্ত্রিক সংগঠনের কর্মকর্তারা পেশাদারি হয়ে থাকেন এবং যোগ্যতা ও পদমর্যাদা অনুসারে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে বেতন ভাতা পেয়ে থাকেন।

৫। **নিয়োগ ও পদোন্নতি:** মেধার ভিত্তিতে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে আমলাদের নিয়োগ দেওয়া হয়। কর্মে যোগদানের ভিত্তিতে, বয়স কিংবা একাডেমিক সাফল্যের ভিত্তিতে তাদের পদোন্নতি দেওয়া হয়।

৬। **নিরপেক্ষতা:** আমলাতন্ত্র হচ্ছে একটি নিরপেক্ষ শাসন ব্যবস্থা। দলীয় মনোভাব পরিত্যাগ করে জনগনের সেবা করাই তাদের দায়িত্ব। আমলারা দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে থেকে নিরপেক্ষভাবে সরকারি নীতি বাস্তবায়ন করে থাকে।

৭। **আনুষ্ঠানিকতা:** আমলাতান্ত্রিক সংগঠনে আমলারা আনুষ্ঠানিকতা এবং দৈনন্দিন কাজের উপর গুরুত্বারোপ করে। তারা বিধি মোতাবেক যথাযথ নিয়মে সবকিছু করে থাকে। আমলাতন্ত্রে সকল কাজই হয় রুটিন মাফিক।

৮। **দক্ষতা:** আমলারা সাধারণত দক্ষ। একই ধরনের কাজ বার বার করার কারণে তাঁরা দক্ষতা অর্জন করে। এছাড়া তাঁদের জন্য সময়োপযোগী প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা হয়।

৯। **নিরবিচ্ছিন্নতা:** আমলাগণ প্রশাসনিক কাজে নিরবিচ্ছিন্নতা বজায় রাখেন। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় সরকার পরিবর্তন হলেও আমলাদের কাজের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। কোন আমলার পদ শূন্য হলে সেই পদে নতুন ব্যক্তিকে নিয়োগ দিয়ে কাজে গতিশীলতা রক্ষা করা হয়।

১০। **লালফিতার দৌরাত্ম্য:** লালফিতার দৌরাত্ম্য আমলাতন্ত্রের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য। লালফিতার দৌরাত্ম্য বলতে কঠোর নিয়মনীতির মাধ্যমে প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করা বোঝায়। এতে ফাইল বা নথি দীর্ঘসময় বন্দী হয়ে পড়ে। জনগণ স্বাভাবিক সময়ে সেবা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয় এবং কাজের গতিশীলতা কমে যায়।

পরিশেষে বলা যায়, আমলাতান্ত্রিক সংগঠন বহুমুখী বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। সরকারের নীতি ও কর্মসূচি দল নিরপেক্ষভাবে বাস্তবায়ন করাই আমলাদের মূল দায়িত্ব। প্রশাসনের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে আমলারা জনগণের সার্বিক কল্যাণ সাধন করে থাকেন।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	আমলাতন্ত্রের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লিখুন।

সার-সংক্ষেপ

আধুনিককালে আমলাতন্ত্র যেকোন রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার একটি অপরিহার্য উপাদান। সাধারণত আমলাতন্ত্র বলতে প্রশাসন ব্যবস্থা ও প্রশাসনিক সংগঠনের সাথে যুক্ত স্থায়ী, বেতনভুক্ত দক্ষ ও পেশাদার কর্মকর্তাদের বুঝায়। আমলারা সরকারের নীতিসমূহ বাস্তবায়ন করে থাকে। আমলারা সরকারের স্থায়ী কর্মকর্তা যাদের মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়া হয়। আমলারা পদসোপান ভিত্তিক এবং রুটিন মাফিক কাজের পাশাপাশি রাজনৈতিক নেতৃত্বকে আইন প্রণয়নে সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। আমলাতন্ত্রের ইংরেজি প্রতিশব্দ কি?
ক) Mobocracy খ) Bureaucracy
গ) Democracy ঘ) Theocracy

২। উৎপত্তিগত অর্থে আমলাতন্ত্রের অর্থ কি?
ক) Desk Government খ) Shadow Government
গ) Military Govenment ঘ) Permanent Govenment

৩। Bureau শব্দটি কোন ভাষার শব্দ?
ক) ইংরেজি খ) জার্মান
গ) ফরাসি ঘ) গ্রীক

৪। আদর্শ আমলাতন্ত্রের প্রবক্তা কে?
ক) পল এইচ অ্যাপলবি খ) অধ্যাপক এস ই ফাইনার
গ) ফিফনার ও প্রেসথাস ঘ) ম্যাক্স ওয়েবার

৫। "আমলাতন্ত্র একটি স্থায়ী, বেতনভুক্ত এবং দক্ষ চাকরিজীবী শ্রেণী।" – কে বলেছেন?
ক) ম্যাক্স ওয়েবার খ) অধ্যাপক এস ই ফাইনার
গ) গ্যাবিয়েল অ্যালমন্ড ঘ) স্যামুয়েল পি হান্টিংটন

৬। আমলাতন্ত্রে সমস্ত কাজ রুটিন মাফিক করা হয়। কারণ আমলাতন্ত্র গুরুত্ব দেয়–
i) আনুষ্ঠানিকতার উপর ii) কার্যপদ্ধতির উপর iii) বিধি-বিধানের উপর
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i খ) ii
গ) i ও ii ঘ) i, iii ও iii

পাঠ-১১.২ আমলাতন্ত্রের কার্যাবলি
(Functions of Bureaucracy)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- আমলাতন্ত্রের কার্যাবলি আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	জনসেবা, প্রশিক্ষণ, নিরবচ্ছিন্নতা, নিয়মানুবর্তিতা, গণবিচ্ছিন্নতা।

আমলাতন্ত্রের কার্যাবলি

আধুনিক রাষ্ট্রে আমলাতন্ত্রের ভূমিকা ও কার্যাবলি অনস্বীকার্য। যেকোন ধরণের সরকারের নীতিমালা ও উদ্যোগের সাফল্য আমলাদের কাজের উপর বহুলাংশে নির্ভর করে। নিম্নে আমলাতন্ত্রের কার্যাবলি আলোচনা করা হল:

১। **আইন কার্যকর করা:** আমলারা শাসন বিভাগের সদস্য হওয়ায় আইন বিভাগ কর্তৃক প্রণীত আইনকে কার্যকর করে। এর মাধ্যমে রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা বজায় থাকে।

২। **আইন প্রণয়নে সহায়তা:** গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আমলারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আইন প্রণয়নে সহায়তা করে। আমলারা দক্ষ, অভিজ্ঞ, উচ্চশিক্ষিত হওয়ায় আইন প্রণয়নের খুঁটিনাটিতে পারদর্শী। প্রশাসনিক কর্মকর্তারা 'Delegated legislation' তথা অর্পিত ক্ষমতাপ্রসূত আইন প্রণয়ন করেন।

৩। **সরকারের নীতিমালা বাস্তবায়ন:** সরকার যে সকল নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তা বাস্তবায়ন করে থাকে আমলাতন্ত্র। আমলারা সরকারের আদেশ-নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করে। আমলাদের দ্বারা সরকারি নীতিমালার সঠিক বাস্তবায়নের উপর সরকারের সাফল্য ব্যর্থতা অনেকাংশে নির্ভর করে।

৪। **বিচার সংক্রান্ত:** বাংলাদেশসহ অনেক রাষ্ট্রেই এখন বিচার সংক্রান্ত অনেক কাজ আমলারা করে থাকে। উদাহরনস্বরূপ, জমি ক্রয়-বিক্রয়ের রেজিস্ট্রেশন, ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রেশন, মোবাইল কোর্ট পরিচালনা ইত্যাদি বিচার কাজ আমলারাই করে থাকে। এছাড়া তারা বিচার বিভাগের যেকোন আদেশ-নির্দেশ বা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করে থাকে।

৫। **দৈনন্দিন কার্যাবলি সম্পাদন:** আমলারা প্রশাসনের দৈনন্দিন কাজ রুটিন মাফিক সম্পাদন করে। দৈনন্দিন কাজকর্ম করার মাধ্যমে আমলারা দেশ ও জনগণের সেবা প্রদান করে। তারা বিভিন্ন দপ্তর ও বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। আমলারা দল ও রাজনীতি নিরপেক্ষভাবে তাদের দৈনন্দিন কার্যাবলি সম্পাদন করে। তাদের কর্মদক্ষতার উপর সরকারের সাফল্য নির্ভর করে।

৬। **তথ্য পরিবেশন:** আমলারা আইনসভার সদস্য ও মন্ত্রীদেরকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি ও পরিসংখ্যান সরবরাহ করে থাকে। রাষ্ট্র ব্যবস্থার অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক বিষয়ে গুরুত্বপূর্ন তথ্য সংগ্রহ, রক্ষণ এবং সমন্বয় করে আমলারা রাজনৈতিক নেতৃত্বের নিকট প্রকাশ করে। সরকার আমলাদের কাছ থেকে নির্ভরযোগ্য তথ্য লাভের ফলে সরকারের পক্ষে যেকোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ হয়।

৭। **আইনসভাকে প্রভাবিত করা:** আইনসভার কার্যপ্রণালীর সাথে আমলাতন্ত্র প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত থেকে আইনসভাকে প্রভাবিত করেন। আইনসভার বিভিন্ন কমিটিগুলোকে আমলারা প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে থাকে। আইনসভার কমিটিগুলোর বিভিন্ন বৈঠকে আমলারা উপস্থিত থাকেন। এখানে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন-উত্তর পর্বের মাধ্যমে আইনসভার প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে থাকেন আমলাগণ।

৮। **শাসক-শাসিতের মধ্যে সেতুবন্ধন:** আমলাতন্ত্রের মাধ্যমে শাসক-শাসিতের মধ্যে সেতুবন্ধন গড়ে ওঠে। আমলাগণ সরকারের কার্যাবলির গুণাগুণ জনগণের সামনে তুলে ধরেন এবং তার মাধ্যমে সরকার জনগণের আশা-আকাঙ্খা পূরণ করেন।

৯। **পেশাগত ও নৈতিক মূল্যবোধের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা:** আমলাগণ পেশাগত ও নৈতিক মূল্যবোধের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে। একজন আমলার সিদ্ধান্ত যেমন ব্যক্তিগত মূল্যবোধ ধারা প্রভাবিত হয় তেমনি পেশাগত মূল্যবোধ দ্বারা ও প্রভাবিত হয়। এই উভয় প্রকার মূল্যবোধের ভারসাম্য কেবলমাত্র আমলাতন্ত্রের মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়।

পরিশেষে বলা যায়, আধুনিক রাষ্ট্রে আমলাতন্ত্রের কার্যাবলির উপর সরকারের সাফল্য ও স্থায়িত্ব নির্ভর করে। যার জন্য আধুনিক কল্যাণকর রাষ্ট্রে আমলাতন্ত্রের কার্যাবলি ক্রমশ প্রসারিত হচ্ছে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	আমলাদের মূল কার্যক্রম সম্পর্কে আলোকপাত করুন।

সার-সংক্ষেপ

আমলাতন্ত্র ছাড়া দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করা অসম্ভব। আমলাতন্ত্র রাষ্ট্রের নাগরিকের সার্বিক কল্যাণ সাধন করতে পারে। আমলাদের মাধ্যমেই সরকারি আইন ও নীতি কার্যকর করা হয়ে থাকে। আমলাদের দক্ষতা আইন প্রণয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। আমলাদের মাধ্যমেই শাসন কার্যে ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। তবে একটি অসৎ অদক্ষ আমলাতন্ত্র যেকোন রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে প্রভূত পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সরকারের পরিবর্তন ঘটলেও কারা দায়িত্বে থেকে যান?
ক) মন্ত্রীসভার সদস্যগণ খ) আইনসভার সদস্যগণ
গ) আমলারা ঘ) রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ

২। সরকারের অ-রাজনৈতিক অংশ কোনটি?
ক) আমলাগণ খ) মন্ত্রীবর্গ
গ) সংসদ সদস্যবৃন্দ ঘ) নির্বাচকমন্ডলী

৩। সরকারের নীতি ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করে কে?
ক) রাষ্ট্রপ্রধান খ) পরিকল্পনামন্ত্রী
গ) প্রধানমন্ত্রী ঘ) আমলাগণ

৪। আমলাদের কাজ কী?
ক) নীতি নির্ধারণ খ) নীতি বাস্তবায়ন
গ) আইন প্রণয়ন ঘ) রাষ্ট্র পরিচালনা

পাঠ-১১.৩ আমলাতন্ত্রের জবাবদিহিতা ও সুশাসন
(Accountability of Bureaucracy and Good Governance)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- আমলাতন্ত্রের জবাবদিহিতা ও সুশাসন সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	জবাবদিহিতা, সুশাসন, বিচার বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণ, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, নিরপেক্ষ প্রশাসন।

আমলাতন্ত্রের জবাবদিহিতা ও সুশাসন

আমলাতন্ত্রের জবাবদিহিতা বলতে বুঝায় অধঃস্তন কর্তৃক প্রশাসনের ঊর্ধ্বর্তন কর্তৃপক্ষের বরাবরে নিজ-নিজ কাজকর্মের কৈফিয়ত দেওয়া। প্রশাসনের জবাবদিহিতা নিশ্চিত হলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা পায়। নিম্নে আমলাতন্ত্রের জবাবদিহিতা ও সুশাসন বাস্তবায়নের বিষয়গুলো আলোচনা করা হল:

১। **আইনসভার মাধ্যমে জবাবদিহিতা:** আমলাতন্ত্রকে আইনসভার মাধ্যমে জবাবদিহিতার মধ্যে এনে সুশাসন বাস্তবায়ন করা যায়। আইনসভার যে সকল সদস্য প্রশাসনের সাথে জড়িত তাদেরকে আইনসভায় বিভিন্ন প্রশ্ন-উত্তর পর্বের মাধ্যমে জবাবদিহি করতে হয়। এর মাধ্যমে সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয় এবং সুশাসন শক্তিশালী হয়।

২। **প্রশাসনিক জবাবদিহিতা:** আমলাতন্ত্রে প্রশাসনিক জবাবদিহিতার মাধ্যমে সুশাসন নিশ্চিত করা যায়। প্রশাসনে পদক্রম অনুসারে অধঃস্তন কর্তৃপক্ষ তার কাজ-কর্মের জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট দায়ী থাকেন। জনসেবার সাথে সম্পৃক্ত প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষকে তদারকি করেন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ। এর মাধ্যমে সেবার মান বৃদ্ধি পায় এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩। **বিচার বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণ:** আমলাতন্ত্রকে বিচার বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে জবাবদিহিতার মধ্যে এনে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা যায়। আমলাতন্ত্র আইন বিভাগ দ্বারা যেমন নিয়ন্ত্রিত তেমনি বিচার বিভাগ দ্বারাও নিয়ন্ত্রিত। আমলাদের দ্বারা কোন ব্যক্তির বা প্রতিষ্ঠানের অধিকার ক্ষুন্ন হলে উক্ত ব্যক্তি বিচার বিভাগ বা আইনের আশ্রয়লাভ করতে পারেন। আদালত ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজে সুশাসন বাস্তবায়ন করে।

৪। **রাজনৈতিক জবাবদিহিতা:** আমলাতন্ত্রকে রাজনৈতিক জবাবদিহিতার মধ্যে অন্তর্ভূক্তকরণের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা যায়। আমলারা প্রকৃত পক্ষে রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের আদেশ বাস্তবায়ন করে থাকে। রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ আমলাদের কাজের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করলে প্রশাসনে স্বচ্ছতা, নিরপেক্ষতা ও কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে।

৫। **নাগরিকদের মাধ্যমে জবাবদিহিতা:** আমলাতন্ত্রকে নাগরিকদের মাধ্যমে জবাবদিহিতার আওতায় নিয়ে এসে সুশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব। নাগরিকদেরকে বেশি সংখ্যক সরকারি কাজের সাথে সম্পৃক্ত করতে পারলে আমলাতন্ত্রকে আরো বেশি জবাবদিহিতার মধ্যে নিয়ে আসা যাবে। সাধারণ জনগণ যত বেশি সরকারি কাজের সাথে সম্পৃক্ত হবে, আমলাতন্ত্র তত বেশি জবাবদিহিতায় বাধ্য হবে ফলে সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠা পাবে।

৬। **ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ:** বিকেন্দ্রীকরনের মাধ্যমে আমলাতন্ত্রকে কেন্দ্র থেকে প্রান্তে পৌঁছে দিতে হবে। এর মাধ্যমে সরকারি কাজের দীর্ঘসূত্রিতা হ্রাস পাবে। জনগণ আরো বেশি আমলাদের কাছে আসার সুযোগ পাবে। জনগণের সমস্যার সমাধান দ্রুত হবে। জনগণের ক্ষোভ হ্রাস পেয়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠা পাবে।

৭। **নিরপেক্ষতা প্রমাণঃ** নিরপেক্ষ আমলাতন্ত্র সুশাসনের জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজন। আমলাদের নিরপেক্ষতা সুশাসনকে শক্তিশালী করে। প্রশাসনের জবাবদিহিতা আমলাদের নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করে।

৮। **দুর্নীতি হ্রাসঃ** রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম বড় বাধা দুর্নীতি। প্রশাসনিক জবাবদিহিতা সরকারি আমলাদের দুর্নীতি হ্রাস করতে পারে। দুর্নীতি হ্রাস পেলে কাজের স্থবিরতা দূর হবে এবং সুশাসন নিশ্চিত হবে।

পরিশেষে বলা যায়, আধুনিক কল্যাণমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থায় সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য আমলাতন্ত্রের জবাবদিহিতা অত্যাবশ্যক। সুশাসন ব্যতীত রাষ্ট্রের সার্বিক উন্নয়ন ও জনগণের কল্যাণ সম্ভব নয়। আর আমলাতন্ত্রের জবাবদিহিতা ব্যতীত সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	আমলাতন্ত্রের জবাবদিহিতা কিভাবে সুশাসন নিশ্চিত করতে সহায়ক হয় ব্যাখ্যা করুন।

সার-সংক্ষেপ

জবাবদিহিতা হল সুশাসনের চাবিকাঠি। সুশাসন নিশ্চিতকরণের জন্য সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখতে পারে জবাবদিহিতা। আমলাতান্ত্রিক জবাবদিহিতা, পেশাগত জবাবদিহিতা, আইনগত জবাবদিহিতা, রাজনৈতিক জবাবদিহিতা প্রভৃতি সুনিশ্চিত হলে দুর্বল ও ভঙ্গুর শাসন ব্যবস্থার লক্ষণগুলো পর্যায়ক্রমে দূরীভূত হবে। সেখানে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। আমলাতন্ত্রের জবাবদিহিতা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে সে রাষ্ট্রের সার্বিক কল্যাণ সাধন সুনিশ্চিত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ কার নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য?
ক) জনগণের নিকট খ) প্রধানমন্ত্রীর নিকট
গ) উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নিকট ঘ) মন্ত্রীর নিকট

২। কোন নীতি অনুসারে আমলাতন্ত্রে বিভিন্ন পদের শ্রেণিবিন্যাস ও সংগঠন করা হয়?
ক) পদসোপান নীতি খ) দলীয় নীতি
গ) রাষ্ট্রীয় নীতি ঘ) রাষ্ট্রীয় মূলনীতি

৩। অনুন্নত বিশ্বে আমলারা নিজেদেরকে কী মনে করেন?
ক) জনগণের সেবক খ) জনগণের প্রভু
গ) জনগণের রক্ষক ঘ) জনগণের বন্ধু

৪। পেশাগত দায়িত্ব হিসেবে আমলাগণ বিভিন্ন কার্যক্রম পালন করেন। তাদের কাজকে কি হিসেবে মূল্যায়ন করা যায়?
ক) প্রভুত্ব করা খ) সরকারের ফরমায়েশ খাটা
গ) দলের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করা ঘ) জনসেবা করা

পাঠ-১১.৪ বাংলাদেশে আমলাতন্ত্রের অতিবিকাশ
(Excessive Development of Bureaucracy in Bangladesh)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- বাংলাদেশে আমলাতন্ত্রের অতি বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	আমলাতন্ত্রের অতিবিকাশ, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন।

বাংলাদেশে আমলাতন্ত্রের অতি বিকাশ

বিশ্বের অন্যান্য সকল দেশের ন্যায় বাংলাদেশের আমলাতন্ত্রেরও বিকাশ হয়েছে। কিন্তু উপনিবেশিক ও সামরিক শাসনের কারণে বাংলাদেশের আমলাতন্ত্রের বিকাশ স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় সাধিত হয়নি। নিম্নে বাংলাদেশে আমলাতন্ত্রের অতি বিকাশের কারণ সম্পর্কে আলোচনা করা হল:

১। **ঐতিহাসিক কারণ:** বৃটিশ শাসনামলে ভারতবর্ষে আাধুনিক আমলাতন্ত্রের প্রচলন শুরু হয়। বৃটিশ শাসক গোষ্ঠী নিজেদের স্বার্থ হাসিল করার জন্য আমলাদের ব্যবহার করতেন। তখন রাজস্ব আদায় এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করাই ছিল আমলাদের প্রধান কাজ। আমলারা জনগনের উপর আধিপত্য বিস্তার করতেন এবং তাদেরকে নিয়ন্ত্রণে রাখতেন। উপনিবেশিক আমলারা জনগণের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতেন। পাকিস্তানী শাসনামলেও আমলারা নিজেদের জনগণের সেবক না ভেবে প্রভু মনে করতেন। বাংলাদেশের আমলাতন্ত্র বৃটিশ এবং পাকিস্তানী আমলাতন্ত্রের উত্তরসূরী হিসেবে কাজ করছে।

২। **রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা:** বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার জন্য আমলারা অতিমাত্রায় প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। রাজনেতিক দলের মতানৈক্যের জন্য আমলারা জনগণের কাছ থেকে আরো দূরে সরে যায়। নিজেদের উচ্চ মর্যাদাবান ভাবার কারণে তারা জনগণের সেবক হতে পারেন নি।

৩। **রাজনৈতিক নেতৃত্বের দুর্বলতা:** আমলারা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে মেধার ভিত্তিতে স্থায়ী ভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। আমলারা তাদের শিক্ষা, দক্ষতা, মেধা, অভিজ্ঞতা দ্বারা সরকারি কাজে পারদর্শী হয়ে উঠে। পক্ষান্তরে, রাজনৈতিক নেতৃত্বের একটি অংশের মধ্যে দলীয় কোন্দল, প্রশিক্ষণের অভাব ও অভিজ্ঞতার অভাব লক্ষ্য করা যায়। রাজনৈতিক নেতৃত্বের দুবর্লতা ও নিজেদের পেশাগত দক্ষতা কাজে লাগিয়ে আমলারা অধিক শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

৪। **দুর্বল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান:** বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর দুর্বলতার কারণে আমলাতন্ত্র অতি বিকশিত হয়েছে। রাজনৈতিক নেতৃত্বের দুর্বলতা, কোন্দল, দুর্বল নির্বাচন কমিশন, গণমাধ্যমের স্বাধীনতার অভাব, বিচার বিভাগের ক্ষমতা হ্রাস, দুর্বল দুর্নীতি দমন কমিশনের মত সমস্যার কারণে আমলাতন্ত্র অতিমাত্রায় প্রভাব বিস্তার করে।

৫। **প্রবেশগম্যতার অভাব:** সরকার, প্রশাসন ও রাজনীতিতে জনগণের প্রবেশে (Accessibility) নানাবিধ বাধার কারণে আমলাতন্ত্র অনিয়ন্ত্রিত হয়ে ওঠে। বিশেষ করে সর্বজনীন ভোটারদের অংশগ্রহণমূলক অবাধ, নিরপেক্ষ নির্বাচন না হওয়া তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের অভাব এক্ষেত্রে বড় বাধা।

পরিশেষে বলা যায় যে, নানাবিধ ঐতিহাসিক কারণ থাকলেও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার সুযোগেই বাংলাদেশের মত দেশগুলোতে আমলাতন্ত্রের অসম বিকাশ ঘটে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	বাংলাদেশে আমলাতন্ত্রের অতিবিকাশের কারণ কি?

সার-সংক্ষেপ

আমলাতন্ত্র হচ্ছে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বাংলাদেশের আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা বর্তমানে অতিমাত্রায় বিকাশমান। উপনিবেশিক সংস্কৃতির প্রভাব থাকার কারণে আমলাদের মধ্যে সেবার মন-মানসিকতার পরিবর্তে অনেক সময় প্রভুত্বসুলভ মানসিকতার প্রতিফলন ঘটছে। বাংলাদেশের আমলাতন্ত্রের অতিবিকাশের জন্য রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, সুযোগ্য নেতৃত্বের সংকট ও রাজনৈতিক অসচেতনতা বিশেষভাবে দায়ী।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। আমলাতান্ত্রিক সংগঠনে দলীয়করণের কারণে প্রশাসনে কী বৃদ্ধি পায়?
ক) পক্ষপাতিত্ব খ) রাজনীতি
গ) স্বজনপ্রীতি ঘ) বিশৃঙ্খলা

২। দল-নিরপেক্ষ সেবা প্রদানের অঙ্গীকার কে করে?
ক) সাংস্কৃতিক সংগঠন খ) সামাজিক সংগঠন
গ) আমলাতান্ত্রিক সংগঠন ঘ) নাগরিক সংগঠন

৩। আমলা প্রশাসন রাজনীতি নিরপেক্ষ সংগঠন; কারণ তারা–
ক) জনগণ হতে দূরে থাকে খ) সুশীল সমাজ থেকে দূরে থাকে
গ) দেশপ্রেমীদের কাছ থেকে দূরে থাকে ঘ) রাজনীতি হতে বিরত থাকে

পাঠ-১১.৫ আমলাতন্ত্রে লালফিতার দৌরাত্ম্য (Red Tapism in Bureaucracy)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- আমলাতন্ত্রে লালফিতার দৌরাত্ম্য সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	লালফিতা, আদালত, কর্ম পরিকল্পনা, দীর্ঘসূত্রিতা, আনুষ্ঠানিক।

আমলাতন্ত্রে লালফিতার দৌরাত্ম্য

'লালফিতা' বলতে আমলাতন্ত্রের দীর্ঘসূত্রিতা ও সাবেকী আমলের নিয়ম-কানুনকে অন্ধভাবে অনুকরণ ও অনুসরণ করাকে বোঝায়। 'লালফিতা' প্রত্যয়টি সপ্তদশ শতাব্দীতে ব্রিটেনে প্রচলিত হয়। সে সময় দেশটিতে সরকারি অফিস-আদালতের সকল ফাইলপত্র লাল রঙের ফিতা দ্বারা বেঁধে রাখা হত। পরবর্তীকালে আমলাতন্ত্রের দীর্ঘসূত্রিতা বোঝানোর জন্য লাল ফিতা রূপকটির ব্যবহার শুরু হয়।

এক পর্যায়ে এসে আমলাতন্ত্রের আনুষ্ঠানিকতা, দীর্ঘসূত্রিতা নিয়ম-কানুনের বাড়াবাড়ি, বিলম্ব, হয়রানি ও বাড়াবাড়ি বুঝাতেও 'লালফিতার দৌরাত্ম্য' কথাটির প্রচলন শুরু হয়। উত্তর উপনিবেশিক দেশগুলোর আমলাতন্ত্রে 'লালফিতার দৌরাত্ম্য' খুব বেশি দেখা যায়। রাজনৈতিক নেতৃত্বের শৈথিল্যের সুযোগে আমলারা এসব দেশে বিশেষভাবে লালফিতা নির্ভর হয়ে উঠে । প্রশাসনের প্রচলিত নিয়ম নীতি ও বিধি-বিধানের অজুহাতে আমলারা প্রায়শ জনগণকে সেবাদানে বিলম্ব ঘটান। অনেক সময় মানবিক দিকটি উপেক্ষিত রেখে নিয়ম-কানুনের বেড়াজালে আবদ্ধ থাকে প্রশাসন।

যে কোন সমস্যা বিধি-মোতাবেক সমাধান করতে গিয়ে প্রায়শ সময় নষ্ট হয়ে যায়। যেকোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তারা পূর্ববর্তী নজিরের উপর বেশি গুরুত্বরোপ করেন। অফিসের দৈনন্দিন কর্ম পরিকল্পনা করেন সনাতন রীতি ও কর্মপদ্ধতির উপর ভিত্তি করে। এর ফলে আমলাতন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য অর্থাৎ জনগণের সেবা প্রদান ব্যাহত হয়। অতিবেশি নিয়ম কানুনের কারণে জনগণ সরকারি অফিসে এসে এক টেবিল থেকে অন্য টেবিলে ছোটাছুটিতে বাধ্য হন। আবার আইন কানুনের জটিলতার জন্য আমলারা সময়মত কাজ সম্পন্ন করতে পারেন না। লালফিতার সুযোগে অনেক সময় আমলারা দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে উঠতে পারেন। পদসোপান নীতির কারণেও আমলাতন্ত্রে কাজের বিলম্ব হয়ে থাকে। লালফিতার দৌরাত্ম্যে আমলাতন্ত্র জনবিচ্ছিন্ন ও অপ্রিয় হয়ে ওঠে। নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার আমলাতন্ত্রের উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল হলে, তাদের জনপ্রিয়তা হ্রাস পায়, এমনকি এ কারণে সরকারের পতন পর্যন্ত হতে পারে।

মোট কথা, আমলাতন্ত্রের লালফিতার দৌরাত্ম্য শব্দটি আমলাতন্ত্রের অহেতুক বাড়াবাড়ি, কড়াকড়ি, বিলম্ব, আনুষ্ঠানিকতা, হয়রানি ও নেতিবাচক অর্থে প্রচলিত।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	লাল ফিতার দৌরাত্ম্য সম্পর্কে আলোচনা করুন।

সার-সংক্ষেপ

সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে শাসন বিভাগের অতিমাত্রায় ক্ষমতাবৃদ্ধি, উপনিবেশিক আমলের কর্ম-সংস্কৃতি চালু থাকা সহ নানা কারণে আমলাতন্ত্রের দৌরাত্ম প্রকট আকার ধারণ করে। আমলারা অভিজ্ঞ, দক্ষ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে পারদর্শী যার জন্য সাধারণ জনগণ আমলাতন্ত্রের উপর খুব বেশি নির্ভরশীল। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে, আমলারা তাদের সেবার মনোভাব ভুলে গিয়ে ক্ষমতার অপব্যবহার করে। এর ফলে জনগণ, সরকার ও রাষ্ট্র ক্ষতিগ্রস্থ হয়। আমলাতন্ত্র তার আস্থা হারায় এবং সরকার জনবিচ্ছিন্ন ও অপ্রিয় হয়ে ওঠে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। 'লালফিতা' প্রত্যেয়টি কোন শতাব্দীতে প্রচলিত হয়?

ক) ষোড়শ খ) সপ্তদশ

গ) অষ্টাদশ ঘ) ঊনবিংশ

২। লালফিতা প্রত্যয়টি প্রথম কোন দেশে প্রচলন হয়?

ক) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র খ) ফ্রান্স

গ) ব্রিটেন ঘ) ইতালি

৩। আমলাতন্ত্র সাধারণ জনগণের কাছে অপ্রিয় হয়ে ওঠে কেন?

i) লালফিতার দৌরাত্ম্যের জন্য ii) প্রভুসুলভ দৃষ্টিভঙ্গির জন্য

iii) জবাবদিহিতার অনুপস্থিতির জন্য iv) জনবিচ্ছিন্নতার জন্য

নীচের কোনটি সঠিক

ক. i, ii খ. ii, iv

গ. i, ii, iv ঘ. i, ii, ও iii ও iv

৪। আমলাতন্ত্রের দৌরাত্ম্যের ফলে কী হয়?

i. জনগণ হয়রানি হয় ii. সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব ঘটে iii. প্রশাসনে বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১নং ও ২নং প্রশ্নের উত্তর দিন

জনগণকে সেবা প্রদান করাই আমলাতন্ত্রের দায়িত্ব। কিন্তু উত্তর-উপনিবেশিক দেশগুলোতে সেবা প্রদানে নিয়োজিত আমলাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম বিরাজমান।

১। সুশাসনের পথে আমলাতন্ত্র অন্তরায় কেন?

i. জবাবদিহিতার অভাব ii. নীতি প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে দক্ষতার অভাব iii. আমলাদের মধ্যে দুর্নীতির প্রভাব

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

২। প্রশাসনের দুর্নীতি ও অনিয়মের কারণে–

i. জনগণ সেবা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়

ii. জনগনের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হয়

iii. যোগ্য প্রশাসকরা সেবা প্রদানে নিরুৎসাহী হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩নং ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দিন

সুব্রত বণিক একজন সৎ ও দক্ষ আমলা হিসেবে পরিচিত। তিনি নিজেকে জনগণের সেবক মনে করেন। তিনি প্রতিদিনের কাজ প্রতিদিন করেন এবং কোন ফাইল আটকে রাখেন না। তিনি দ্রুত সরকারি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করে থাকেন।

৩। সুব্রত বণিক নিচের কোনটি হতে মুক্ত?

ক) লালফিতার দৌরাত্ম্য খ) জনপ্রতিনিধিদের সাথে দুর্ব্যবহার

গ) জনবিচ্ছিন্নতা ঘ) সব কয়টি

৪। সুব্রত বণিকের কর্মকাণ্ড রাষ্ট্রে যে ধরনের প্রভাব ফেলবে–

i. দেশ উন্নত হবে

ii. সুশাসনের পথ প্রশস্ত হবে

iii. সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৫নং ও ৬নং প্রশ্নের উত্তর দিন

তানভীর আহমেদ সরকারের একজন স্থায়ী বেতনভুক্ত চাকুরিজীবী। তিনি নিরপেক্ষভাবে প্রশাসন পরিচালনা করেন। তিনি অবৈধ প্রভাব বিস্তার করেন না এবং সৎভাবে জীবনযাপন করেন।

৫। তানভীর আহমেদ একজন–

ক) রাজনৈতিক নেতা খ) আমলা

গ) মন্ত্রী ঘ) সংসদ সদস্য

৬। তানভীর আহমেদ চাকরিতে পদোন্নতি পেতে পারেন যে কারণে–

i. দক্ষতার জন্য ii. প্রভাব বিস্তারের জন্য iii. সততার জন্য

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৭নং প্রশ্নের উত্তর দিন

শাকিল কবির একজন আমলা। তাঁর কাজ বহুমুখী । রাষ্ট্র ও সরকারের জটিল ও স্থায়ী কাজসমূহ তিনি সম্পাদন করে থাকেন।

৭। মি. শাকিল কবির এর কাজের অন্তর্ভুক্ত–

i. পরামর্শ সংক্রান্ত কাজ

ii. নীতি প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজ

iii. শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন

১। শামীম আহম্মদ জেলা প্রশাসনের প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা। দৈনন্দিন কার্য সম্পাদনের বিষয়ে তিনি সবসময় ঐতিহ্য এবং নিয়মের দোহাই দিয়ে থাকেন। এর ফলে তাঁর অফিসে সেবা নিতে আসা মানুষ জন প্রায়শ সময় মত সেবা লাভে ব্যর্থ হয়।

(ক) আমলাতন্ত্র কী?
(খ) লালফিতার দৌরাত্ম্য বলতে কী বোঝায়?
(গ) শামীম আহম্মদের এরূপ মনোভাবের কারণ ব্যাখ্যা করুন।
(ঘ) উদ্দীপকে উল্লিখিত শামীম আহম্মদের মানসিকতা কিভাবে দূর করা যায়? মতামত দিন।

২। মাকসুদুর রহমান একজন আমলা। তিনি সৎ, দক্ষ ও কর্মঠ প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিসেবে সুনাম অর্জন করেছেন। অন্যান্য আমলাদের মত তিনি নিজেকে জনগণের প্রভু না ভেবে সেবক মনে করেন। তার টেবিলে ফাইল পড়ে থাকে না। তিনি দ্রুত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করে থাকেন।

(ক) আমলাতন্ত্রের জনক কে?
(খ) আমলাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য লিখুন।
(গ) উদ্দীপকে একজন আমলা হিসেবে মাকসুদুর রহমানের মধ্যে কী ধরনের কার্যপদ্ধতি লক্ষ্য করা যায়? ব্যাখ্যা করুন।
(ঘ) উদ্দীপকের মাকসুদুর রহমানের মত সকল আমলা দায়িত্ব পালন করলে রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। –বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১১.১	ঃ	১। খ ২। ক ৩। গ ৪। ঘ ৫। খ ৬। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১১.২	ঃ	১। গ ২। ক ৩। ঘ ৪। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১১.৩	ঃ	১। গ ২। ক ৩। খ ৪। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১১.৪	ঃ	১। খ ২। গ ৩। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১১.৫	ঃ	১। খ ২। গ ৩। ঘ ৪। ঘ
চূড়ান্ত মূল্যায়ন	ঃ	১। ঘ ২। গ ৩। ঘ ৪। ঘ ৫। খ ৬। খ ৭। ক

জাতীয়তা ও দেশপ্রেম
(Nationality and Patriotism)

ইউনিট ১২

বর্তমানে পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্রই হচ্ছে জাতি রাষ্ট্র। একেকটি জাতি জাতীয়তাবোধে উজ্জীবিত হয়ে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করছে। এমন রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি নাগরিকই তার রাষ্ট্রের প্রতি বিশেষ আনুগত্য ও ভালবাসা প্রকাশ করে, অর্থাৎ দেশের প্রতি তার গভীর প্রেম থাকে। একটি দেশের উন্নয়নে কেবল তার অর্থনৈতিক সূচক উর্ধ্বগামী হলেই তার উন্নতি হয় না, সেজন্য দেশ ও জাতির প্রতি মমত্ববোধও প্রয়োজন রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে জাতীয়তাবাদে উজ্জীবিত একজন নাগরিক দেশ ও জাতির জন্য জীবন দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। যে জাতির জাতীয়তাবোধ যত বেশি তার দেশপ্রেমও তত বেশি এবং উন্নয়নও দ্রুত হয়। এ ইউনিটতে মূলত: জাতি ও জাতীয়তার ধারণা, পার্থক্য, জাতীয়তার উপাদান, দেশপ্রেম ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

এই ইউনিটের পাঠসমূহ-

পাঠ-১২.১ঃ জাতি ও জাতীয়তার ধারণা পাঠ-১২.২ঃ জাতি ও জাতীয়তার পার্থক্য	পাঠ-১২.৩ঃ জাতীয়তার উপাদান পাঠ-১২.৪ঃ দেশপ্রেম

পাঠ-১২.১ জাতি ও জাতীয়তার ধারণা (Concepts of Nation and Nationality)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- জাতি সম্পর্কে ধারণা পাবেন।
- জাতীয়তার সংজ্ঞা বলতে পারবেন।
- জাতি ও জাতীয়তার উৎপত্তি সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	জাতি, জাতীয়তা, ঐক্যবোধ, সমগোত্রীয়

জাতি

লাতিন শব্দ Natio হতে ইংরেজি 'Nation' (নেশন) কথাটির উৎপত্তি হয়েছে। ইংরেজিতে 'নেশন' এর বাংলা অনুবাদ করা হয়েছে 'জাতি'। জন বার্জেস ও স্টিফেন লিকক এর মত পন্ডিতেরা গোত্রগত বা বংশগত ঐক্যের অর্থে জাতির সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। বার্জেসের মতে, যারা গোত্রগত ও ভৌগোলিক ঐক্যের ভিত্তিতে বিশেষ এলাকায় একত্রে বসবাস করে তারাই জাতি। লিকক বলেন, বংশগত ও ভাষাগত ঐক্যের বন্ধনে যে মানবসমাজ আবদ্ধ তারাই জাতি। কিন্তু উভয় লেখকের প্রদত্ত সংজ্ঞা অসম্পূর্ণ। ইংরেজ চিন্তাবিদ টি এইচ গ্রিন জাতির যে সংজ্ঞা উপস্থাপন করেন তা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, "the nation underlies the state" এবং রাষ্ট্র বলতে বুঝায় "the nation organised in a certain way."

উল্লেখযোগ্য এই যে, প্রথম মহাযুদ্ধের পর হতে জাতির বস্তুনিষ্ঠ সংজ্ঞা নিরূপণ করার ব্যাপারে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে যথেষ্ট তৎপরতা দেখা যায়। তাঁরা অনেকেই এর বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে যথেষ্ট সাফল্যেরও পরিচয় দান করেন। তাঁদের মতামত অনুসরণ করলে এটি প্রত্যক্ষ হয় যে, ভাষা, প্রথা, ঐতিহ্য কিংবা জাতিকতার ভিত্তিতে একতাবদ্ধ হয়ে যে মানব সমাজ 'আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার' দাবি করে অথবা রাষ্ট্র গঠনে সমর্থ হয় তারাই জাতি হিসেবে অভিহিত হতে পারে।

রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব জাতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। যে জনসমাজ বাস্তবে ইহা ধারণ করে অথবা ইহা অর্জনের জন্য সংঘবদ্ধভাবে চেষ্টা করে তারাই জাতি। লর্ড ব্রাইসের ভাষায়: "A nation is a nationality which has organised itself into a political body, either independent or desiring to be independent."

কিন্তু ক্রিস্টোফার হায়েস জাতির যে সংজ্ঞা প্রদান করেছেন তা থেকে মনে হয় যে, একটি মানবগোষ্ঠী ঐক্য ও সার্বভৌমত্ব অর্জন দ্বারাই জাতিরূপে গণ্য হতে পারে। রামসে মুর প্রদত্ত সংজ্ঞাটি এক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ; তিনি বলেন: "জাতি একটি মানবসমষ্টি যারা বিশেষ সাদৃশ্যবশত স্বাভাবিকভাবেই সন্নিবদ্ধ হয়েছে বলে অনুভব করে এবং এ সাদৃশ্য তাদের নিকট এতই প্রবল ও বাস্তব যেজন্য তারা স্বচ্ছন্দে একত্রে বসবাস করতে পারে। তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হলে তাদের মধ্যে দেখা দেয় অসন্তোষ এবং যারা এই বন্ধনের সাথে সম্পর্কহীন তাদের অধীনতাও তারা সহ্য করতে পারে না।"

অধ্যাপক আর এন গিলক্রিস্টের মতে জাতি ও রাষ্ট্র সমার্থবোধক, শুধু প্রভেদ এই যে, রাষ্ট্র অপেক্ষা জাতির অর্থ অধিক ব্যাপক। অন্যভাবে বলা যায়, রাষ্ট্রের পরিচয়ে জাতির পরিচয়; যেমন ইন্দোনেশীয় বলতে আমরা ইন্দোনেশিয়া রাষ্ট্রের অধীনে ঐক্যবদ্ধ জাতিকে বুঝে থাকি। এ এস হমবি এর মত পন্ডিতেরা জাতি বলতে বোঝান এমন একটি বৃহদাকার জন সম্প্রদায়কে যারা একটি নির্দিষ্ট স্থানে বাস করে, সাধারণত একই ভাষায় কথা বলে এবং যাদের একটি রাজনৈতিক চরিত্র বা রাজনৈতিক আকাঙ্খা থাকে।

জাতীয়তা

জাতীয়তার ধারণা রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কিত। অলিভার ভঙ্ক এর মত গবেষক মনে করেন জাতীয়তা হচ্ছে একজন ব্যক্তি এবং রাষ্ট্রের মধ্যকার আইনী বন্ধন। জাতীয়তার মাধ্যমে ব্যক্তির উপরে রাষ্ট্রের আইনী অধিকার প্রতিষ্ঠা পায়। জাতীয়তা দ্বারাই ব্যক্তি রাষ্ট্রের কাছ থেকে সুরক্ষা লাভ করে। তবে জাতীয়তার ধারণা যে সব সময় রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কিত তা নয়। কখনো কখনো জাতীয়তা দ্বারা একটি জাতিগোষ্ঠীকে নির্দেশ করা হয় যার সদস্যরা একই ধরনের ভাষা, নৃ-তাত্ত্বিক পরিচয়, সংস্কৃতি, ইতিহাস বা সমরূপ কোন বৈশিষ্ট্য ধারণ করে।

অধ্যাপক হ্যারল্ড লাস্কির মতে জাতীয়তা "একটি ঐক্যবোধের পরিচায়ক। এর অংশীদাররা বাকি মানবসমাজ হতে স্বতন্ত্ররূপে চিহ্নিত হয়।" এই ঐক্য একক ইতিহাস, বিজয় কাহিনী কিংবা যুগ্ম প্রচেষ্টায় সৃষ্ট ঐতিহ্যেরই ফল। এসবের মধ্য দিয়ে সৃষ্ট বোধ ঐক্যের বন্ধন তৈরি করে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	ক্রিস্টোফার হায়েস প্রদত্ত 'জাতি'র সংজ্ঞাটি উল্লেখ করুন।

সার-সংক্ষেপ

জাতি হল বিশেষ চেতনায় উদ্বুদ্ধ একটি জনগোষ্ঠী যাদের গোত্র ও ভৌগোলিক মিল রয়েছে। তারা সাধারণত রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব অর্জনের চেষ্টায় লিপ্ত থাকে বা অর্জন করেছে। তাদের ঐক্য বা সাদৃশ্য একান্তই স্বাভাবিক বিষয়। কিন্তু যখন এটিকে তারা আইনীরূপে নিয়ে আসে তখনই রাষ্ট্র নামক প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয় এবং তারা একটি সুনির্দিষ্ট জাতীয়তার অধিকারী হিসেবে পরিচিতি পায়। অর্থাৎ জাতীয়তা হল একটি পরিচয়বোধ বা ঐক্যের মানসিক অনুভূতি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। "একটি মানবগোষ্ঠী ঐক্য ও সার্বভৌমত্ব অর্জন দ্বারাই জাতিরূপে গণ্য হতে পারে"। এটি কার বক্তব্য?
(ক) লর্ড একটন (খ) লর্ড রিপন
(গ) লর্ড ব্রাইস (ঘ) ক্রিস্টোফার হায়েস

১। "জাতীয়তা একটি ঐক্যবোধের পরিচায়ক" এ কথা কে বলেছেন?
(ক) ল্যারি ডায়মন্ড (খ) নোয়াম চমস্কি
(গ) হ্যারল্ড লাস্কি (ঘ) ফ্রেডরিখ নিটশে

পাঠ-১২.২ জাতি ও জাতীয়তার পার্থক্য (Difference between Nation and Nationality)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- জাতি ও জাতীয়তার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ সম্ভব হবে।
- কোনটি জাতি ও জাতীয়তা কেমন তা বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	মানসিক অনুভূতি, রাজনৈতিক সংগঠন, ভৌগোলিক ঐক্য।

জাতি ও জাতীয়তার পার্থক্য

জাতি ও জাতীয়তা প্রত্যয় দুটিকে সাধারণ দৃষ্টিতে দেখলে মনে হতে পারে তাদের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ এদের মাঝে পার্থক্য নিরূপণ করেছেন। জাতি হল একটি ঐক্যবদ্ধ মানবগোষ্ঠী যাদের মাঝে ঐক্য সৃষ্টি হবার মতো সমরূপ বা প্রায় সমরূপ দৈহিক গঠন, ভৌগোলিক ঐক্য, ভাষা, চিন্তার ধারা, সাহিত্যের মিল, সর্বোপরি ঐক্যবদ্ধ থাকার চেতনা রয়েছে। তবে আধুনিককালে জাতি গঠনের জন্য একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম ভূখন্ড অপরিহার্য। এ রকম একটি পরিস্থিতিতে মানবগোষ্ঠী সর্বদা একতার অনুভূতি অনুভব করে, যাকে জাতীয়তা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। নিচে জাতি ও জাতীয়তার মধ্যে কিছু পার্থক্য উল্লেখ করা হল। তবে এই পার্থক্যগুলোকে কোনভাবেই সর্বজন স্বীকৃত বলা যাবে না।

জাতি ও জাতীয়তার পার্থক্য নিম্নরূপ-

জাতি	জাতীয়তা
১। জাতি একটি বৃহৎ গ্রুপ বা দল। এর মধ্যে বিভিন্ন জাতীয়তার মানুষ থাকতে পারে।	১। জাতীয়তা জাতি অপেক্ষা অপেক্ষাকৃত কম জনগোষ্ঠী নিয়ে গঠিত।
২। ঐক্য এবং সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার বদৌলতে একটি জাতীয়তা জাতিতে পরিণত হয়।	২। জাতীয়তার জন্য সার্বভৌমত্ব কোন শর্ত নয়।
৩। একটি জাতীয়তা যখন একটি রাষ্ট্র তৈরি করে ফেলে তখনই একটি জাতির জন্ম হয়।	৩। জাতীয়তার মধ্যে স্বাধীনতার চেতনার স্ফুরণ দেখা দিলেই, একটি জাতীয়তা একটি জাতিতে পরিণত হয় বলে অনেকে মনে করেন।

একটি জনগোষ্ঠীর মাঝে যখন জাতীয়তার সৃষ্টি হয় তখন তা জাতি গঠনের দিকে এগিয়ে যায়। জাতীয়তা গঠনে অনেকগুলো উপাদান এর মধ্যে ঐক্য থাকা দরকার। তবে অনেকগুলো উপাদানের মাঝে মিল থাকলেই জাতি গঠন হয় না। একত্রে বা ঐক্যবদ্ধ থাকার অনুভূতিটাও জরুরি।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	জাতি ও জাতীয়তার মধ্যে পার্থক্য নিরুপণ করুন।

সার-সংক্ষেপ

একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর মধ্যে জাতীয়তা হচ্ছে একটি মানসিক ঐক্যের অনুভূতি। এই ঐক্যের অনুভূতি নানা উপাদানে তৈরি। জাতি হচ্ছে এই ঐক্যের একটি রাজনৈতিক প্রকাশ, যা একটি স্বাধীন নির্দিষ্ট ভূ-খন্ডের মাধ্যমে বাস্তব রূপ লাভ করে। তাই জাতীয়তা ছাড়া জাতি গঠন ভাবা যায় না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। জাতীয়তা হচ্ছে-

(ক) একটি ঐক্য বোধ (খ) একটি বিচ্ছিন্নতা বোধ

(গ) আন্তর্জাতিকতা বোধ (ঘ) ধর্মীয় চেতনা

২। 'ক' রাষ্ট্রটি অনেক বড়। এর ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, এমনকি চেহারাগত অমিল রয়েছে। রাষ্ট্রটির নাগরিকদের ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক-

ক. জাতি এক খ. জাতীয়তা এক

গ. এটি কোন রাষ্ট্র নয় ঘ. উপরের কোনটি নয়

৩। আরব রাষ্ট্রসমূহ একই আরবী ভাষা প্রচলিত হলেও সেখানে বহু _____ বিদ্যমান। শূন্যস্থানে কোন শব্দটি বসবে?

(ক) জাতি (খ) জাতীয়তা

(গ) গোষ্ঠী (ঘ) ধর্মীয় সম্প্রদায়

পাঠ-১২.৩ জাতীয়তার উপাদান (Elements of Nationality)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- জাতীয়তার উপাদানগুলো সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- উপাদানগুলো কেন অপরিহার্য তা অনুধাবন করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	ঐক্য, বংশ, ভৌগোলিক, ভাষা-সাহিত্য, ধর্ম, আত্মিক।

জাতীয়তার উপাদান

জাতীয়তা বলতে আমরা সেই জনসমাজকে বুঝি, যারা দেশ, ভাষা ও সাহিত্য, রীতি-নীতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ। এই ঐক্যসূত্রগুলোই জাতীয়তার উপাদান। জাতীয়তার উপাদান অনেক, তবে নিম্নলিখিতগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য: (ক) বংশগত ঐক্য, (খ) ভৌগোলিক ঐক্য, (গ) ধর্মের ঐক্য, (ঘ) ভাষা ও সাহিত্যের একতা, (ঙ) রীতি-নীতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের একতা, (চ) সাধারণ রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা।

(ক) বংশগত ঐক্য : বংশগত ঐক্য জাতীয়তার অন্যতম উপাদান। এটি এক জাতির লোককে অন্য জাতি থেকে স্বতন্ত্র রাখে। কিন্তু বর্তমানে বংশের বা কূলের এত বেশি সংমিশ্রণ ঘটেছে যে কোন জাতিই আর খাঁটি বংশের দাবি করতে পারে না। বংশগত ঐক্যের দিক থেকে ইংরেজ ও জার্মান জাতির মধ্যে বহু মিল থাকা সত্ত্বেও তারা দুটি স্বতন্ত্র জাতি। অপরপক্ষে আমেরিকায় বহু বংশজাত জনসমষ্টি থাকা সত্ত্বেও তারা এক জাতিতে পরিণত হয়েছে। বস্তুত: বংশগত ঐক্য ছাড়াও জাতীয় মনোভাবের সঞ্চার হতে পারে। সুতরাং বলা যায়, বংশগত ঐক্য জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করলেও, এটিকে জাতীয়তার জন্য অত্যাবশ্যক উপাদান হিসেবে গণ্য হয় না। কানাডায় বংশগত ঐক্য নেই বললেও চলে।

(খ) ভৌগোলিক ঐক্য : ভৌগোলিক ঐক্য জাতীয়তার আর একটি উল্লেখযোগ্য উপাদান। একই ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে বহুকাল বাস করার ফলে জনসমষ্টির মধ্যে দৃঢ় ঐক্যবোধ সৃষ্টি হয়। সাধারণত ধরে নেয়া হয় যে, জাতি গঠনের জন্য জনসমষ্টিকে একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বাস করতে হয়। এভাবে দেখলে যাযাবর গোষ্ঠী জাতিতে পরিণত হতে পারে না। কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করে দেখলে দেখা যাবে, এ উপাদানটিও জাতীয়তার জন্য অপরিহার্য নয়। ইহুদিরা বহু দিন যাবৎ কোন নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডে বাস না করেও নিজেদের এক জাতি বলে মনে করত।

(গ) ধর্মের ঐক্য : ধর্মের ঐক্য জাতীয়তা সৃষ্টিতে কখনো-কখনো ভূমিকা পালন করে। এক ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সহজেই এক ঐক্যভাব জাগ্রত হয়। ইহুদিরা ধর্মের প্রভাবে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে ইসরায়েল রাষ্ট্র গঠন করে। অবিভক্ত ভারতের মুসলমানগণও ধর্মের নামে জাতীয় ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয় এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করে। তথাপি বলা প্রয়োজন, ধর্মের ঐক্য জাতীয়তার অপরিহার্য উপাদান হিসেবে গণ্য হয় না। সাধারণত বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের নিয়েই জাতি গঠিত হয়। বর্তমানে ধর্মের ক্ষেত্রে উদারনীতি গৃহীত হওয়ায় এবং ধর্মনিরপেক্ষতার ভাব জাগ্রত হওয়ায় ধর্মের ঐক্য তেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে না।

(ঘ) ভাষা ও সাহিত্যের একতা : ভাষার ঐক্য জাতীয়তার ভাবধারা সৃষ্টিতে ব্যাপক সাহায্য করে। এক ভাষাভাষী জনসমষ্টি ও একই সাহিত্যের পাঠকবৃন্দ স্বভাবতই দৃঢ় ঐক্যবোধ অনুভব করে। কিন্তু ভাষার ঐক্যই সর্বাপেক্ষা বড় কথা নয়। বিভিন্ন ভাষায় কথা বলেও অনেক ক্ষেত্রে একটি জনগোষ্ঠী জাতীয়তার ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়। বেলজিয়ামের অধিবাসীবৃন্দ দু'ভাষায় কথা বলেও এক জাতিতে পরিণত হয়েছে। সুইজারল্যান্ডে তিনটি ভাষা, চীনে বহু ভাষা প্রচলিত থাকলেও সেখানকার অধিবাসীবৃন্দ জাতীয়তাবোধে অনুপ্রাণিত হতে পেরেছে। অপরপক্ষে, ইংরেজ ও আমেরিকানগণ একই ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করেও দুটি জাতি। তারা এক জাতিতে রূপান্তরিত হয়নি। বিভিন্ন আরব রাষ্ট্রসমূহেও একই আরবী ভাষা প্রচলিত, তথাপি সেখানে বহু জাতি বিদ্যমান।

(ঙ) রীতি-নীতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ঐক্য : জাতীয়তার অন্যতম উল্লেখযোগ্য উপাদান রীতি নীতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ঐক্য। একই ঐতিহ্য, একই ইতিহাস, দলগত জয় পরাজয়ের গৌরব ও গ্লানি, একই প্রথা-পদ্ধতি জনসাধারণকে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করে। এক সঙ্গে অত্যাচারিত এবং পরাধীন থাকার স্মৃতি, ঐতিহাসিক কোন ঘটনায় অংশগ্রহণের স্মৃতি, এক ঐতিহ্যের অধিকারী হবার গৌরব জাতীয়তার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

(চ) সাধারণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা : একই ধরনের রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা, একই শাসনব্যবস্থা, একই রাজনৈতিক ব্যবস্থা যে কোন জনসমষ্টিকে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করতে সহায়ক হয়।

(ছ) মনস্তাত্ত্বিক ঐক্যবোধ: জাতীয়তাবোধ সৃষ্টিতে মনস্তাত্ত্বিক ঐক্যবোধের ভূমিকাই মুখ্য বলে অনেকে মনে করেন। আধুনিক অনেক মনস্তত্ত্ববিদগণের মতে, জাতীয়তার মূল উপাদান হল সংহতি বোধ এবং যুক্ততার অসীম আনন্দ। ফরাসী পন্ডিত আর্নেস্ট রেনানের মতে, জাতীয়তাবোধ একটি মানসিক সত্তা, এক প্রকার সজীব মানসিকতা। ভূখন্ডের সীমা, কূল, ধর্ম, ভাষা, এমনকি ইতিহাস-ঐতিহ্যের মধ্যেও এর সূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে এই উপাদানগুলোর প্রত্যেকটি পরোক্ষভাবে মনকে মিলনের জন্যে প্রস্তুত রেখে জাতীয়তাবোধ গঠনে সহায়তা করে। সংহতিবোধ এর প্রাণ স্বরূপ। অধ্যাপক হ্যারল্ড লাস্কি একই কথা বলেন। তিনি বলেন, "জাতীয়তার ধারণাটি অপরিহার্যভাবেই একটি আত্মিক ব্যাপার"।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	জাতীয়তা গঠনের উপাদানগুলোর একটি তালিকা তৈরি করুন।

সার-সংক্ষেপ

জাতীয়তা হল একটি জনসমাজের ঐক্যবোধের অনুভূতি। এই জনসমাজ যখন ভাষাগত, ঐতিহ্যগত, বংশগত, ভৌগোলিক, রীতি-নীতি, সাহিত্য, রাজনৈতিক দিক দিয়ে নিজেরকে একই ধরনের মনে করে তখনই জাতীয়তা সৃষ্টি হয়। তবে এর চূড়ান্ত স্বীকৃতির জন্য রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান বা রাষ্ট্র প্রয়োজন। এই অনুভূতি দীর্ঘদিনে তৈরি হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। নীচের কোনটি জাতীয়তার উপাদান নয়?

(ক) বংশগত ঐক্য (খ) ভৌগোলিক ঐক্য

(গ) ধর্মের ঐক্য (ঘ) একই ধরণের পোশাক

২। জাতীয়তার উপাদান একটি নয়, একাধিক। বক্তব্যটি-

(ক) মিথ্যা (খ) সত্য

(গ) অর্ধেক সত্য (ঘ) উপরের কোনটিই না

৩। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ মনে করেন জাতীয়তার উপাদান হল-

i. ভাষা ii. পোশাক-পরিচ্ছেদ iii. পেশা

নিচের কোনটি সঠিক

ক) i খ) ii

গ) ii ও iii ঘ) i ও ii

পাঠ-১২.৪ দেশপ্রেম (Patriotism)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- দেশপ্রেমের ধারণা পাবেন
- দেশপ্রেমকে সংজ্ঞায়িত করতে পারবেন
- উগ্র দেশপ্রেমের ফলে কি হয় জানতে পারবেন

মুখ্য শব্দ (Key Words)	দেশপ্রেম, উগ্রদেশপ্রেম, জাতীয়তাবাদ

দেশপ্রেমের ধারণা

দেশপ্রেম দ্বারা জন্মভূমির প্রতি ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিকে বোঝায়। দেশপ্রেম বলতে সেই নৈতিক মূল্যবোধকে বোঝানো হয় যা দ্বারা ব্যক্তি তার স্বীয় ক্ষুদ্র স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে জন্মভূমির স্বার্থকেই প্রাধান্য দেয়। জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেমকে অনেক সময় সমার্থক হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়। কেউ কেউ আবার এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য করতে চান। তাঁদের মতে দেশপ্রেম একটি জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের সাহস বোঝায়। পক্ষান্তরে, জাতীয়তাবাদ হচ্ছে দেশপ্রেমের এমন এক পর্যায় যখন একটি জাতি অপর জাতির তুলনায় শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করার মানসিকতা তৈরি হয়।

দেশপ্রেমকে ইংরেজিতে Patriotism বলা হয়। শব্দটির উৎপত্তি ল্যাটিন শব্দ *patriota* থেকে যার অর্থ "countryman" বা "দেশীয় লোক" এটি গ্রীক শব্দ *patriōtēs* বা *স্বদেশী এর সমার্থক।* Merriam-Webster Dictionary মতে, দেশের প্রতি জনগণের ভালবাসাই দেশপ্রেম।

দেশপ্রেম হচ্ছে নিজ দেশের প্রতি ভালবাসা। কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর মতে, রাষ্ট্র অনেক সময় একটি সমজাতীয় পরিচয় নির্মাণ শক্তিশালী করতে দেশপ্রেমকে উদ্বুদ্ধ করে। দেশপ্রেমে যখন দেশের প্রতি সত্যিকারের ভালবাসা হিসেবে প্রকাশ পায় তখন তা জাতি গঠনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ জনগোষ্ঠী দেশের জন্য নিজের জীবন দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। যেমনটি আমরা দেখেছি ভিয়েতনাম যুদ্ধের ক্ষেত্রে। ভিয়েতনামকে রক্ষা করার জন্য লক্ষ-লক্ষ লোক তাদের জীবন উৎসর্গ করেছেন।

অন্যদিকে, অতিমাত্রায় দেশপ্রেম উগ্রপন্থার জন্ম দেয়। যেমন, জার্মানির হিটলার, ইতালির মুসোলিনি উগ্র-দেশপ্রেমেরই উদাহরণ। তাছাড়া ভারতের উগ্রবাদী 'হিন্দুত্ববাদী'রাও ভারতকে শুধু হিন্দুদের দেশ বলে বিশ্বাস করে। এই ধারণা তাদেরকে উগ্রপন্থার দিকে উৎসাহিত করেছে। জার্মানিতে হিটলার জার্মান জাতিকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে তুলে অন্য জাতির মানুষদের ওপর হিংসাত্মক আচরণে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

একটি জাতির প্রতি চরম ভালোবাসা অনেক সময় স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম দেয়। আর স্বাধীন রাষ্ট্র টিকে থাকার জন্য দেশপ্রেম জরুরি। আজকের এই বিশ্বায়নের ফলে তথ্য প্রযুক্তি তথা কম্পিউটার ও ইন্টারনেট মানুষে-মানুষে যোগাযোগ বৃদ্ধি করেছে। এই যোগাযোগ মানুষে-মানুষে আস্থার সম্পর্ক তৈরিতে ভূমিকা রাখছে। নতুন বাস্তবতাতে দেশপ্রেমের সনাতনী ধারণা অনেকটাই পাল্টে যাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। একাধিক রাষ্ট্র আজ অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তার স্বার্থে নিজের সীমানা শিথিল করেছে। ইউরোপিয় ইউনিয়ন এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তবে দেশপ্রেমের এই যোগাযোগের কিছু নেতিবাচক প্রভাবও রয়েছে। সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমগুলি ব্যবহার করে পৃথিবীর নানান স্থানে দেশপ্রেমের নামে উগ্র জাতীয়তাবাদ ও ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারের মাধ্যমে সহিংসতার বিস্তার ঘটানো হচ্ছে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	দেশপ্রেম ও উগ্র জাতীয়তাবাদের মধ্যে পার্থক্য করুন।

সার-সংক্ষেপ

জাতি গঠনে দেশপ্রেম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেশপ্রেমের কারণে কোন ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠী নিজের মাতৃভূমির প্রতি প্রবল ভালবাসা অনুভব করে। এ বিষয়ে সমরূপ অনুভূতিসম্পন্ন জনগোষ্ঠী মাতৃভূমির স্বাধীনতা অর্জনের জন্য জীবনও উৎসর্গ করতে পারে। অর্থাৎ দেশপ্রেমে উজ্জীবিত হয়েই একটি জনগোষ্ঠী তাদের রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করে একটি জাতির জন্ম দিতে পারে। পক্ষান্তরে অন্য দেশ বা জাতির মানুষকে হেয় প্রতিপন্ন করে শুধু নিজ দেশের প্রতি বা জাতির প্রতি যুক্তিহীন ভালবাসা উগ্র দেশপ্রেম বা উগ্র জাতীয়তাবাদের জন্ম দেয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। দেশপ্রেম হচ্ছে-

(ক) নিজের দেশকে ভালবাসা
(খ) অন্যের দেশকে ঘৃণা করা
(গ) নিজের দেশের প্রতি উদাসীন থাকা
(ঘ) নিজের দেশের স্বার্থকে বিসর্জন দেয়া

২। উগ্র দেশপ্রেম একটি দেশের জন্য-

ক) প্রয়োজনীয়
খ) প্রধান শর্ত
গ) ক্ষতিকর
ঘ) কোনটিই নয়

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। কখনো-কখনো ধর্ম জাতীয়তার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে উঠতে পারে। ধর্মীয় ঐক্য থাকা সত্ত্বেও পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। কারণ হিসেবে বলা যায় পাকিস্তানের দুটি অংশের মাঝে ভাষা, সাহিত্য, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছেদ এমন কি ভৌগোলিক ঐক্যও ছিল না। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানীদের লাগামহীন শোষণ বাঙালি জাতিকে রাজনৈতিক সংগঠন সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। যার ফলশ্রুতিতে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে জন্ম হয় বাংলাদেশ নামক একটি রাষ্ট্রের। এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে কেবল মাত্র ধর্মগত ঐক্য একটি জাতি হয়ে ওঠার অনুভূতিকে দীর্ঘস্থায়ী করতে পারে না।

ক) জাতি ও জাতীয়তার উৎপত্তিগত শব্দ দুটি কি?
খ) জাতি কি?
গ) উদ্দীপকের আলোকে জাতীয়তার সকল উপাদানগুলো উল্লেখ করুন।
ঘ) জাতীয়তার গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি উপাদানে মিল থাকার পরও পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তান কেন একটি জাতি গঠন করতে পারেনি? ফলশ্রুতিতে কি হয়েছিল ব্যাখ্যা করুন।

২। 'ক' একটি সংগঠিত জাতি। তাদের মাঝে জাতীয়তার বেশির ভাগ উপাদানের মিল রয়েছে। তারা স্বাধীনতার পর চার দশকের বেশি সময় অতিক্রম করেছে কিন্তু উন্নতির কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে নি। সুশীল সমাজ লাগামহীন দুর্নীতি ও দেশপ্রেমহীনতাকেই এর জন্য দায়ী করেছেন। এ জাতির বেশির ভাগ জনগোষ্ঠীই ব্যক্তিগত স্বার্থ অন্বেষণে ব্যস্ত। ফলে এখনও বৃহৎ জনগোষ্ঠী দারিদ্রতা ও নিরক্ষতায় নিমজ্জিত।

ক) জাতি ও জাতীয়তার মূল পার্থক্য কি?
খ) দেশপ্রেম কি?
গ) উদ্দীপকের আলোকে দেশপ্রেম ও জাতীয়তার সম্পর্ক আলোচনা করুন।
ঘ) "দেশপ্রেম না থাকলে জাতীয়তার অনুভূতি ও ঐক্য ম্লান হয়ে যায়"-ব্যাখ্যা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১২.১ ঃ ১। ঘ ২। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১২.২ ঃ ১। ক ২। খ ৩। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১২.৩ ঃ ১। ঘ ২। খ ৩। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১২.৪ ঃ ১। ক ২। গ

মানবণ্টন : পূর্ণমান ১০০

- সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য ৬০ নম্বর এবং বহুনির্বাচনি প্রশ্নের জন্য ৪০ নম্বর বরাদ্দ থাকবে।
- প্রতিটি সৃজনশীল (রচনামূলক) প্রশ্নের নম্বর ১০ এবং প্রতিটি বহুনির্বাচনী প্রশ্নের নম্বর ১।

- **সৃজনশীল প্রশ্নঃ**
  সৃজনশীল অংশে মোট ৯টি প্রশ্ন থাকবে এবং উত্তর দিতে হবে মোট ৬টি প্রশ্নের।

- **বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :**
  ৪০টি বহুনির্বাচনী প্রশ্ন থাকবে, সব কয়টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

সৃজনশীল প্রশ্নপত্রের সাধারণ কাঠামো

এতে প্রতিটি প্রশ্নের শুরুতে একটি দৃশ্যকল্প বা উদ্দীপক (Stem) থাকবে যা হতে পারে একটি সাধারণ সূচনা বক্তব্য, চার্ট, চিত্র, গ্রাফ ইত্যাদি। দৃশ্যকল্প বা উদ্দীপকের শেষে ৪টি প্রশ্ন থাকবে।

প্রশ্ন ৪টির নম্বর বন্টন হবে নিম্নরূপ:

ক নং প্রশ্নের মান থাকবে ১
খ নং প্রশ্নের মান থাকবে ২
গ নং প্রশ্নের মান থাকবে ৩
ঘ নং প্রশ্নের মান থাকবে ৪

প্রতিটি প্রশ্নের এই ৪টি অংশের মোট নম্বর হবে ১০।

নমুনা প্রশ্ন

পৌরনীতি ও সুশাসন প্রথম পত্র
বিষয় কোডঃ HSC-1857
রচনামূলক (সৃজনশীল)
পূর্ণমান- ৬০
সময়- ২ ঘন্টা ১০ মিনিট

[ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। যেকোন ছয়টি প্রশ্নের উত্তর দিন]

নিচের উদ্দীপকগুলো পড়ে প্রশ্নের উত্তর দিন

১। একাদশ শ্রেণির পঠিতব্য বিষয়গুলোর মধ্যে একটি বিষয় সানজিদা খাতুনের খুব ভালো লাগে। এই বিষয়টিতে নাগরিক ও নগররাষ্ট্র নিয়ে আলোচনা হয়। ক্লাসে কাজী সরোয়ার স্যার যখন সুন্দরভাবে নাগরিক অধিকার, কর্তব্য, সাম্য, স্বাধীনতা সম্পর্কে আলোচনা করেন, তখন সে নিজের অবস্থান নির্ধারণ করারও চেষ্টা করে।

(ক) Civitas শব্দের অর্থ কী? ১
(খ) পৌরনীতি বলতে কি বোঝায়? ২
(গ) উদ্দীপকের সরোয়ার স্যারের ক্লাস সানজিদাকে আকৃষ্ট করে কেন? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করুন। ৩
(ঘ) শুধু সানজিদা খাতুন নয়– সকল নাগরিকই এরূপ বিষয় অধ্যয়ন করা প্রয়োজন। আপনি কি একমত?৪

২। সোহাগপুর গ্রামের দরিদ্র কৃষক তাহের মিয়া। তাঁর তিন ছেলে-মেয়েসহ পাঁচ জনের সংসার। এক বিঘা চাষের জমির ওপর তাঁর জীবিকা চালাতে হয়। একই গ্রামের জোতদার মজিদ মোল্লা দুর্বল পেয়ে তাঁকে ভিটামাটি থেকে উচ্ছেদ করে। তাহের মিয়া ছেলে-মেয়ে নিয়ে থানায় যান। কিন্তু, পুলিশ তাঁকে সাহায্য করতে অপারগ হয়। অবশেষে তিনি জেলা প্রশাসকের অফিসে যান নালিশ করতে। কিন্তু, সেখানে তিনি জেলা প্রশাসকের সাথে দেখা করতে ব্যর্থ হন। নিরুপায় হয়ে ছেলে-মেয়ে নিয়ে আত্মীয়-স্বজনের বাড়ী-বাড়ী দিন কাটাচ্ছিলেন তিনি। একটা সময়ে এসে তাহের মিয়া গণমাধ্যম কর্মী ও সুশীল সমাজের দ্বারস্থ হলেন এবং অন্যায়ের বিচার পেলেন।

ক) সুশাসন এর ইংরেজী প্রতিশব্দ কি? ১
খ) সুশাসন এর প্রধান উপাদানগুলো কি কি? ২
গ) সুশাসন এর অভাব থাকলে কি অবস্থা হয়? উদ্দীপকের আলোকে বর্ণনা করুন? ৩
ঘ) কিভাবে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা যায়? উদ্দীপকে বর্ণিত পন্থা কতটুকু কার্যকর? ৪

৩। সোহেল রানা একজন জনপ্রতিনিধির পুত্র। সে তার পিতার ক্ষমতার দোহাই দিয়ে এলাকায় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। সম্প্রতি সে এলাকায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের নামে যাত্রাপালার আয়োজন করে। সেখানে বাংলার ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠানের আড়ালে অপসংস্কৃতির আয়োজন করে এবং অনেক রাতে মাইক বাজিয়ে এলাকার জনগণের শান্তিপূর্ণ জীবন-যাপনে বিঘ্ন ঘটায়। এ বিষয়ে প্রতিবাদ করতে গেলে সোহেল এক যুবককে পিঠিয়ে আহত করে। এ ঘটনা নিয়ে সোহেলের পিতার কাছে গিয়ে যুবকটি কোন সন্তোষজনক প্রতিকার পাননি। কোন উপায় না দেখে অবশেষে সেই যুবক আদালতের দ্বারস্থ হয় এবং দীর্ঘ এক বছর পর আদালতের রায়ে জনপ্রতিনিধির পুত্র দোষী সাব্যস্ত হয়।

ক) নৈতিকতা কি? ১
খ) সাম্য কত প্রকার ও কি কি? ২
গ) "যা ইচ্ছে তাই করা স্বাধীনতা নয়"-উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ) আইনের শাসন বাস্তবায়নের মাধ্যমে রাষ্ট্রের উপস্থিতি বুঝা যায়- উদ্দীপক অনুযায়ী আলোচনা করুন। ৪

৪। আমুয়াকান্দি গ্রামের রহিমা বেগমের ছেলে আবুল হোসেন মালয়েশিয়াতে একটি প্রত্যন্ত অঞ্চলে কর্মরত। বহুদিন তিনি ছেলের কোন খোঁজ-খবর পাচ্ছেন না। ছেলে যাবার আগে অষ্টম শ্রেণি পড়ুয়া ছোট বোন আকলিমা খাতুনকে একটি ই-মেইল নম্বর দিয়ে গেছে। কিন্তু আকলিমাও খুব ভাল করে জানে না ই-মেইল কি? ভাই বলে গিয়েছে যে, এটি নিয়ে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে গেলেই তার সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হবে।

ক) ই-গর্ভনেন্স কি? ১

খ) ই-গর্ভনেন্স এর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লিখুন। ২

গ) উদ্দীপক অনুযায়ী ই-গর্ভনেন্স বাস্তবায়নের জন্য মাধ্যমগুলো সম্পর্কে লিখুন। ৩

ঘ) উদ্দীপকে বর্ণিত ডিজিটাল সেন্টার এর কার্যক্রম বর্ণনা করুন। ৪

৫। আব্দুর রহমান বাংলাদেশের নাগরিক। তিনি এক সময় একটি রাজনৈতিক দলের একজন নেতা ছিলেন। যে সময় রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে তিনি নিজের জীবনের নিরাপত্তাহীনতার কথা বলে কানাডাতে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করেন। এক পর্যায়ে তাঁর আবেদন মঞ্জুর হয়। আব্দুর রহমান এখন কানাডাতে। তিনি সেখানে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার ভোগ করেন।

ক. মৌলিক অধিকার কি? ১

খ. কর্তব্য বলতে কি বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে কোন ধরনের অধিকার বর্ণিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করুন। ৩

ঘ. উক্ত অধিকারের সাথে মৌলিক অধিকারের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করুন। ৪

৬। নিচের ছকটি লক্ষ্য করুন

A সরকার ব্যবস্থা		B সরকার ব্যবস্থা	
#	প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রীগণ তাঁদের কাজে জন্য সংসদের নিকট দায়ী।	#	প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রীগণ তাঁদের কাজে জন্য সংসদের নিকট দায়ী নয়।
#	শাসন বিভাগের সদস্যগণ আইন সভারও সদস্য হয়ে থাকেন।	#	শাসন, আইন ও বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ করা হয়ে থাকে।
#	জনমত দ্বারা পরিচালিত হয়।	#	জাতীয় সংকটকালে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

(ক) গণতন্ত্রের সংজ্ঞা দিন। ১

(খ) গণতন্ত্রের শ্রেণিবিভাগ করুন। ২

(গ) A দ্বারা কোন ধরনের সরকার ব্যবস্থাকে বোঝানো হয়েছে? ব্যাখ্যা করুন। ৩

(ঘ) আপনি কি মনে করেন B অপেক্ষাকৃত উত্তম সরকার ব্যবস্থা? বিশ্লেষণ করুন। ৪

৭। আধুনিক যুগকে বলা হয় প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের যুগ। জনগণ ভোটের মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচন করে এবং পরোক্ষভাবে শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করে। এ জন্য প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রকে দলীয় সরকার ব্যবস্থাও বলা হয়। মিজানুর রহমান "ক" রাজনৈতিক দলের একজন নেতা। তিনি অত্যন্ত সৎ, দক্ষ, অভিজ্ঞ, পরিশ্রমী, ত্যাগী ও দায়িত্বশীল নেতা হিসেবে সবার কাছে সুপরিচিত। তিনি সব সময় তার নির্বাচনী এলাকার জনগণের পাশে থাকেন। জনগণও তাকে খুব পছন্দ করে এবং ভোট দিয়ে জয়ী করে। তিনি জনগণ ও সরকারের সেতু বন্ধন হিসেবে কাজ করেন এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

(ক) নেতৃত্ব কী? ১

(খ) রাজনৈতিক দল কাকে বলে? ২

(গ) উদ্দীপকে মিজানুর রহমানের বৈশিষ্ট্যের আলোকে একজন নেতার প্রয়োজনীয় গুণাবলি আলোচনা করুন। ৩

(ঘ) সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্বের ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন। ৪

৮। 'ক' রাষ্ট্র শাসন বিভাগ আইনসভার নিকট তার কাজের জবাবদিহি করে এবং একটি কেন্দ্র থেকে সারা দেশ শাসিত হয়। এর রাষ্ট্রপ্রধান জনগনের পরোক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। অন্যদিকে 'খ' রাষ্ট্রে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে সাংবিধানিক উপায়ে ক্ষমতা হস্তান্তর করে দেওয়া আছে। এর রাষ্ট্রপ্রধান জনগনের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন।

(ক) সরকারের অঙ্গ কয়টি ও কী কী? ১
(খ) আইনসভার দুটি কাজ লিখুন। ২
(গ) উদ্দীপকে উল্লিখিত দুই দেশের মধ্যে যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় তা ব্যাখ্যা করুন। ৩
(ঘ) 'ক' রাষ্ট্রের সরকার ব্যবস্থা 'খ' রাষ্ট্রের সরকার ব্যবস্থা থেকে উত্তম। বিশ্লেষণ করুন। ৪

৯। 'ক' একটি সংগঠিত জাতি। তাদের মাঝে জাতীয়তার বেশির ভাগ উপাদানের মিল রয়েছে। তারা স্বাধীনতার পর চার দশকের বেশি সময় অতিক্রম করেছে কিন্তু উন্নতির কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে নি। সুশীল সমাজ লাগামহীন দুনীতি ও দেশপ্রেমহীনতাকেই এর জন্য দায়ী করেছেন। এ জাতির বেশিরভাগ জনগোষ্ঠীই ব্যক্তিগত স্বার্থ অন্বেষণে ব্যস্ত। ফলে এখনও বৃহৎ জনগোষ্ঠী দারিদ্রতা ও নিরক্ষতায় নিমজ্জিত।

ক) জাতি ও জাতীয়তার মূল পার্থক্য কি? ১
খ) দেশপ্রেম কি? ২
গ) উদ্দীপকের আলোকে দেশপ্রেম ও জাতীয়তার সম্পর্ক আলোচনা করুন। ৩
ঘ) দেশপ্রেম না থাকলে জাতীয়তার অনুভূতি ও ঐক্য ম্লান হয়ে যায়-ব্যাখ্যা করুন। ৪

নমুনা প্রশ্ন

পৌরনীতি ও সুশাসন প্রথম পত্র
বিষয় কোড: HSC-1857
বহুনির্বাচনী অভীক্ষা (সৃজনশীল)
পূর্ণমান- ৪০
সময়- ৪০ মিনিট

[প্রত্যেক প্রশ্নের মান সমান। সকল প্রশ্নের উত্তর দিন]

১। প্রাচীনকালে এথেন্স ও স্পার্টায় কোন ধরণের রাষ্ট্র প্রচলিত ছিল?

(ক) বিশ্ব রাষ্ট্র (খ) জাতীয় রাষ্ট্র
(গ) নগর রাষ্ট্র (ঘ) যুক্তরাষ্ট্র

২। পৌরনীতির ও সুশাসনের আলোচ্য বিষয় হল–

(i) সুশাসন (ii) রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও বিকাশ (iii) ব্যবসায়িক মুনাফা অর্জন প্রক্রিয়া
নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩নং ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দিন:

রায়হান মাহমুদ নিয়মিত কর পরিশোধ করেন। তার উদ্দেশ্য দেশ ও জাতির কল্যাণের পাশাপাশি প্রতিটি কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা রক্ষা করা।

৩। রায়হান মাহমুদ নিয়মিত কর পরিশোধের জ্ঞান অর্জন করেছেন কোন শাস্ত্র থেকে?

(ক) অর্থনীতি (খ) ইতিহাস
(গ) পৌরনীতি ও সুশাসন (ঘ) নীতিশাস্ত্র

৪। রায়হান মাহমুদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার উদ্দেশ্য–
(i) সুশাসন প্রতিষ্ঠা (ii) আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা (iii) মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii
(গ) i ও ii (ঘ) i, ii ও iii

৫। সুশাসনের জন্য সরকারি খাতের ব্যবস্থাপনার কথা কোন প্রতিষ্ঠান বলেছে?
ক) আইএমএফ খ) জাতিসংঘ
গ) বিশ্বব্যাংক ঘ) ইইউ

৬। সুশাসনের বৈশিষ্ট্য-
(i) অংশগ্রহণ (ii) আইনের শাসন (iii) স্বচ্ছতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i খ) i ও ii
গ) i, ii ও iii ঘ) i ও iii

৭। বাংলাদেশের আমলাতন্ত্র কোন ধাঁচের?
(ক) গণতান্ত্রিক (খ) সমাজতান্ত্রিক
(গ) উপনিবেশিক (ঘ) উপরের কোনটিই না

৮। সুনীতি গ্রহণে সরকারকে বাধ্য করার দায়িত্ব কার?
(ক) বিদেশীদের (খ) নাগরিকের
(গ) আমলাদের (ঘ) সামরিক বাহিনীর

৯। সামাজিক মূল্যবোধের উপাদান
(i) নীতিবোধ (ii) অমানবিকতা (iii) শ্রমের মর্যাদা
নিচের কোনটি সঠিক
(ক) i (খ) i ও ii
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১০। "ক" রাষ্ট্রে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, আইনের শাসন, বাক-স্বাধীনতা রয়েছে। সরকারও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর কিন্তু জনগণ মানবিকতা ও ন্যায়পরায়ণতার বিষয়ে এখনও নিশ্চিত নয়। এমতাবস্থায় "ক" রাষ্ট্রে অনেকটা সুশাসন থাকলেও কিসের অভাব রয়েছে?
(ক) গণতন্ত্র (খ) সামাজিক মূল্যবোধ
(গ) স্বেচ্ছাচারিতা

১১। লর্ড ব্রাইস এর মতে আইন মান্য করার কারণ হলো-
(i) দায়বদ্ধতা (ii) অপরের প্রতি শ্রদ্ধা (iii) শাস্তির ভয়
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১২। "আইন ও নৈতিকতার মাঝে নিবিড় সম্পর্ক বিরাজমান।" একথা কে বলেছেন?
ক) ফুঁকো খ) রাসেল
গ) গেটেল ঘ) নিটশে

১৩। রহিমা খাতুন ও জয়নাল মিয়া একত্রে রাজমিস্ত্রীর কাজ করে। জয়নাল কিছুক্ষণ পরপর কাজ ছেড়ে বসে থাকে। রহিমা একা কাজ করতে থাকে। জয়নালের সাথে জিদ করে রহিমাও যা ইচ্ছে তা করত তবে পুরো কাজটি নষ্ট হয়ে যেত। রহিমা ও জয়নালের মাঝে কিসের সম্পর্কটি নষ্ট হয়েছে?

(i) সাম্য (ii) স্বাধীনতা (iii) অধিকার

নিচের কোনটি সঠিক

(ক) i (খ) i ও ii

(গ) ii ও iii (ঘ) i ও iii

১৪। ই-গভর্নেন্সের মূল কাজ হচ্ছে-

(ক) তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করা (খ) তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করা

(গ) তথ্য প্রবাহকে বাঁধা দেয়া (ঘ) উপরের সবই

১৫। ই-গভর্নেন্সের মূল ভিত্তি হচ্ছে এটি-

(ক) ব্যক্তিকেন্দ্রিক শাসন (খ) প্রযুক্তিবান্ধব শাসন

(গ) স্থানীয় শাসন (ঘ) উপরের সবই

১৬। বাংলাদেশে ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠার একটি অন্যতম প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে-

(ক) জনসচেতনতার অভাব (খ) অর্থনৈতিক বৈষম্য

(গ) উপরের কোনটিই না (ঘ) ক ও খ

১৭। অধিকার বলতে বোঝায়–

(i) নিজের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করা (ii) সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত সুবিধা (iii) রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত সুযোগ

কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) ii ও iii

গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

১৮। "অধিকার তখনই প্রকৃত অধিকার হতে পারে যখন রাষ্ট্র সেগুলোকে অধিকার বলে স্বীকার করে এবং সেগুলো রক্ষার জন্য সচেষ্ট হয়।" এটি কার উক্তি?

ক) অধ্যাপক গেটেল খ) অধ্যাপক গার্নার

গ) অধ্যাপক বার্কার ঘ) অধ্যাপক ডাইসি

১৯। কোনটি বাংলাদেশের নাগরিকের মৌলিক অধিকার?

(i) আইনের দৃষ্টিতে সমতা

(ii) জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতার এবং চলাফেরা করার

(iii) ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সম্পত্তির অধিকার

কোনটি সঠিক?

ক) i খ) ii

গ) i ও ii ঘ) i, ii ও iii

২০। রাষ্ট্র গঠনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ন উপাদান–

ক) জনসমষ্টি খ) ভূখন্ড

গ) সরকার ঘ) সার্বভৌমত্ব

২১। রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য–

(i) রাষ্ট্র স্থায়ী প্রতিষ্ঠান (ii) বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য অভিন্ন (iii) রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী

কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২২। কোনটির সদস্য হওয়া বাধ্যতামূলক?

ক) রাষ্ট্র খ) সমাজ

গ) সংঘ ঘ) সরকার

২৩। 'The Politics' গ্রন্থের লেখক কে?

(ক) সক্রেটিস (খ) প্লেটো

(গ) এরিস্টটল (ঘ) আলেকজান্ডার

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৪নং প্রশ্নের উত্তর দিন ঃ

সৈকত বাংলাদেশের নাগরিক। বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক দেশ। তথাপি এদেশে এখনও দুর্নীতি বিদ্যমান। অনিয়মও রয়েছে যথেষ্ট। উক্ত সমস্যাসমূহ থেকে মুক্তির জন্য সৈকত মনে করে এদেশে আইনের শাসন, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে।

২৪। অনুচ্ছেদের আলোকে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বর্তমানে যে জিনিসটি খুবই দরকার–

(ক) স্বৈরতন্ত্র (খ) রাজতন্ত্র

(গ) সুনাগরিক (ঘ) বুদ্ধিজীবী

নিচের ছকটি দেখে ২৫নং প্রশ্নের উত্তর দিন ঃ

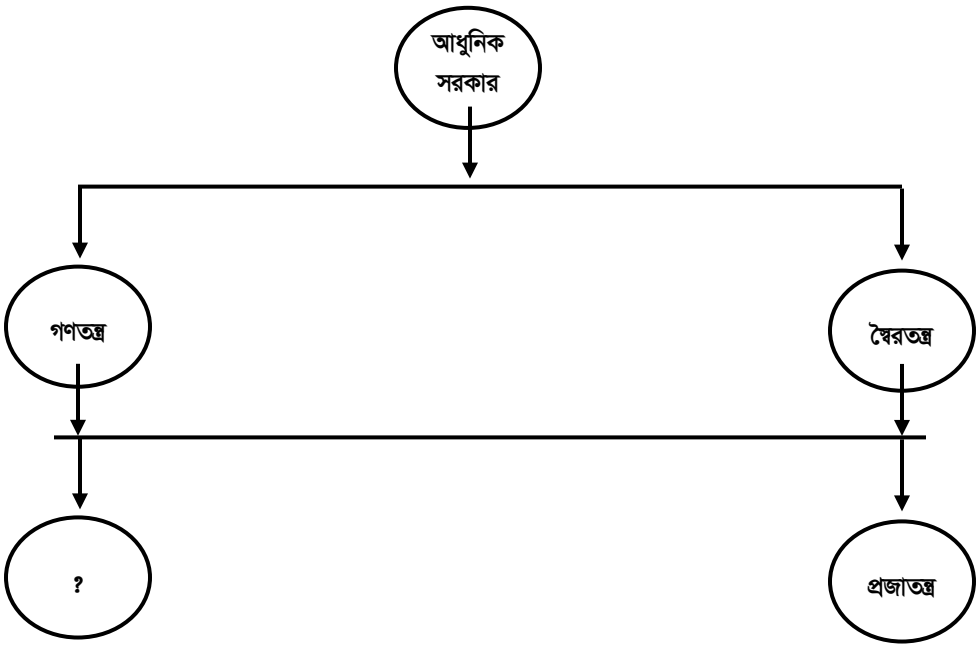

২৫। উপরের (?) চিহ্নিত স্থানটিকে কী হবে?

(ক) এককেন্দ্রিক (খ) একনায়কতন্ত্র

(গ) রাষ্ট্রপতি শাসিত (ঘ) নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র

২৬। Stasis শব্দটি কোন ভাষার শব্দ?

(ক) ল্যাটিন (খ) গ্রীক

(গ) ফরাসি (ঘ) ইংরেজি

২৭। রাজনৈতিক দলের কাজ হলো–

(i) সরকার গঠন করা (ii) জনমত গঠন করা (iii) সমস্যা চিহ্নিত করা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) i ও ii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২৮। বিকল্প নীতি উত্থাপন কে করতে পারে ?

(ক) সরকারি দল (খ) বিরোধী দল

(গ) সামরিক বাহিনী (ঘ) সচিবালয়

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৯নং প্রশ্নের উত্তর দিন

ক্ষমতার ভারসাম্য নীতি অনুযায়ী সরকারের প্রতিটি বিভাগ স্বাধীন হলেও, এদের প্রত্যেকে অন্যের স্বেচ্ছাচারিতায় বাধা দিতে পারে। এর ফলে কোন বিভাগ অতিমাত্রায় ক্ষমতাশালী হতে পারে না।

২৯। নিচের কোন দেশে এরূপ ব্যবস্থা বিদ্যমান–

ক) বাংলাদেশ খ) ভারত

গ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঘ) ব্রিটেন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩০নং প্রশ্নের উত্তর দিন

আজাদুল ইসলাম এক জন সরকারি কর্মকর্তা। তিনি দুই বছর পূর্বে একখন্ড জমি ক্রয় করেন। কিন্তু এক শ্রেণির প্রভাবশালীদের কারণে তিনি জমি দখল নিতে পারছেন না। কোন উপায় খুঁজে না পেয়ে আজাদুল ইসলাম আদালতের শরণাপন্ন হলেন।

৩০। উক্ত আদালত যেসবের সমন্বয়ে গঠিত হয়–

(i) ফৌজদারী আদালত

(ii) উচ্চ আদালত

(iii) দেওয়ানী আদালত

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩১। "জনমত হল বিভিন্ন জনের মতামতের পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়ার ফলে সৃষ্ট এক সামাজিক ফসল" - বলেছেন

ক) এইচ জে লাস্কি খ) স্টুয়ার্ট মিল

গ) জন লক ঘ) মরিস গিন্সবার্গ

৩২। জনমত গঠনের মাধ্যম হল-

(i) চলচ্চিত্র (ii) রেডিও টেলিভিশন

(iii) সংবাদপত্র (iv) ফেইসবুক

নিচের কোন সঠিক

ক) i ii খ) ii iii

গ) iii, iv ঘ) i, ii, iii ও iv

৩৩। অ্যালমন্ড ও ভারবা এর বই কোনটি?

ক) Grammar of Politics খ) The Prince

গ) Democracy for the Few ঘ) The Civic Culture

৩৪। "আমলাতন্ত্র একটি স্থায়ী, বেতনভুক্ত এবং দক্ষ চাকরিজীবী শ্রেণী।" – কে বলেছেন?

ক) ম্যাক্সওয়েবার খ) অধ্যাপক এস. ই ফাইনার

গ) গ্যাব্রিয়েল অ্যালমন্ড ঘ) স্যামুয়েল পি. হান্টিংটন

৩৫। আমলাতন্ত্রে সমস্ত কাজ রুটিন মাফিক করা হয়। কারণ আমলাতন্ত্র গুরুত্ব দেয়–

(i) আনুষ্ঠানিকতার উপর (ii) কার্যপদ্ধতির উপর (iii) বিধি-বিধানের উপর

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i খ) ii

গ) i ও ii ঘ) i, iii ও iii

৩৬। 'লালফিতা' প্রত্যেয়টি কোন শতাব্দীতে প্রচলিত হয়?

ক) ষোড়শ খ) সপ্তদশ

গ) অষ্টাদশ) ঘ) ঊনবিংশ

৩৭। আমলাতন্ত্রের দৌরাত্ম্যের' ফলে কী হয়?

(i) জনগন হয়রানি হয়

(ii) সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব ঘটে

(iii) প্রশাসনে বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩৮। "একটি মানবগোষ্ঠী ঐক্য ও সার্বভৌমত্ব অর্জন দ্বারাই জাতিরূপে গণ্য হতে পারে"। এটি কার বক্তব্য?

(ক) লর্ড একটন (খ) লর্ড রিপন

(গ) লর্ড ব্রাইস (ঘ) ক্রিস্টোফার হায়েস

৩৯। 'ক' রাষ্ট্রটি অনেক বড়। এর ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, এমনকি চেহারাগত অমিল রয়েছে। রাষ্ট্রটির নাগরিকদের ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক-

ক. জাতি এক খ. জাতীয়তা এক

গ. এটি কোন রাষ্ট্র নয় ঘ. উপরের কোনটি নয়

৪০। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ মনে করেন জাতীয়তার উপাদান হল-

(i) ভাষা (ii) পোশাক-পরিচ্ছেদ (iii) পেশা

নিচের কোনটি সঠিক

ক) i খ) ii

গ) ii ও iii ঘ) i ও ii